মহামান্য জুরি

শিশির পৈতণ্ডী

পুস্তকালয় ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক :
সি. এল. সাহা
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশ : ২ শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রক :
মৃত্যুঞ্জয় ধর
অন্নপূর্ণা প্রেস
৬/১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচি

গুরু প্রণাম

গুরু প্রণাম দিয়ে কাজ শুরু করার একটা বিধান আছে আমাদের শাস্ত্রে। তাছাড়াও আছে একটা মনের আবেগমিশ্রিত কৃতজ্ঞতা গুরুর প্রতি। আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্য সাধনার একটা বাসনা আছে। শেখার নেই লেখালেখি। যা লিখে চলেছি তা হয়ত সম্ভব হ'ত না যদি না আইন পেশায় আসতাম। এই পেশায় আসার আগে ও পরে বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁদের সকলকেই আমি গুরুর স্থান দিলে অতিশয়োক্তি হবে না। তাঁদের সান্নিধ্যেই তো কাটালাম এই পেশায়। সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁরাই আদালত নামে যে একটা জগৎ আছে তাকে দেখবার, জানবার, স্মৃতি ক'রে রাখবার। বিচিত্র ঘটনা ও মানুষকে তো দেখেছি সারা জীবন ধ'রে। আদালত প্রাঙ্গণে দেখেছি বেশীর ভাগ জীবন, ঘটনা ও চরিত্র। তারাই তো সাহিত্যের উপাদান। খ্যাতিমান কোন সাহিত্যিক প্রকাশ ও পরিবেশন করতে পারতেন আমার থেকেও শত সহস্র গুণ নৈপুণ্যে। বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কবি, গল্পকারদেরও প্রভাব আছে আমার এই লেখায়। তাঁদেরকে গুরুর স্থান দিয়েও 'আমি ধন্য।' গুরুশ্রেষ্ঠ যিনি তিনি তো আমার পিতৃদেব। শৈশব ও কৈশোরে আমার আইন পেশার প্রতি আকর্ষণ এনেছেন তিনি। এটা তাঁর স্বপ্নও ছিল। তাই তো আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা জ্ঞান উজাড় করে দিতে পারলাম অগণিত পাঠকের কাছে। কিছুতেই হয়ত সম্ভব হত না অন্য কোন বৃত্তি বা পেশা নিলে। যদি আমার এই প্রচেষ্টা পাঠককুল সার্থক মনে করেন তাহলে আমার শ্রেষ্ঠগুরুকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার একটা কর্তব্যও আছে। এটাই আমার গুরু প্রণাম।

আমার বাবা অতি শৈশবে মাতৃহারা হ'লে পিতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন। কারণ চাকরির সূত্রে এবং স্ত্রীবিয়োগ হেতু ঠাকুর্দা উদাসীন হয়ে পড়েন সংসার সম্বন্ধে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাবা ও জ্যাঠামশাই এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কিছুটা কাল কাটে। দুই ভাইয়ের একসঙ্গে পড়াশোনা করার সঙ্গতি ছিল না। ক্লাস সিকস্ কি সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করে বাবাকে চাকরির জন্য যেতে হয় ধানবাদে। মাসিক যা উপার্জন তা দিয়ে দাদার লেখাপড়া যাতে অব্যাহত থাকে তারই প্রচেষ্টায়। ধানবাদে তখন ইংরেজদের একটা ক্লাব। ইংরেজ পদস্থ অফিসার ও কোলিয়ারি মালিকদের মনোরঞ্জনের একটা ক্লাব। তের-চৌদ্দ বছর বয়স, শিক্ষাও তত নেই। কাজেই 'চাকরিটা' ক্লাব বয়ের। সাহেবরা যখন যা ফাই ফরমাস করবেন তাই পালন করা। মদ ও অন্যান্য খাবারের বন্দোবস্ত ছিল সেখানে। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত কাজ। দিনে কোন কাজ নেই সে ক্লাবে। সে সময় কোন দোকানে কাজ ক'রে কিছু পাওয়া যেত। দিনের খাবার দোকানে। রাতের খাবার ক্লাবে। হাতে যা টাকা আসতো বাবা তাঁর দাদাকে পাঠাতেন। এই ভাবে কেটেছে দু-বছর। ক্লাবে আসতেন ইংরেজ দম্পতি জেনকিন্স ও বারবারা তাঁদের সুনজরে পড়ে যান বাবা। সাহেব মেমসাহেব দুজনেই খুব স্নেহ করতেন বাবাকে। তাঁদেরও একটা ছেলে ছিল। বেঁচে থাকলে বাবার বয়সী হ'ত। সাহেব ও মেমসাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারতেন। বাবা কিছু ইংরেজি ভাষা শিখেও ফেলেছিলেন। দু বছর পর তো মোটামুটি ইংরেজি বলতেও

পারতেন। মেমসাহেবই তাঁদের দুঃখের কথা বলেছিলেন বাবাকে। পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন ধানবাদে। সাতটা কোলিয়ারির মালিকানা ছিল জেনকিন্স সাহেবের। পৈত্রিক সূত্রে। বেশ কেটেছে প্রথম ছটা মাস. তারপর ছেলে ফিলিপ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ধানবাদের অতিরিক্ত তাপ হয়ত অসুস্থতার কারণ ভেবেছিলেন তাঁরা। সাধারণ চিকিৎসা শুরু হয়। সিভিল সার্জেন ছিলেন ফ্রান্সিস উডবার্ন। চারদিন প্রচণ্ড জ্বরে ফিলিপ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। মাথায় বরফ দিয়ে ম্যানেনজাইটিস নিবারণের চেষ্টা। সাহেব ভাবলেন ফিলিপকে নিয়ে দেশে চলে যাবেন। দুদিন কাজ সামলে না নিলেও মুশকিল। ছদিনের দিন ফিলিপের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আগামীকাল ভোরে বেরুবেন তাঁরা। কিন্তু মধ্যরাত্রিতেই সব শেষ হ'য়ে গেল। ভেঙে পড়লেন সাহেব ও মেমসাহেব দুজনেই। মনের দুঃখ ভুলতে ঘুরে বেড়িয়েছেন বেনারস, অমৃতসর, শ্রীনগর, সিমলা আরো কত জায়গা। মনের দুঃখ ভুলতে গিয়ে দেশ ভ্রমণ। কিন্তু মনে পড়েছে বেশি ফিলিপের কথা। তারপর সাহেব ভেবেছেন কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে হয়ত ভুলে থাকতে পারবেন। দুজনেই ফিরে এসেছেন ধানবাদে। সাহেব তো কাজের মধ্যে থাকেন সারাদিন। কিন্তু কর্মশেষে মনে পড়ে বারবার। মেম-সাহেব একা থাকেন সারাদিন নানা স্মৃতি নিয়ে। সন্ধ্যা হলেই সাহেব নিয়ে আসেন মেম-সাহেবকে ক্লাবে। সাহেব হুইস্কি খান। কিন্তু মেম-সাহেব সেখানেও নিঃসঙ্গ। আমার বাবা ধানবাদে চাকরি পান সেই সময়ে। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাবা চোখে পড়েন মেম-সাহেবের প্রথম। বাবাকে কাছে ডেকে কথা বলেন। তারপর থেকে বাবার প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়ায় মেম-সাহেবের কাছে থাকা। মেম-সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলা হিন্দিতে ও দু'একটা ইংরাজিতে কথা বলেন বাবার সঙ্গে। ফিলিপের কথা শুনে বাবারও মনে কষ্ট হয়। সাহেবও মেম-সাহেবের মনের কথা বুঝতে পেরে বাবাকে খুব স্নেহ করেন। সাহেব মেম-সাহেবের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় কথা বলে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে বাবা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের কথা বুঝতেও কষ্ট হয় না। স্নেহভরে যখন যা মনে হয় সাহেব ও মেম-সাহেব বাবাকে দেন। হঠাৎ একদিন সাহেব বললেন—'ঘানু আমাদের সঙ্গে লন্ডনে যাবে? টোমায় লিখা পড়া শিখাব। ফিলিপ বেঁচে থাকলে যা করটাম টাই করব।' বাবা কোন উত্তর দিতে পারেন না। প্রায়ই সাহেব ঐ কথাই বলেন। বাবাকে একদিন বলতেই হ'ল—আমার দাদা আছে। তার পড়ার খরচ আমি চাকরি করে চালাই। আপনি বরং আমাকে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। সাহেব বলেন—চাকরি করে কি হবে টোমার? লিখা পড়া না শিখলে টো কিছু হোবে না। বাবা নিরাশ হয়ে পড়েন। ভাবেন সাহেবের এত ক্ষমতা। নিজের এতগুলো কোলিয়ারি, একটা ভাল ব্যবস্থা কি আর করে দিতে পারেন না। মেম-সাহেবকে বললে তিনি বলেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কারো কাছে কিছু ভিক্ষা করবে না। প্রায় দু'বছর কেটেছে। হঠাৎ একদিন সাহেব বললেন তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন। কোলিয়ারি বিক্রি ক'রে দেবেন। বাবা বুঝতে পারেন না, হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন। একদিন সাহেবই বললেন এদেশে নাকি আর থাকা সম্ভব নয়। বহু ইংরেজ তখন এদেশ ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাচ্ছে। বাবা আর কোন চাকরির জন্য বলেন না অভিমানে। যাবার দিন এগিয়ে এল। সাহেব বাবার হাতে দুটো খাম দিলেন। একটা খামের উপরে একজন সাহেবের নাম ও ঠিকানা। অন্য খামে কোন ঠিকানা নেই, নাম ও নেই। তারপর সাহেব ও মেমসাহেব চলে গেলেন স্বদেশে। নাম ঠিকানা হীন খামে একটা ছোট চিঠি আর দুহাজার টাকা। চিঠিতে লেখা আছে চাকরির সুযোগ করে তাঁরা বাবার কোন ক্ষতি করতে চান না। তবুও একটা চিঠি সাহেবের এক বন্ধুকে লিখে দিয়েছেন। যদি চাকরি একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে বাবা যেন সেটা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। যদি চাকরি না করেন বাবা তাহলে

এই টাকা লেখা-পড়া শিখতে ব্যয় হ'লে তাঁরা সুখী হবেন। চিঠিখানা পড়তে পড়তে বাবার চোখে জল এসে গেল। স্নেহ যে কতভাবে প্রকাশ পায় আর স্নেহ থাকলে কি মঙ্গলই না কামনা করা যায় তা চিন্তা করে কেঁদে ফেললেন। বাবা ধানবাদ ছেড়ে চলে এলেন তার দু চারদিন পর। স্থির করলেন ম্যাট্রিকটা পাস করতেই হবে। দাদাকে সেই টাকা থেকে অর্ধেক পাঠিয়ে দিলেন আর চিঠি লিখে জানালেন সব কথা। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাসও করলেন। এদিকে সাহেবের দেওয়া টাকা প্রায় শেষ। বাবা ভাবলেন—চাকরি ছাড়া গত্যন্তর নেই। আবার ধানবাদ। সাহেবের সেই বন্ধুর খবর নিয়ে জানলেন তিনি চলে গেছেন। ধানবাদ তবুও যেতে হবে। বাবার এক আত্মীয় থাকেন সেখানে। যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়। গোমো প্যাসেঞ্জারে উঠলেন ধানবাদ যাবার জন্য। বেলা তখন এগারটা। কি মনে হ'ল আসানসোলে নেমে পিসিমার বাড়িতে খাওয়া সেরে বিকেলে ধানবাদ যাবেন। নেমে পড়লেন আসানসোলে। সেখানে দুই পিসিমার বিয়ে হয়েছে একই বাড়িতে। কেউই নিজের পিসিমা নয়। দুই পিসেমশাই। একজন উকিল· আরেকজন মোক্তার। পিসিমার ছেলেরা পড়া বন্ধ করে আড্ডা দিয়ে কাটায়। পিসেমশাইরা বললেন সকাল সন্ধ্যা তাদেরকে পড়াতে আর দশটা থেকে পাঁচটা কোর্টে মুহুরীর কাজ করতে। থাকা খাওয়ার কোন খরচ নেই। দৈনন্দিন তিরিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার হবেই। বাবা থেকে গেলেন আসানসোলে। জীবনে আর ধানবাদ যাওয়া হয়নি। তিন-চার বছর কেটেছে। বাবার ওপর সকলেই সন্তুষ্ট। বাবাও খুশি দাদা বি.এ পাস করেছে। পিসেমশাইরা বললেন দাদাকে ল' পড়তে বল। পাস ক'রে আসানসোলেই বসবে।' কলকাতায় ল' কলেজে ভর্তি হলেন জ্যাঠামশাই। এখন আর টাকা পাঠানোর কোন অসুবিধা নেই। একদিন পিসেমশাইরা বললেন, তুইও প্রাইভেটে মোক্তারী পরীক্ষা দে। আমাদের দুই ভায়ের মত তোরা উকিল মোক্তার হবি। পরামর্শটা বাবার ভাল লাগল। এদিকে পিসেমশাই-এর ছেলেদের পড়ায় মন বসেছে। মোক্তারশিপ পরীক্ষা দেবার বই পিসেমশাইরা আনিয়ে দিয়েছেন। মুহুরীর কাজ এবং নিজের পড়াশোনা বাবার করতে কোন অসুবিধা হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে এবং পাস করে বাবার আসানসোলে প্র্যাকটিশ করার কথা। তার আগে বাবা গ্রামে এলেন। পাশেই বক্রেশ্বর গ্রাম ও মন্দির। প্র্যাকটিশ শুরু করার আগে সিদ্ধপুরুষ চক্রবর্তীবাবাকে প্রণাম করতে গেলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন সিউড়িতে কাজ করতে। বাবা বললেন এখানে কেউ বাবার পরিচিত নেই, বসবাসের কোন জায়গা নেই। চক্রবর্তীবাবা বললেন কোন চিন্তা নেই। সব হবে। বাবা এলেন সিউড়িতে সেই নির্দেশমত। দেখা করলেন নিজের গ্রামের উকিল ব্রজরাজ সরকারের সঙ্গে।

ব্রজরাজ সরকার সে আমলের সুপ্রতিষ্ঠিত দেওয়ানী উকিল। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের বহু মামলা তাঁর হাতে। জেলার বহু জমিদার তাঁর বাঁধা মক্কেল। ব্রজরাজবাবু তাঁর বাড়ির একটা ঘর ছেড়ে দিলেন বাবাকে। কোট প্যান্ট কাল টাই কিনে দিলেন জোর করে। বাবা পূর্বের আসানসোলের মুহুরীর অভিজ্ঞতা নিয়ে মোক্তারী শুরু করলেন সিউড়িতে। দুবছর কাজ করে যখন দাদা ল' পাস করলেন বাবা তখন বাড়ি ভাড়া নিলেন সিউড়িতে। জ্যাঠামশাই শুরু করলেন ওকালতি। সেখানেও সাহায্য ব্রজরাজ সরকারের। সেটা উনিশশো উনত্রিশ সালের কথা। দুই ভাই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলেন উকিল ও মোক্তার হিসেবে। এর মধ্যে বিয়ে এবং সংসার। আমি পৃথিবীর আলো দেখেছি উনিশশো ছত্রিশে। তারপর বাবার স্বপ্ন আমাকেও উকিল করার। সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছে উনিশশো ষাট সালে। একাশি সাল পর্যন্ত আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পাশে ছিলেন। জেনকিন্স ও বারবারা বাবার জীবনে এমন এক সময়ে এসেছিলেন যে বাবার

গন্তব্যস্থলটাই বদলে গেল। সাহেব মেমসাহেব চেয়েছিলেন বাবা চাকরি না ক'রে অন্যভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পান। বাবা তো পেয়েছেন। বাবা চেয়েছিলেন আমি উকিল হই। হয়েছি উকিল। সেটাই বড় কথা নয়। উকিল হ'য়ে জীবনকে যে ভাবে দেখেছি, মানুষকে যা দেখেছি, কত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি তার থেকেই তো লেখার প্রেরণা। বাবার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় কোন কল্পনা নেই। প্রতিটি সত্য ঘটনা। আজ আমি যে আসতে পেরেছি মানুষদের মাঝে, আইন পেশায় বা পাঠককুলের সামনে এটা হয়ত আদৌ সম্ভব হ'ত না যদি না বাবা আমার জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতেন। তাই শ্রেষ্ঠ গুরু আমার বাবাকে প্রণাম করে যাত্রা শুরু করছি।

গুরু প্রণাম করতে কোন কল্পনার আশ্রয় নিই নি। কল্পনাকে কাজে লাগিয়েছি এর পর। সত্য সেখানে তিন ভাগ। কল্পনা এক ভাগ। তাও সাহিত্যের কারণে। সে কল্পনার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

নিবেদন

জুরির বিচার লুপ্ত হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছরেরও উর্ধ্বকাল। আমাদের বিচার ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের প্রথায় চলেছে স্বাধীনতার পরও আজ অবধি। কিন্তু পনেরো বছরের মধ্যে জুরি সাহায্যে যে বিচার তা বিলুপ্ত করা হয়েছে। জুরির বিচার দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে কয়েক বছর। ১৯৫৭ থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত ছাত্র হিসেবে দর্শক ছিলাম কলকাতা হাইকোর্ট সেসন্সে দু চারটে খুনের মামলার। স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এ. সি. মিটারকে দেখেছি সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে। মিঃ এম ব্যানার্জিকে দেখেছি অভিযুক্তের কাউন্সেল হিসেবে। ব্যারিস্টার জে. পি. পিটার ও বিচারক জে. পি মিটারকেও স্মৃতিতে রেখেছি। তারপর পেশার জীবনে সিউড়ি জেলা কোর্টে নানা দায়রা মামলা যাকে সেসেন্স কেস বলে তা দেখেছি মাত্র। কিন্তু জুরিদের সামনে মামলা করার কোন সৌভাগ্য হয়নি। কারণ আমি তখন নবীন। ইংল্যান্ডের অনেক বিচার কাহিনী আমি পড়েছি। এডগার 'লাস্টগার্টেন' আমার প্রিয় লেখক। তাঁর লেখা বিচারের কয়েকটা গল্প পড়েছিলাম। প্রতিটি গল্প আকারে অনেক বড়। সে গল্পের অনুবাদ করার কোন প্রচেষ্টা করিনি। সময়াভাব তার কারণ। শুধু গল্পের ছায়াটা মাথায় রেখে নিজের ক্ষমতা মতো পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। পেশার ব্যস্ততার মাঝে সামান্য সময়। চেষ্টাও সে কারণে সীমিত। এডুউইন বার্টলে মামলা, এলভিরা বার্নে মামলা, টনি ম্যানসিনি মামলা, ফিলিস ডিমক মামলা, আমাদের বাঙালী পাঠককে ঐতিহাসিক জুরি বিচারের একটা ধারণা যেমন দেবে তেমনি বিচার সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। আদালতে জেরা কীভাবে হ'ত, বক্তৃতা কীভাবে হ'ত সেকালে তার একটা চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। পাঠকের ভাল লাগেলেই আমার তৃপ্তি।

আজ জুরি বিচার নেই। আমার দেখা, শোনা ও জানা বহু ঘটনা ঘটেছে এত বছরে। সব ঘটনা আদালতে আসেনি। সবই যদি আদালতে আসত—জুরির দ্বারা বিচার হ'ত না। আজ পাঠককুল আমার কাছে জুরি। মনের একটা যে খেদ থেকে গেছে জুরি বিচারে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার, সেই খেদ মেটাচ্ছি সেই সব আদালতে আসা না আসা ঘটনা আমার জুরিদের কাছে পেশ করে।

মাননীয় জুরিবৃন্দ,

পড়বেন নানা ঘটনার কথা। সত্য ঘটনা। কিন্তু সাহিত্য হতে গেলে রং এসে যায়। কোন ঘটনা, চরিত্র যদি বাস্তবে কারো সঙ্গে মেলে তা কাকতালীয় বিবেচনা করবেন। বিবেচনা আরো করবেন কে সত্যিকারের বিচারক? মানুষ, না কাজী নজরুলের কথায় যিনি "খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে" তিনি। সে বিচার আপনারা করবেন। তার সঙ্গে এও বিচার করবেন আমার এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক।

আপনাদের কাছে একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমার তো পরিচয় ছিল না পাঠকের সঙ্গে। বন্ধুবর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ এবং পরম স্নেহভাজন শ্রীসুধাংশুশেখর দে আমার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রচনা ভাল লাগলে তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ভাল না লাগলে তাদের কোন ত্রুটি নেই। সেটা আমার শক্তির অভাব ধরে নিয়ে ক্ষমা করবেন। মহামান্য জুরিবৃন্দ যাঁরা আমার রচনার পাঠক তাঁদের কাছে এটাই নিবেদন।

ইতি

শিশির পৈতণ্ডী

মুখবন্ধ

শিশির পৈতণ্ডী আমার বাল্যবন্ধুই শুধু নয়। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী। প্রায় এক সঙ্গেই আইন পেশায় এসেছি। আজও দুজনেই আমরা কাজ করে চলেছি। তফাত শুধু দুটো। একটা আমি কলকাতায় আর ও বীরভূমের সিউড়ী শহরে। তার থেকেও দ্বিতীয় তফাত আইন পেশার সাথে সাথে সাহিত্য সাধনা করে চলেছে বহু বছর। জেলার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় নানা স্বাদের ছোট গল্প ও লিখেছে। তার মধ্যে থেকে কিছু গল্প সম্পাদনা করেছি আমি। আইন পেশায় দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফসল "মহামান্য জুরি।" এই সংকলনে ইংল্যাণ্ডের জুরির বিচারের একটা চিত্র যেমন আছে বার্টলে হত্যা মামলা টনি ম্যানসিনি, ফিলিস ডিমক ইত্যাদি গল্প আছে তেমনি বিগত যুগের বিচারের ইতিহাস আছে। তার সঙ্গে আছে লেখকের দেখা ও জানা নানা ঘটনা এবং চরিত্র। লেখকের একটা ক্ষোভ আছে। জুরির বিচার অবলুপ্ত হওয়ায় আইনজীবী হিসেবে একটা অতৃপ্তি আছে। পাঠক শ্রেণীকে মহামান্য জুরি সম্ভাষণ করে লেখক যে সব অভিজ্ঞতার গল্প বলেছেন। আশা আছে পাঠকশ্রেণীর ভাল লাগবে।

বিষ্ণুচরণ ঘোষ

এলভিরা বার্নে

এলভিরা বার্নে অভিযুক্ত হয়েছিল মাইকেলকে খুন করার অভিযোগে। বিচিত্র জীবন ছিল দুজনের। ধনী পিতার কন্যা বার্নে। প্রথম বিয়ে ভেঙে গেলে শুরু হয় এক শূন্য জীবন। তার কটেজ ছিল এক মধুচক্র। নানা মানুষের আনাগোনা। যৌন জীবনের বিশৃঙ্খল পরিবেশ। তখনই আলাপ হয় মাইকেলের সঙ্গে। বাবার ত্যাজ্যপুত্র। আলাপ থেকে প্রেম। বার্নে হয় তার রক্ষিতা। দুজনেই সমান মদ্যপায়ী। একে অপরকে সন্দেহ। তার থেকে খণ্ডযুদ্ধ যখন তখন। কখনও খুব মধুর সম্পর্ক। একদিন রাত তিনটেয় দুজনের তর্ক-ঝগড়া। তারপর সে শব্দ মিলিয়ে যায়। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। মনে হয় রিভলবারের। টেলিফোন পেয়ে এক ডাক্তার আসেন। এক বীভৎস দৃশ্য। মাইকেল পড়ে আছে সিড়ির ওপরের ধাপে। বুলেট ভেদ করেছে বুক। পাশে পড়ে আছে রিভলবার। পাঁচটার মধ্যে দুটো গুলি ব্যবহার হয়েছে। ডাক্তার খবর দিয়েছেন পুলিশকে। প্রথম বার্নে জিজ্ঞাসাবাদে এক দুর্ঘটনার কথা বলেছে। মাইকেল ও বার্নে রিভলবার কাড়াকাড়ি করতে করতে অকস্মাৎ গুলি বেরিয়ে যায়। মাইকেল নাকি সকলকে বলতে চেয়েছিল বার্নের কোন দোষ নেই। কিন্তু ডাক্তার পৌঁছবার আগেই মাইকেলের মৃত্যু হয়। বার্নেকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি। গ্রেপ্তার হয়েছে তিনদিন পর। তদন্ত শেষে বার্নের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য মামলা পেশ হয়েছে। বিচারক ছিলেন মিঃ জাস্টিস টেভার্স হামফ্রেজ এবং জুরির সাহায্যে বিচার। বার্নের পক্ষ নিয়েছেন স্যার প্যাট্রিক হেস্টিংস। পারসিভাল ক্লার্ক সরকার পক্ষের মামলা কি কি প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল জানাতে গিয়ে তুলে ধরলেন বার্নের জীবনের পূর্ব ইতিহাস পারিপার্শ্বিক প্রমাণ। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞের মতামত। বলেছেন—আপনারা দেখবেন মৃত মানুষের নিজের দ্বারা এই জখম সম্ভব নয়। তা হলে কে ব্যবহার করল রিভলবার ও গুলি। সেখানে অন্য একজনই ছিল। অভিযুক্তা বার্নে। সে যদি গুলি করে থাকে তাহলে বিচার্য তা ইচ্ছাকৃত না শুধু দুর্ঘটনা। মনে রাখতে হবে ঝগড়া চিৎকার ও তারপর গুলির শব্দ। এর আগেও একবার গুলির ব্যবহার সে করেছিল। সাধারণ জ্ঞানে এই মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করার জন্য একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সবই বিচার্য এই মামলায়।

সরকারপক্ষ দুজন মহিলা প্রতিবেশী ও এক পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে এনেছে। তারা বলছেন বার্নের দৈনন্দিন জীবনধারা কীভাবে তাদের জীবন দুঃসহ করেছে। একজন কী সাক্ষী বলেছে বার্নের গলার আওয়াজ শুনেছে—বেরিয়ে যাও আমি গুলি করব। আর একজন সাক্ষী গুলির শব্দের সঙ্গে দেখেছেন ধোঁয়া। প্যাট্রিক হেস্টিংস তাকে প্রশ্ন করলেন—

—যখন গুলি ছোঁড়া হয় আপনি দেখেছেন ধোঁয়া সেই ধোঁয়া কতটা বড়? সেটা কি এক ফুটের মত?

—"হাঁ"—বলে হাত দিয়ে তা দেখালো অনেকটা বড়।

—আপনি নিশ্চয় জানেন না রিভলবারে করডাইট কার্তুজ ব্যবহার হয়েছে?

—জানতাম না।

—আপনি নিশ্চয় জানেন না যে কার্তুজে ধোঁয়া বের হয় না?

—জানি না।

জুরিরা ততক্ষণে বুঝেছেন নিশ্চয় ধোঁয়াহীন কার্তুজ ব্যবহার-এর প্রমাণ আছে। অপর এক সাক্ষী শুনেছিল একের বেশি গুলির আওয়াজ। হেস্টিংস তাকে কল্পনায় ভর করতে দিয়ে গুলির শব্দ সংখ্যা পর পর পাঁচে তুললেন। গুলির শব্দ শোনা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে গেল।

বার্নে মামলায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ চিকিৎসক সাক্ষী ডাঃ স্পিলসবেরি। তাঁর মতে এটা আত্মহত্যা নয়। কিন্তু এটা যে দুর্ঘটনা নয় তা তিনি বলেননি। হয়ত সরকার পক্ষ তা ইচ্ছাকৃত নীরবতা যুক্তিযুক্ত ভেবেছিলেন।

প্যাট্রিক হেস্টিংস প্রশ্ন শুরু করলেন—

—বুলেট দেহে মারা হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত নিতে আপনি নিশ্চয় অন্য কোন কঙ্কালের ওপর পরীক্ষা করেছিলেন?

—ঠিক তাই।

—আকৃতিগত পার্থক্য নিশ্চয় এক দেহ থেকে অন্য দেহের ভিন্ন?

—অস্থি বা হাড়ের দিক থেকে।

—দেহের যে স্থানটায় গুলি প্রবেশ করেছে তা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ জরুরী?

—নিশ্চয়।

প্যাট্রিক আর কোন প্রশ্ন করেননি।

রবার্ট চার্চিল আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসেছেন তারপর। তিনি সরকারপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন বার্নের রিভলবার ব্যবহারের দিক থেকে সব থেকে নিরাপদ। কারণ তা ব্যবহার করতে অনেক শক্তি লাগে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় আকস্মিক ও অসতর্ক অবস্থায় এ রিভলবার থেকে ট্রিগার টেনে গুলি বের হয়ে যাবে। বার্নের বিরুদ্ধে এ মতামত গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক। প্যাট্রিক তাঁর হাতে সেই রিভলবার তুলে নিয়ে সাক্ষী ও জুরিদের সামনে রেখে প্রশ্ন করলেন সাক্ষী রবার্ট চার্চিলকে—

—আপনি কি জোর দিয়ে বলছেন এটা সব থেকে নিরাপদ হিসেবে তৈরি হয়েছে?

—আমি তাই মনে করি।

—যন্ত্রের নিরাপদ অংশটা এই রিভলবারের ঠিক কোন জায়গায় আছে?

—একটা স্থান নয়। আমি বলতে চেয়েছি রিভলবারের যে হ্যামার থাকে তা স্বয়ংক্রিয় বা অটোম্যাটিক অস্ত্রের থেকে নিরাপদ।

প্যাট্রিক ঘনঘন রিভলবারের ট্রিগার টানতে শুরু করলেন—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক শব্দ হতে লাগল। সকলে দেখল এটা যেন বাচ্চা ছেলের হাতে খেলনা পিস্তলের মতো অতি সহজে ব্যবহার হয়।

—এটা তো মনে হচ্ছে না ব্যবহার করতে খুব শক্তি লাগে?

—আরো শক্তি লাগে যদি হালকাভাবে এটা ধরা হয়।

—সত্যি কি তাই? প্রশ্ন করেই বারবার রিভলবারের ট্রিগারটায় চাপ দিয়ে খুশি মতো ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করতে লাগলেন।

রবার্ট চার্চিল বলে উঠলেন—আমি তবুও বলব অটোম্যাটিক রিভলবারের থেকে বেশি নিরাপদ সহজে ব্যবহার করা যায় না।

প্যাট্রিক ক্লিক ক্লিক আওয়াজ তুলে জুরিদের দেখালেন—এই রিভলবার ব্যবহারে কোন শক্তি লাগে না। গুলি করব? কেউ কেন শুনল না ছোট্ট কথাটা 'তোমাকে'।

মাননীয় জুরি মহোদয়, এমন বহু মামলা আছে যে করুণা বা দয়া প্রার্থনা করা হয়। সন্দেহের অতীত প্রমাণ হয়নি আবেদন করা হয়। আমি কিন্তু তা করব না। আমি বলব না সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিন। আমি বলব দেখার সন্দেহ নয় কোন প্রমাণই আনতে পারেননি সরকারপক্ষ। তাঁরা বলেছেন ঘটনার কয়েক দিন আগে বার্নে মাইকেলকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সে গুলিও করেছিল খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনজন প্রতিবেশীর মুখ দিয়ে তা বলানো হয়েছিল। একজন তো বার্নেকে গুলি করতেও দেখেছিল। রিভলবারটা ছিল ঝকঝকে সাদা এবং উজ্জ্বল। আপনারা দেখেছেন, আবার দেখুন এই রিভলবারটা কিন্তু কালো। সে বলেছে ধোঁয়া দেখেছে। কিন্তু এই রিভলবার থেকে কোন ধোঁয়া বের হয় না। সে বলেছে বার্নে সেটা বাঁ হাতে চালিয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন আকস্মিকভাবে বার্নেকে রিভলবার হাতে নিতে বলেছি আর সে ভাবার সুযোগও পায়নি। ডান হাত দিয়ে সে তুলেছে। শুধু কি মাইকেলকে হত্যা করার সময় সে বাঁ হাত ব্যবহার করেছে। তাও কি সম্ভব? ধরুন। আপনাকে কেউ গুলি করল। আপনি কি করবেন? আপনি কি পালাবার চেষ্টা করবেন না? কিন্তু প্রথম গুলির শব্দ শুনেও এবং তাকে মারা হচ্ছে জেনেও সে কিন্তু আধ হাতও নড়েনি। সে জানলায় দাঁড়ানো বার্নের সঙ্গে কথা বলেছে। এরপরও কি বিশ্বাস করতে হবে মাইকেল যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় ছিল। ধরা যাক আপনাদের কেউ ঘটনার সময় ছিলেন এবং এক মহিলাকে দেখলেন বাইরে থাকা নীচে একজনকে গুলি করছে। কী করতেন আপনারা? কিছু একটা নিশ্চয় করতেন। আমি তো নিশ্চয় করতাম। এই সাক্ষীরা কী করল? কিছু না। তারা চলে গেল বিছানায়। যেন সুনিদ্রার কোন বিঘ্ন না হয়। আশ্চর্য। কেউ কোন অভিযোগ করল না পুলিশের কাছে। আপনাদের সামনেই পুলিশ তা বলেছে। কল্পনা করতে পারেন? এরপর মাপ করুন প্রশ্ন চার্চিলকে—

ধরুন একজনের হাতে আছে এই অস্ত্রটা, অন্য একজন এসে সেটা কেড়ে নেবার জন্য টানাটানি করছে। এটা খুবই সম্ভব তাই টানাটানিতে ট্রিগারে হাত পড়ে গুলি বেরিয়ে যাবে?

—সম্ভব এটাই।

—অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না কীভাবে গুলি বেরিয়েছে?

—তা বলা সম্ভব নয় তেমন কোন ব্যক্তির পক্ষে যে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না।

—একজন রিভলবারটা ধরে আছে, অন্যজন এসে তা ধরে ফেলে এবং রিভলবারের মুখটা যদি তার দিকে থাকে, ট্রিগারে জোর পেয়ে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।

—তা সম্ভব?

—সেই মানুষ যদি রিভলবারের বিপরীত দিকে থাকে তাহলে গুলিতে মৃত্যু হ'তে পারে?

—নিশ্চয় হ'তে পারে।

আর কোন প্রশ্ন নয়। মিসেস বার্নে তারপর উঠেছে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। প্যাট্রিকের নির্দেশে অভিযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে স্বপক্ষে এবং সরকারপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করে। বার্নে পুলিশের কাছেও বলেছিল কীভাবে ঘটনা ঘটেছিল। তার উক্তি মাইকেল সব সময় টাকা চাইত জুয়া খেলবে বলে। বার্নে দিতে চাইত না। এক মিলিটারী বন্ধু তাকে উপহার দিয়েছিল এই রিভলবার। তার কটেজে চোর গুণ্ডার উপদ্রব হ'ত প্রায়। সে একা থাকতো বলে ওটা ছিল সাহস ও শক্তি। সেদিনও টাকা চাওয়া নিয়ে ঝগড়া। মাইকেল কটেজ থেকে বের হ'য়ে যায় রাগ করে। বাইরে

সে থাকবে না। মাঝরাতে এসে আবার ঝঞ্ঝাট বাধাবে। এই নিয়ে অশান্তি হ'ল আমার মনে। ভাবলাম ওকে ভয় দেখাই আত্মহত্যা করব বলে। সে যেই কটেজের বাইরে বেরিয়েছে? তেমনি গুলির আওয়াজ করি ঘরের মধ্যে এবং আমি জানালা দিয়ে দেখি মাইকেল ভেবেছে কিনা যে আমি আত্মহত্যা করেছি। সেই গুলিটা দেওয়ালে লাগে। মাইকেল ফিরে এসেছে। আমার হাতে রিভলবার দেখে ভয় পেয়ে ধরেছে সেটা। টানাটানি চলতে চলতে কোন এক সময় গুলি বেরিয়ে তা লেগেছে মাইকেলকে। জখম অবস্থায় পড়ে সে বারবার বলেছে—ডাক্তার ডাকো এক্ষুনি। আমি বলব তোমার কোন দোষ নেই। আমি বেরিয়েছি গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে দেখি মাইকেল মারা গেছে। তাকে জেরা করেছেন সরকার পক্ষের ক্লার্ক। কিন্তু শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বার্নে মানসিক ধৈর্য অনেকটা হারিয়েছে। জেরা শেষে প্যাট্রিক হেস্টিংস উঠে দাঁড়িয়েছেন। রিভলবারটা কোর্ট কর্মচারী টেবিল থেকে তুলে বার্নের সামনে। কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে বললেন—মিসেস বার্নে রিভলবারটা হাতে নিন। হতচকিত বার্নে ডান হাত দিয়ে রিভলবারটা তুলে নিল। আদালত কক্ষ নিস্তব্ধ। জুরিরা ভাবছেন হয়ত প্রতিবেশী সেই সাক্ষীর কথা। সে বলেছিল বার্নে বাঁ হাত দিয়ে গুলি করেছিল।

সরকারপক্ষ বক্তৃতায় বলেছেন বার্নের প্রথম জীবনের কথা। উচ্চবংশে জন্ম তার। বেলগ্রেড স্কোয়ারে বাবার যেমন বাড়ি ছিল তেমনি সাসেক্সেও। অতি ধনী পিতার সুন্দরী আদুরে কন্যা। মুখাবয়বে সৌন্দর্য এবং দেহের প্রতিটি অংশ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। [খ্যাতিমান ইংরাজ লেখকের ভাষায় "She had animal energy, natural intellegence. All these assets she threw headlessly away] বিচিত্র চিন্তাধারা ও জীবন যাপন বার্নের শুরু যৌবনে পা দিতেই। চলচ্চিত্রের নায়িকা হবার বাসনা থাকায় স্বাস্থের থেকে গ্লামারে মন বেশী। প্রেম করে বিয়ে হোটেলের এক গায়ককে। প্রথম দর্শনেই সে প্রেম তা স্থায়ী হয় বিয়ের পর। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং স্বামীর দেশত্যাগ। তারপর থেকে ছন্নছাড়া জীবন। তার কটেজ হয়ে পড়ে মধুকুঞ্জ। তার দৈনন্দিন জীবন ধারা উত্ত্যক্ত করেছে সব প্রতিবেশীর জীবন বার্নে ও মাইকেলের নিত্য ঝগড়া বিতণ্ডা। দুজনেরই আকণ্ঠ মদ্যপান।

মাননীয় জুরিবৃন্দ,

বার্নে আজ যে গল্প শুনিয়েছে তা রঙীন কল্পিত কাহিনী-আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়। আপনারা যদি বার্নের এই গল্প বিশ্বাস করেন যদি তা সত্যি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে আপনারা সুখী হোন তাকে মুক্তি দিয়ে। কিন্তু প্রতিটি প্রমাণ যত্ন নিয়ে, সজাগ হয়ে এবং হৃদয়াবেগকে সংযত করে যদি পর্যালোচনা করেন তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে কোন বাধা হবে না যে মাইকেলকে সে ইচ্ছাকৃত মৃত্যু উপহার দিয়েছে। বার্নের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ যা প্রতিবেশীরা পেশ করেছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র, ব্যবহার সম্বন্ধে ডা. স্পিলসবেরি ও ডাঃ রবার্ট চার্চিল যে অভিমত দিয়েছেন তাতে বার্নে যে মাইকেল হত্যার একমাত্র অপরাধী তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। আশা করি আপনারা সু বিবেচনা করবেন।

প্যাট্রিক হেস্টিংস ধীরে স্থির। ভাষার কোন অলঙ্কার, মুখের কোন অভিব্যক্তি বা পাণ্ডিত্যের উচ্ছাসের আশ্রয় না নিয়ে শুরু করলেন।

মহামান্য জুরিবৃন্দ, আমি অনুনয় করব সরকার পক্ষের বক্তব্যে প্রভাবান্বিত হবেন না। এতদিন আমাদের গোচরে এসেছে তাঁদের গল্পের বহু অংশ প্রকৃত নয়। বরং অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বার্নের যা চিত্র এঁকেছেন তাতে সে বিলাসবহুল আসবাবপত্র সজ্জিত এক ঘরে বাস করত। আমি অবাক হয়েছি কেন এর উল্লেখ করা হল।

কী প্রয়োজন ছিল? চিন্তায় ছিলাম কী প্রমাণ তাঁরা আনবেন। অপেক্ষায় থেকে দেখলাম কি প্রমাণ এল। নিচের তলার ঘরে দুটো কি একটা চেয়ার। ওপর তলায় একটা খাট। তার পেছনের ঘরে কিছু নেই। ভাবুন এই হল বিলাসবহুল আসবাব ফার্নিচার সমৃদ্ধ ঘর। বার্নে উগ্রমানসিকতার এবং সহজে প্ররোচনা পায়। কেন? সে পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। কিন্তু এক যুবতী আত্মীয়-বন্ধুহীন। কয়েক গজ দূরে তার ভালবাসার জন মৃত পড়ে আছে। একদল পুলিশ তার এই মানসিক অবস্থায় তাকে ঘিরে আছে, জোর করছে থানায় নিয়ে যেতে। এটা সামান্য প্ররোচনা এবং তাতেই তার এত ক্রোধ। ভাবতে অবাক লাগে কোন প্ররোচনা তাহলে গুরুতর।

মিসেস বার্নে নাকি বলেছে আমি গুলি করব। সরকারপক্ষ বার বার বলেছে সেকথা। কিন্তু আপনারা শুনেছেন বেশ কয়েকজন সাক্ষী বলেছে—তারা কী শুনেছে? কেউ শপথ নিয়ে বলতে সাহস করেনি যে তারা শুনেছে বার্নে বলছে তোমাকে গুলি করব। আমি গুলি করব এবং আমি তোমাকে গুলি করব কি এক কথা? তোমাকে না নিজেকে দেখেছে জানালা থেকে রিভলবারের গুলি ছুঁড়েছে বাইরে অথচ কোন চিহ্ন নেই কোথাও। পুলিশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন চিহ্ন পায়নি। বাইরে গুলি ছুঁড়লো তবুও বুলেটের কোন চিহ্ন থাকবে না? এটা কিন্তু সত্যি ঘরের ভেতরে দেওয়ালে বুলেট পাওয়া গেছে। তাতে কি প্রমাণ হয়? মিসেস বার্নে তার প্রেমিককে বোঝাতে চেয়েছে সে কত অসুখী। রিভলবারে আঙুলের ছাপ অস্পষ্ট। কারণ কিন্তু স্পষ্ট। একজনের আঙুলের ছাপের ওপর অন্যজনের ছাপ পড়লে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওতে যদি শুধু বার্নের আঙুলের ছাপ থাকতো তাহলে বলা হত অভিযোগ সুপ্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান কি শুধু সরকারপক্ষের জন্য? অভিযুক্ত বলেই কি তা ব্যবহার করা যাবে না তার পক্ষে। মিসেস বার্নে ডাক্তারের কাছে, পুলিশের কাছে বাড়িতে এবং পরে থানায় যা বলেছে সরকার পক্ষ বার্নেকে সে সম্বন্ধে কোন জেরা করেননি। যদিও নানা বিষয়ে জের বার করে তাকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তাহলে কি আমি বলতে পারি না বার্নে তার অতি প্রিয়জনকে শেষ চুম্বন দিতে চেয়েছে তার মৃতদেহে এক অচিন্তিত পরিস্থিতিতে! তা সে চাইতেই পারে। তার জন্য অন্যের প্রতি রূঢ় হতেই পারে। জেরায় বিপর্যস্ত করার সীমাহীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বার্নে কিন্তু সত্য ঘটনা থেকে একচুল নড়েনি। তার জবানবন্দি আগাগোড়া এক থেকেছে। কোন বিচ্যুতি নেই। মহামান্য জুরি, মিসেস বার্নের কোন কথা কি মিথ্যা মনে হয়? আর যারা যা দেখেছে বলে দাবি করছে তা ধ্রুব সত্য? তারা কি মিথ্যা আদৌ বলেনি? এটাই ভাবার। তার সঙ্গে এটাও ভাবা প্রয়োজন, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ যা আনা হয়েছে তার ভিত্তিতে এটা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। না কি অন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? রিভলবারের ট্রিগার আপনারাও দেখতে পারেন যেমন আমি দেখিয়েছি কত সহজে তা থেকে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। একজন আত্মহত্যা করতে পারে আশঙ্কায় অন্যজন সেটা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করল। টানা-টানির মধ্যে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেল। দুর্ভাগ্য নলের সামনে মাইকেল ছিল। মিসেস বার্নে থাকলে তারই মৃত্যু হ'ত। তারজন্য মাইকেলকে আমি কোনমতেই অপরাধী ভাবতে পারতাম না। বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেছেন সেকথা। তিনি বলেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। এই মামলায় যা আমি উপস্থাপন করছি তা হ'ল যুক্তি। কোন ভাবাবেগের স্থান নেই। ভাবাবেগে আমি বলছি না—আমি চাই অভিযুক্তের জন্য দরজা খুলে দেন সে যেন ফিরে যেতে পারে আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুদের কাছে। দয়া করে মুক্তির দরজা খুলেছেন। আমি বলছি দয়া করে যুক্তির গুরুত্ব দিন। দয়া করে চিন্তা করুন সম্ভব অসম্ভব। আমি বলছি আপনারা সাহস নিয়ে বলুন মিসেস বার্নে মিথ্যা বলেছে

সত্যিই কি মিথ্যা বলেছে? আমি দাবি করি আপনাদের কাছে। বিবেচনা করুন যে প্রমাণ এসেছে তাতে অভিযুক্ত নির্দোষ সাব্যস্ত হবার অধিকারিণী। বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মিসেস বার্নেকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

বিচারক হামফ্রে সব প্রমাণ একে একে তুলে ধরেছেন জুরিদের কাছে। বিচারকের একদিকে যেমন অসীম জ্ঞান আইনের অন্যদিকে তেমনি মানবিক মূল্যবোধও সীমাহীন। আইন তাঁর মতে মানুষের মঙ্গলের জন্য। তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেছেন আইন জীবনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হোক। মিসেস বার্নে ভাগ্যবতী। কারণ বিচারক দয়ালু কিন্তু ক্ষমাশীল নন। যুক্তিনির্ভর কিন্তু ভাবাবেগশূন্য। তিনি তাঁর নিজের মতামত জুরি মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেননি। শুধু জোর দিয়ে বলেছেন—যদি আপনারা মনে করেন এবং সন্তুষ্ট হন যে প্রমাণ যা এসেছে তাতে অভিযুক্ত ইচ্ছাপূর্বক খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলি করেছে মাইকেলকে তাহলেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন। সেখানে সহানুভূতি, করুণা বা মমতার কোন স্থান নেই। কর্তব্যে অবহেলার কোন প্রশ্রয় নেই। আবার এটাও ভাবার আছে—আমাদের কতখানি যুক্তি আছে অভিযুক্তার জবানবন্দী মিথ্যা বলার? আর জবানবন্দী যদি অসঙ্গত না হয় ঘটনা ও প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে সে জবানবন্দীকে শুধু এই কারণেই অগ্রাহ্য করা যাবে যে সে বিচারাধীন? আপনাদের এও দেখতে হবে যে ইচ্ছাপূর্বক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা অথবা অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর ঘটনা যাকে বলা হয় ম্যানস্লটার। তা ইংল্যান্ডের আইনে দণ্ডনীয়। প্রমাণ দৃষ্টে যদি সিদ্ধান্তে আসা যায় অভিযুক্ত আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে সেটাও অপরাধ। কিন্তু মৃত ব্যক্তি সেই রিভলবার কেড়ে নিতে গেলে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাও কম শাস্তি হয় এমন আইনে পড়ে। এসব কিছুর আগে একটা বিধান আইনের সব সময় মনে রাখতে হবে। সরকারপক্ষকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে অভিযোগ। সেখানে ত্রুটি থাকলে অভিযুক্ত তার ফল পাবার অধিকারিণী।

সামিং আপ বা সার্বিক বক্তব্য শেষ হল। বারোজন জুরি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন। তখন বেলা তিনটে। অপেক্ষমান সকলে। চোখ বন্ধ দরজার দিকে ঘন ঘন। মিসেস বার্নের মনে তখন হয়ত আলোড়ন চলছে। বাইরের মুখ শান্ত। যে প্রকৃত দোষী হয় তার মনের মধ্যে আলোড়ন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কী হয় তা জানার উপায় থাকে না। যে নির্দোষ তার মনে যে দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে যায় তা অনুমান করা যায়। তার বাইরের চেহারা শান্ত থাকাও অস্বাভাবিক নয়। ওদিকে জুরিদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে চলেছে। নির্দোষকে যদি দোষী সাব্যস্ত করা হয় তার প্রাণদণ্ড হবে। অথবা অন্য অপরাধের জন্য কারাবাস। জুরিদের মনের ঝড় এক সময় থেমেছে। প্রায় বেলা পাঁচটায় দরজা খুলল। জুরিরা তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন। বিচারক এসে তাঁর আসনে বসলেন।

—আপনারা কি একমত হয়েছেন?

—হ্যাঁ—

—অভিযুক্তা দোষী না নির্দোষ?

—"নির্দোষ" জানালেন জুরি প্রধান—মুক্তি পেল মিসেস বার্নে। প্রশংসা পেলেন প্যাট্রিক হেস্টিংস। বিচারক হামফ্রে আগেই বলেছেন আমার এই জীবনে অত সুন্দর মামলা পরিচালনা ও বক্তৃতা যে ব্যারিস্টার করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা দুর্লভ। আমার তা সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। হৃদয়ের কাছে নয়, আবেদন যুক্তিশীল মনের কাছে। মিসেস বার্নে স্বাধীন এক নাগরিক। জনসমুদ্রে বিলীন।

ফিলিস ডিমক

স্যার চার্লস ম্যাথুস সরকারপক্ষে শুরু করলেন ফিলিস ডিমক হত্যা মামলা। অভিযুক্ত রবার্ট উড। প্রথম তিনি জানালেন ডিমক হত্যার আগের ঘটনা। এক দেহোপজীবনী ডিমক কিভাবে উডের সান্নিধ্যে এল। উড এক সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক। ছবি আঁকার এক শিল্পী। শিক্ষিত ও স্মার্ট এবং সুদর্শন। উডের প্রেমিকা রুবি। তারও এক বিশেষ ভূমিকা আছে হত্যার পর উডকে বাঁচাবার জন্য। সেটাও উডেরই অনুরোধে। বিচারক ও জুরিদের ম্যাথুস জানালেন কি প্রমাণ সরকারপক্ষ হাজির করাবেন উডের বিরুদ্ধে।

"আপনারা দেখবেন একজন সাক্ষী রবার্ট ম্যাক ক্রাউনকে। সে উডকে দেখেছে খুনের পর দিন ভোর পাঁচটায় ডিমকের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেতে। সে উডকে যদিও চেনে না, নামও জানে না। কিন্তু তার মুখ না দেখলেও তার চলার ভঙ্গি, কাঁধের ঝাঁকুনি নিয়ে হাঁটা। উডের কথা সে বিষয়ে বলবে পুলিশ। রুবি ইয়াং সেকথা বলবে। টি আই প্যারেড বা শনাক্তকরণের সময় ম্যাক-ক্রাউন অনেকের মধ্য থেকে উডকে শনাক্ত করেছে। আপনারা শুনবেন রবার্ট উড কী কী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ডিমকের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে। দেখবেন একটা চিঠি। হাতের লেখা রবার্ট উডের পাশে তারই আঁকা রাইজিং সান এর ছবি। যে বুধবার রাতে ডিমক খুন হয় সেইদিনই উড সেই চিঠিতে ডিমককে আসতে এবং দেখা করতে বলেছে রাত আটটা পনেরো মিনিটে। রবার্ট উড যে সে রাতে ডিমকের সঙ্গে না থেকে রুবি ইয়াং-এর সাথে ছিল এই মিথ্যা অ্যালিবাই তৈরি করার চেষ্টা করেছে। আপনাদের সামনে একে একে আসবে সেই সব সাক্ষী যারা প্রকাশ করবে সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রমাণেই রবার্ট উডই ডিমকের হত্যাকারী।

সরকারপক্ষ প্রথম ডাকলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার আর্থার গ্রসকে। প্রমাণ করলেন গ্রস একটা স্কেচ ম্যাপ। ম্যাপে দেখানো হয়েছে সেন্টপলস রোড এবং রাইজিং সান। রেলের একটা সাইডিং সেখানে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের আলো। কিন্তু আর্থার গ্রসকে জেরায় স্বীকার করতেই হ'ল যে ভোর পাঁচটার আগেই সে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ে সাইডিং রাস্তার থেকে চল্লিশ ফুট নীচে এবং রেলওয়ের নয়ফুট উঁচু একটা দেওয়াল আছে। মার্শাল হল সাক্ষী জেরার মধ্যে দিয়ে অবিশ্বাসের একটা ভিত্তি তৈরি করলেন। সরকারপক্ষ মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছেন শুধু এই কারণেই ম্যাক কাওয়ান সেই আলোয় উডের মত এক মানুষের হাঁটা দেখে শনাক্ত করতে পারে। জুরি মনে সন্দেহ দিয়ে যাতে শুরু হয় বিচার-বিবেচনা। তারপর এসেছে বাট্রাম শ' যে স্বামীর মত বাস করত ডিমকের সঙ্গে একটা ফ্ল্যাটে এবং যেখানে ডিমকের মৃতদেহ দেখা যায়। জাহাজের এক কুক এসেছে একটা চিঠির ছেঁড়া অংশ এবং হাতের লেখা প্রমাণ করতে। ম্যাক কাওয়ান এসে বলেছে রেলওয়ে সাইডিং-এর আলোয় যে হেঁটে যেতে দেখেছে একটা মানুষকে উনত্রিশ নম্বর রাস্তায় ফ্ল্যাটের গেট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। রুবি ইয়াং ও অন্যান্য সাক্ষীর পর সরকারপক্ষ প্রমাণের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। অভিযুক্ত রবার্ট উডের পক্ষে বক্তব্য পেশ করবার জন্য, দাঁড়িয়েছেন সেকালের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মার্শাল হল।

মহামান্য জুরিবৃন্দ

বিগত চারদিন ধরে আপনারা শুনেছেন সরকারপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী। আপনারা হয়তো ভেবেছেন আমি সাক্ষীদের জেরার সময় সীমা লঙঘন করেছি, রূঢ় হয়েছি তাদের প্রতি। আমাকে তার জন্য ক্ষমা করবেন। যা কিছু করেছি তা অভিযুক্তের স্বার্থে, আইনের চার

দেওয়ালের বেড়াজালে। সাক্ষীদের হারাবার কিছু নেই যা অভিযুক্তের হারাবার আছে।

আমি গর্বিত ইংল্যান্ডের মানুষের সুবিচার পেতে সাহায্য করার দায়িত্ব আমাদের মতো আইনজীবীর কাঁধে, তাঁদের জীবন বাঁচানোর গুরু দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত। কোন নির্দোষ ও নিরপরাধীর যাতে শাস্তি না হয় সে গুরুদায়িত্ব এখনও আমি বহন করে চলেছি। শীঘ্রই সে দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে।

জেন্টলমেন আপনারা শুনেছেন ফিলিস ডিমক এক দেহোপজীবনী। শুধু দেহ ব্যবসা নারীর জন্যই নয়, যৌন উপভোগও ডিমকের এক বৈশিষ্ট্য। রাস্তায় গ্রাহক সংগ্রহ করে তাকে নিয়ে ডিমক যেত কোন না কোন স্থানে। আয় ও উপভোগ নিয়ে চলতে নানা বাধা ও অসুবিধা আসতো। এমনই এক সময়ে ডিমক সংস্পর্শে আসে বার্ট্রাম শ'এর। বার্ট্রাম রেলওয়ে ডাইনিং কারে চাকরি করত। তারা দুজনে বাসা ভাড়া নেয় ক্যামডেন টাউনে উনত্রিশ নম্বর রাস্তার ওপর। বার্ট্রাম ডিউটি করতে যেত সন্ধ্যায়। ট্রেন যেত শেফিল্ড পর্যন্ত সেখানেই রাত্রিবাস। ফিরতো ভোরের দিকে। ফ্ল্যাটে আসতে বেলা আট নটা হয়ে যেত। ডিমকের পক্ষে সেটা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। সে স্বাধীনভাবে তার গ্রাহকদের আনতে পারত সেই ফ্ল্যাটে। রাত্রিশেষে তারা চলে যেত। বার্ট্রামের কোন সন্দেহের কারণ থাকতো না। বারই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রির শেষদিকে কোন এক সময়ে ডিমককে হত্যা করা হয়। সকাল এগারোটা নাগাদ বার্ট্রাম ফেরে ডিউটি শেষে। ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাট খুলে ডিমকের মৃতদেহ দেখতে পায়। সরকারপক্ষ বলতে চান মৃত্যুর আগের শুক্রবার, শনিবার, সোমবার এবং বুধবার রাত্রিতে রবার্ট উড ও ডিমক হয় রাইজিং সান অথবা ঈগলে একসঙ্গে ছিল। উডের সঙ্গে ডিমকের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এই কয়দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক দেহোপজীবিনীর কাছে নানা মানুষই আসে। পুরনো ও নতুন গ্রাহক। ডিমকের মৃত্যুর সময় রাত চারটে থেকে সকাল ছ'টার মধ্যে। এটা ডাক্তারি মতামত। তাহলে সরকার পক্ষকে প্রমাণ করতে হয় রবার্ট উড সে সময় ডিমকের সঙ্গে ছিল এবং ডিমককে হত্যা করার একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ ছিল। এই দুটো প্রমাণই অপরিহার্য। প্রথমটা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে ম্যাক কাওয়ানকে এনে। সে নাকি চওড়া কাঁধ ঝাঁকানী দিয়ে হাঁটা একজনকে দেখেছে ভোর পাঁচটা বাজতে বারো মিনিট আগে বাড়ির গেট থেকে বেড়িয়ে যেতে। রেলওয়ে সাইডিং-এর জোর আলো চিনতে তাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে আলো নিভে যায় সাড়ে চারটেয় এবং সে আলো আসে না আদৌ উনত্রিশ নম্বর স্ট্রিটে। সেটা রেলওয়ে সাইডিং-এর বহু উঁচুতে এবং উঁচু প্রাচীর তা আড়াল করে। জেন্টলমেন অব দি জুরি বিবেচনা করুন মিথ্যা প্রমাণের কি অপচেষ্টা। জাহাজের কুক বলেছে ডিমক তাকে একটা পোস্ট কার্ড ও চিঠি দেখিয়েছিল। সে চিঠিতে কি লেখা ছিল? স্মৃতি থেকে সে বলেছে তাতে লেখা ছিল—প্রিয় ফিলিস, তুমি ঈগল বারে রাত্রি সাড়ে আটটায় আজ বুধবার আমার সঙ্গে দেখা করবে—ইতি বার্ট। তাকে আমি প্রশ্ন করেছি—মে ক্যামবেল নামে কোন মহিলাকে সে চেনে কি না? কতক্ষণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সে সময় নিয়েছে, আপনারা তা দেখেছেন। অবশেষে সে স্বীকার করেছে। শুধু চেনা নয়। সে বলতে বাধ্য হয়েছে প্রকৃত সত্য। মে ক্যামবেল তাকে ডিমকের পুরুষ বন্ধুর চেহারার বিবরণ দিয়েছে এবং সেই চেহারার বিবরণ অভিযুক্ত উডের সঙ্গে মেলে। তারপর সে উডকে শনাক্ত করেছে। কোথায় সেই মে ক্যামবেল? কেন তাকে আনা হ'ল না। আপনারা শুনেছেন জাহাজের এই কুকের সঙ্গেও ডিমকের একটা সম্পর্ক ছিল। ডিমকের হত্যা সংবাদে সেও বিচলিত হয়েছে। কেন? কারণ রাইজিং সানে সেও রবি, সোম ও মঙ্গলবার রাত্রিরে ডিমকের সঙ্গে কাটিয়েছে। সে বলেছে ডিমক বুধবার সকালে

সদ্য পাওয়া চিঠিটা দেখিয়েছিল এবং রাইজিং সান পোস্টকার্ডটা ঐ চিঠির সঙ্গে মেলাতে বলেছিল। কেন ডিমক বলবে সে কথা। বিশেষত এমন একজনকে যার সঙ্গে পরিচয় মাত্র তিন চার দিন আগে থেকে। আপনাদের কি মনে হবে না এই চিঠির গল্প একটা আবিষ্কার। কে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়? জাহাজের কুক? বাট্রান্ড শ? সরকারপক্ষ বলেন বিশ্বাস করুন ম্যাক কাওয়ানকে। সে যে চওড়া কাঁধ মানুষকে দেখেছিল অভিযুক্ত উডের কাঁধ আদৌ চওড়া নয় তা আপনারা দেখেছেন। সেও তা স্বীকার করেছে। অভিযুক্তকে ওভারকোর্ট পরিয়েও দেখা হয়েছে।'চেহারার বর্ণনার সঙ্গে আদৌ মেলে না। দেখার সময় সে বদলাবার চেষ্টা করেছে। কারণ ইন্সপেকটার তার আগেই বলে গেছে যে আলোয় চেনা তা আধঘণ্টা আগেই নিভে যায়। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দিতে সে বলেছিল সময়টা ভোর পাঁচটায়। তখন তো অন্ধকার। আলোর প্রয়োজনে স্কেচ ম্যাপ এবং সময়ের পরিবর্তন। জাহাজের কুককে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে তার এক বন্ধুকে সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছে। সে কী প্রমাণ করতে চেয়েছে? কুক তার সঙ্গে বুধবার রাতে একসঙ্গে হোটেলে ফিরেছিল। আপনারা শুনেছেন কুক বুধবার রাতে কোথায় ছিল তা নিয়ে চিন্তিত। বন্ধুকে তাই আজই—বলতে হবে সে বন্ধুর সঙ্গে ছিল। তাকে প্রশ্ন করেছি কুকের সঙ্গে কতদিনের আলাপ। উত্তর আটই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ডিমকের মৃত্যুর আগের রবিবার। কুক সেই বন্ধুকে বলেছে ডিমকের সঙ্গে সোমবার, মঙ্গলবার ও রবিবার রাত্রি এক বিছানায় কাটিয়েছে। কথায় কথায় কুক তা বলেছিল। আশ্চর্য সদ্য আলাপ হওয়া একজনকে গোপন রাত্রিবাস এক দেহপসারিণীর সঙ্গে অকপটে বলা।

জেন্টলমেন, রবার্ট উডকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এনেছি। সে বলেছে তার কথা আপনারা শুনেছেন সে মিথ্যা বলেছে আগে। কেন মিথ্যা বলেছে বুঝি না। চিন্তা করুন ডিমকের মৃত্যু হয়েছে বাত্রি চারটে থেকে সকাল ছটার মধ্যে। উড রুবিকে অনুরোধ করেছে বলতে যে সে তার সঙ্গে ছিল রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। এটা খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার এলিবি হতে পারে না যদিও ঈগল বারে ডিমকের সঙ্গে থাকার একটা এলিবি নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু খুনের এলিবি আদৌ নয়, প্রয়োজনও ছিল না রুবিকে অনুরোধের মিথ্যা বলতে। ডিমকের মৃত্যে রাত্রি এগারটার আগে হ'লে এবং উডের তা জানা থাকলে এই মিথ্যা ভাষণের একটা প্রয়োজন ছিল। তা তো নয়। ডিমকের মতো দেহোপজীবিনীর সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে পড়ার লজ্জা উডের বেশি। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সে। শিক্ষিত এক যুবক। অঙ্কন শিল্পে কিছু খ্যাতিও তার আছে। ডিমকের হত্যার সঙ্গে পুলিশ খোঁজ নেবে তার গ্রাহকদের সম্পর্ক নিয়ে। উড দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্পর্শে আসে ডিমকের মাত্র কয়েক দিন আগে। হোটেলের বারে দুজনে গল্প করেছে কয়েকটা সন্ধ্যায়। সঙ্গে বন্ধু ছিল। ডিমকের অনুরোধে কয়েকটা লাইন হয় তো লিখেওছে। সেই হাতের লেখাকে যদি অসংলগ্ন ও ছেঁড়া পাতার লেখার সঙ্গে তুলনা করে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে ইংল্যান্ডের বিচার ব্যবস্থার যে সম্মান তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হাঁ, উড মিথ্যা বলেছে। রুবি ইয়াংকে মিথ্যা বলতে অনুরোধ করেছে বন্ধুকে অনুরোধ করেছে। এসব তো শুধু এক ঘৃণ্য পেশার নারীর নামের সাথে তার নাম যুক্ত না হয়। খুনী সন্দেহে পুলিশ তাকে বিচারের জন্য না পাঠায়, খুন না করেও শুধুমাত্র ডিমকের সঙ্গে পরিচয় থাকার সূত্রে বিচারের মুখোমুখী না হ'তে হয় এই সব কারণেই এ মিথ্যাচার।

মহামান্য জুরি,

সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমি বারবার উডকে প্রশ্ন করেছি—তুমি কি ডিমককে খুন করেছ? সে বলেছে, না। তাকে জেরা করা হয়েছে চিঠির হাতের লেখা সম্বন্ধে। যে উত্তরই সে দিক

না কেন, তাতে কি প্রমাণ হয় যে সে ডিমককে খুন করেছে। নিশ্চয় নয়। খুনের কোন কারণও নেই। চিন্তা করুন ফিলিস ডিমকের জীবন ধারা। বাট্রাম শ' এল তার জীবনে। বিয়ে হ'ল না তাদের। কিন্তু বসবাস এক স্থানে। যেন স্বামী স্ত্রীর জীবন। স্ত্রী রান্না ও সংসারের অন্য কাজ করে। স্বামী শুধু অর্থ দেয়। কিন্তু প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু ডিমক চায় আরো কিছু। দেহ ব্যবসা তার কাছে শুধু নেশা নয়। তার নিজস্ব এক তৃপ্তির পথ। বাট্রাম শ'-এর কর্মজীবন কাটে রাত্রির ট্রেনে ডাইনিং কারে। রাত্রিটা ডিমকের শুধু নিজের। যে অভ্যাস সে অর্জন করেছিল যৌবনের প্রারম্ভে দেহকে পুরুষের স্পর্শের অনুভূতি দিতে তা নিয়ে যায় তাকে রাস্তায়। আর্থিক অনটন যেমন তাকে বাধ্য করে দেহ ব্যবসায় তেমনি তার নারীত্বে তৃপ্তির আস্বাদ তাকে বাঁধনহারা জীবনে পৌঁছে দেয়। এমনি এক অবস্থায় বাট্রাম শ' তাকে দেয় আশ্রয় যেটা তার কাছে খুবই জরুরী ছিল। সেই আশ্রয় তাকে প্রলুব্ধ করেছে রাস্তা থেকে নানা মানুষকে আনতে। উপার্জন এবং আনন্দের অনুভূতি একসঙ্গে পেয়ে ডিমক যে আশ্রয়কে কাজে লাগিয়েছে। সেই আশ্রয়েই মৃত্যু তাকে টেনে নিয়েছে কাছে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে যাদের সঙ্গেই সে রাত কাটাক না কেন অন্য কোন পূর্বেকার মানুষের যে হাত নেই কে বলতে পারে? সত্যিই কি তদন্ত হয়েছে এই খুনের ম্যাক কাওয়ানকে তালিম দিয়ে আদালতে আনলেই কি বলা যাবে উপযুক্ত তদন্ত। রাইজিং সান বা ইগল বারের মধ্যেই কি তদন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। বুধবার রাত্রির কোন সময়ে ডিমক ও উঠকে কেউ দেখেছিল ডিমকের অ্যাপার্টমেন্টে আসতে? কোন তদন্ত কি হয়েছে? হওয়া উচিত ছিল। উড কি কি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার ওপর নির্ভর করে আর ম্যাক কাওয়ান সে মানুষের হেঁটে যাওয়া, চওড়া কাঁধ ঝাড়া দেওয়া এবং সেটা মনে রেখে একজনকে শনাক্ত করার মধ্যেই হত্যার প্রমাণ শেষ করলেই কি বিবেককে ঠিক রেখে উডকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ঠিক হবে। বিবেচনা করবেন সব কিছু।

জেন্টলমেন অব দি জুরি। বাট্রাম শ'-এর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো স্মরণে আনবেন। সে ডিমকের মৃতদেহ দেখার পর কোন রাত্রি বা দিন সেখানে বাস করেনি। তার যাবতীয় ব্যবহারী জিনিস সে নিয়ে চলে গেছে অন্যত্র। ডিমকের যা কিছু ছিল তা আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কোন চিহ্ন আর সেখানে থাকেনি যা থেকে বোঝা যাবে যে তারা দুজনে কখনও সেখানে বাস করেছে। বার বার দেখেছে আর কিছু পড়ে থাকল কি না। দেখতে পেয়েছে একটা পিকচার পোস্টকার্ড যাতে নাম সই আছে 'এলিস' যার কোনে আঁকা সূর্য ওঠার মুহূর্ত। কোন কিছু কি সন্দেহ হবে না? আমি বলছি না বাট্রাম শ' ডিমককে হত্যা করেছে। কিন্তু এটাও কি ভাবা যায় যে রাতের পর রাত ডিমক অ্যাপার্টমেন্টে কোন না কোন লোক এনেছে। উপভোগ করেছে তার সান্নিধ্য, অর্থও পেয়েছে। বাট্রাম শ' তা কোনদিনই জানতে পারেনি। সুযোগের তো অভাব ছিল না তার। কোন মানুষকে নিয়োগ করে হত্যা করানো। সে কিন্তু নিরাপদ। কারণ রাত্রিতে সে বহুদূরে। ডাইনিং কারে। ডিমককে সে স্ত্রীব মর্যাদা দিয়েছে। প্রেম ভালবাসার কোন ঘাটতি নেই। সংসার চালাবার যাবতীয় ব্যয় সে বহন করে। হঠাৎ সে যদি দেখে সে ব্যভিচারিণী এবং পূর্বেকার বৃত্তি সে ত্যাগ করতে তো পারেই নি, বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছে তারই আশ্রয়ে, তাহলে? সন্দেহের আঙুল তো তার দিকেই যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তো আমি বলতে পারি না তার প্রাণদণ্ড হোক। সন্দেহের আঙুল আছে জাহাজের কুকের দিকেও। সেও তো ডিমকের সঙ্গে বিছানায় রাত কাটিয়েছে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে। তিন রাত্রি। বুধবার, বৃহস্পতিবারের রাত্রিতেই শুধু সে আসেনি। সে বলেছে। আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য? তবুও সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না। কিন্তু অভিযুক্ত উড? সে যে কোনদিন

রাত্রিবাস করেছে ডিমকের সঙ্গে একথা তো কেউ বলেনি। যে ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে দ্বিতীয় চাবি দিয়ে বাট্রাম শ' দরজা খুলেছে সে কেন আসেনি আমাদের কাছে। আমরা কেন অবিশ্বাস করব উডের বাবাকে। সে রাত্রিতে উড বাড়িতেই ছিল।

মহামান্য জুরি। বিবেচনা করবেন বিচারের এই সব দিক। আমি আশা করব আপনাদের সুবিবেচনা থেকে বঞ্চিত হবে না রবার্ট উড। ইংল্যান্ডের বিচারের ইতিহাসে জুরি এক বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই ঐতিহ্য বজায় থাকবে এ আশা দুরাশা নয়। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় যে বিধি আছে তাতে শতকরা নিরানব্বুই জন দোষী মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু একজন নিরপরাধেরও যেন শাস্তি না হয়। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

মার্শাল হল তার আবেদন শেষ করলেন। বার জন জুরি তাঁদের নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন। না। কোন দীর্ঘ প্রতীক্ষা নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন। মিঃ জাস্টিস গ্রান্থাম প্রশ্ন করলেন—ফোরম্যান অব দি জুরি। আপনারা সকলে সহমত হ'তে পেরেছেন?

ফোরম্যান বললেন—আমরা সহমত।

—কি সিদ্ধান্তে এসেছেন? অভিযুক্ত দোষী না নির্দোষ?

—নির্দোষ।

মুক্তি পেল রবার্ট উড।

বার্টলে হত্যা মামলা

এডউইন বার্টলেকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় স্ত্রী এডেলেইড বার্টলে। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে এডউইনের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এক বৈচিত্র্যময় সে মামলা। হোটেল রেস্তোরাঁ সংবাদপত্র মুখর হয়েছিল সেই হত্যাকাণ্ড নিয়ে। এডওয়ার্ড ক্লার্ক বিখ্যাত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার হিসেবে। এডেলেইড মামলা ক্লার্কের আইন পেশার জীবনে দিয়েছিল ইউরোপ জুড়ে খ্যাতি ও প্রশস্তি। এডউইনের সাথে এডলেইডের বিয়ে হয় ১৮৭৫ সালে। তারপর তার পরিচয় মিসেস বার্টলে। বিয়ের আগে তার পরিচয় যেটুকু জানা যায় তাতে সে ছিল তার ইংরেজ বাবা ও ফরাসি মায়ের জারজ সন্তান। অতি অল্প বয়স থেকেই ইংল্যান্ডে মানুষ। কিন্তু বাবা প্রভূত অর্থশালী। কোন কিছুর অভাব তো দেয়নি তাকে তার বাবা। বরং প্রাচুর্যেই তার জীবন কেটেছে। বিয়েতে যে অর্থ এনেছে তাতে এডউইন ব্যবসার মূলধন পেয়েছে। বিবাহিত দশ বছরের জীবনে সে মূলধন এডউইনের ব্যবসাকে দশগুণ বাড়িয়েছে। মিসেস বার্টলেকে প্রকৃতি সৌন্দর্যে অপরূপ করেছে। এডউইনের ইচ্ছায় লেখাপড়া শুরু করেছে মিসেস বার্টলে স্কুলের মেয়ের মতো। বিবাহিত জীবন তাদের দু'জনের কাছেই ছিল সুখের। আজীবন এই দম্পত্তির সুখের কোন কমতি হয়নি। তাদের এই সুখী জীবনকে এডউইনের বাবা সুনজরে দেখেনি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা একই মনোভাব দেখিয়েছে। এই দম্পতির জীবনে-এর মধ্যে একজনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তিনি রেভারেন্ড ডাইসন। এক ধর্মযাজক চার্চের। কালেভদ্রে সে বাড়িতে আসার শুরু হলেও, রেভারেন্ড সম্পর্কে আরো

নিবিড় হয়েছে ধীরে ধীরে। রেভারেন্ডের প্রেমিকা মিসেস বার্টলে হয়েছিল এটা যেমন জোরের সঙ্গে বলা যায় না, তেমনি যদি তা হয়েও থাকে তাহলে তা শেষ পর্যায়ে এটা সন্দেহ না করেও পারা যায় না। তবে এটা ঠিক প্রথম দিকে মিসেস বার্টলে রেভারেন্ডকে কোন প্রশ্রয় দেয় নি। এডউইন এক বিচিত্র মানসিকতায় রেভারেন্ডের যে আসক্তি মিসেস বার্টলের প্রতি তাকেও যেন সমর্থন করত। রেভারেন্ডের এই মেলামেশায় খুশির ভাব দেখাতো।

একদিন ডাঃ লিচ সংবাদ পেলেন এডউইনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিবেশী ডাঃ লিচ তার আগে মাত্র কিছুদিন এডুইনের চিকিৎসা করেছিলেন। এডুইন তার আগে কোন দিন অসুখে পড়েনি বরং জীবন বিমার সার্টিফিকেট অনুযায়ী এডউইন স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। মৃত্যুর মাত্র একুশদিন আগে তার অসুখের সূত্রপাত হ'ল ক্লান্তি থেকে। আগে কখনও এমন হয়নি। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও দিনের শেষে যখন ফিরতো তখনও উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু সেদিন কী হল এডউইন কর্মশেষে বাড়ি ফিরে সোফায় শুয়ে পড়ল। মিসেস বার্টলে চিন্তিত হয়ে ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব দিল এডউইন সম্মতি দিল। ডাঃ লিচকে কেউ চিনতে না তার আগে। প্রতিবেশী হিসেবে তাকেই ডাকা হ'ল। ডাঃ লিচ দেখলেন। রোগীর শরীরে মার্কারি জাতীয় বিষ আছে বলে সন্দেহ হ'ল। চিকিৎসা ও ওষুধে বিষ মুক্ত হ'ল শরীর। কিন্তু নানা প্রতিক্রিয়া রয়ে গেল। শরীর দুর্বল হল। অনিদ্রা একটা অস্বস্তির কারণ হল। মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেসন হ'তে শুরু করল। পনেরো দিনের মাথায় দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হল এডউইন। ডাঃ লিচ চিকিৎসা করতে থাকলেন। এমনই এক সময়ে এল মৃত্যুসংবাদ এডউইনের। মৃতদেহ দেখলেন। মৃত্যুর ঠিক কারণ বোঝা গেল না। কোন ডেথ সার্টিফিকেট তিনি দিতে রাজি হলেন না। ময়নাতদন্ত চাইলেন। কারণ মৃতদেহ থেকে একটা গন্ধ নাকে আসছিল। পরের দিন ময়নাতদন্তও হল ডাঃ লিচের উপস্থিতিতে। কোন ক্ষত, জখম নেই, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য সব কিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা গন্ধ শুধু পাওয়া গেল। সে কারণে শরীরের কিছু অংশ পাঠানো হল পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে। শরীর থেকে যে গন্ধ পাওয়া গেল তা ক্লোরোফর্মের বলে অনুমান করা গেলেও তা গোপন রাখা হল। কিন্তু ডাঃ লিচ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে মিসেস বার্টলেকে বলে ফেলেছিলেন। ভবিষ্যতে তার যে কী পরিণাম হবে ডাঃ লিচ তা কল্পনাও করতে পারেন নি। একদিন বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া গেল। পুলিশী তদন্ত শুরু হ'ল।

রেভারেন্ড ডাইসন তদন্ত কালে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রকাশ করলেন মিসেস বার্টলে ভুল বুঝিয়ে ক্লোরোফর্ম আনিয়েছিল। সবিস্তারে বর্ণনা করলেন এডউইন পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা কিছু কিছু গোপন রেখেই। এক সপ্তাহ ধরে তদন্তের পর মিসেস বার্টলে অভিযুক্ত হল এডউইনকে হত্যার দায়ে। রেভারেন্ড ডাইসন যে আশায় মুখ খুলেছিলেন সে আশা পূরণ হ'ল না। মিসেস বার্টলের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে রেভারেন্ড গ্রেপ্তার হলেন। মিসেস বার্টলে আইনের উপদেশদাতার পরামর্শে মুখ খোলেনি আগে।

রেভারেন্ডের সঙ্গে বার্টলে দম্পত্তির পরিচয় হয় চার্চে। প্রথম প্রথম চার্চেই যা কিছু কথা ও মেলামেশা। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকলে রেভারেন্ডের যাতায়াত চলে তাদের বাড়িতে। সেই যাতায়াত মিসেস বার্টলের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। এডউনের এই সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল। এডউইনের চিন্তাধারায়ও এক বৈচিত্র্য ছিল। বার্টলের সঙ্গে এডুইনের প্রেম ছিল প্লেটোনিক, দেহের আকর্ষণহীন। এডউইন একটা উইল করে ছিল। সেই উইলের নির্দেশ অনুযায়ী এডউইনের মৃত্যুর পর বার্টলেকে বিয়ে করবে বন্ধু রেভারেন্ড ডাইসন। এডউইন তার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মেলামেশা ও প্রেমকে প্রশ্রয় দিত। এই পরিবারে ডাঃ

লিচ যখন থেকে চিকিৎসক হয়ে এলেন রেভারেন্ডের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। ডাঃ লিচ যেমন মিসেস বার্টলেকে বলে ফেলেছিলেন ক্লোরোফর্মে মৃত্যুর কথা তেমনি রেভারেন্ডকেও বলে ফেলেছিলেন। বিষ প্রয়োগে যে মৃত্যু হয়নি এটা জেনে দুজনেই নিশ্চিন্ত হল অভিযোগ আসবে না হত্যার। রেভারেন্ড ডাঃ লিচের কাছে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেছিলেন মিসেস বার্টলেকে যে, সেই ক্লোরোফর্ম যা তিনি এনে দিয়েছিলেন তা ব্যবহার হয়েছে কিনা? মিসেস বার্টলে জোরের সঙ্গে বলেছিল তা আদৌ ব্যবহার হয়নি। যেমন রেভারেন্ড দিয়েছিল তেমনি রাখা আছে। ও নিয়ে ভাবতে নিষেধ করেছিল মিসেস বার্টলে। রেভারেন্ড কিন্তু তা বিশ্বাস করেননি। তাঁর মনে ভয় বাড়তে থাকে। তিনি জানতেন এডউইনের পেটে খুব যন্ত্রণা হয়। কিন্তু ময়না তদন্তে তার কোন প্রমাণ নেই। শুরু হয় দুজনের মধ্যে ঝগড়া বিতণ্ডা। রাগে ফুলতে থাকেন রেভারেন্ড। বলতে থাকেন আমার জীবন শেষ হয়ে গেল। তিনি এখন স্থির নিশ্চিত যে এডউইন হত্যা মামলায় তিনিও জড়িয়ে গেছেন। অনুশোচনায় ও রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকেন। সব কিছু যা এতদিন গোপন ছিল তা প্রকাশ হয়ে যাবে। এতদিন ধর্মযাজক হিসেবে যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে যখন পৃথিবী জানবে যে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে যে মৃত্যু তা তিনিই এনে দিয়েছেন মিসেস বার্টলেকে। রেভারেন্ড নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে সমস্ত দোষ মিসেস বার্টলের ওপর চাপিয়ে দিলেন।

মিসেস বার্টলের মামলা হাতে নিয়ে এডওয়ার্ড ক্লার্ক বৃটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে দিনের পর দিন পড়াও জানার জন্য কাটালেন। ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ, তার প্রতিক্রিয়া এবং তার প্রমাণ ইত্যাদি নানা বিষয় পড়ে ক্লার্কের ধারণা হয়েছিল হয়তো মিসেস বার্টলে নির্দোষ। মমতা জন্মেছে তার প্রতি। শত শত সৃপিত চোখ যখন তার দিকে তাকিয়ে থাকবে তখন মিসেস বার্টলে যেন একজনকেও তার চোখের সামনে দেখতে পায় যার সহানুভূতি আছে, তার প্রতি। ভরসা পায় যে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যারিস্টারের কোন ত্রুটি হবে না। মামলা শুরুর দিন থেকে মিসেস বার্টলে ঘেরা লোহার গরাদের ভেতর বিধবার কালো পোশাকে এসে বসেছে। মুখে নেই কোন অভিব্যক্তি। রেভারেন্ডও অভিযুক্ত হিসেবে গরাদে। দু'একবার মিসেস বার্টলের দিকে তাকালেও সারাক্ষণ সামনে মুখ রেখে নিজের মনের চাঞ্চল্য ও দুঃখ গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। চোখ তাঁর অন্য কেনো দিকে নয় যেন আর কারো উপস্থিতি তাঁর অজানা। রেভারেন্ডের পক্ষের কুইন্স কাউন্সেল ফ্র্যাঙ্ক লকউড প্রার্থনা করলেন বিচারক উইলসের কাছে—মিসেস বার্টলের সঙ্গে রেভারেন্ডের বিচার ইংল্যান্ডের আইন অনুসারে এক সাথে হতে পারে না। অ্যাটর্নি জেনারেল সে প্রার্থনার বিরোধিতা তো করলেনই না, বরং প্রকাশ্য আদালতে জানালেন যে রেভারেন্ডের বিরুদ্ধে কোন গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ জুরিদের সামনে পেশ করতে অক্ষম। এরপর অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ দোষী না নির্দোষ ও জুরিদের শপথ গ্রহণের পর রেভারেন্ডের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আনা হবে না অ্যাটর্নি জেনারেল জানালেন। বিচারক উইলসের নির্দেশে জুরিরা তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করলে রেভারেন্ড অভিযুক্তের কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে গেলেন মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে, পেছন ফিরে একবারও তাকালেন না। মিসেস বার্টলের সঙ্গে আর কোন বন্ধন থাকলো না রেভারেন্ডের। শুধু বসে থাকলো মিসেস বার্টলে বিচারের প্রতীক্ষায়।

সরকারপক্ষে প্রথম সাক্ষী বৃদ্ধ বার্টলে। পুত্রবধূকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। সাক্ষীর জবানবন্দিতে মিসেস বার্টলের আচরণ ও নানা অভ্যাসের উল্লেখ ক'রে সন্দেহের আঙুল সেই দিকে রেখেছেন। এডওয়ার্ড ক্লার্কও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন

বৃদ্ধের সাক্ষ্যে। তিনি জেরা শুরু করলেন—

—আপনি কি ছেলের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন?

—না—

—বিয়েতে কি আপনার মত ছিল না?

—কেউ আমাকে মতামত চায়নি।

—কী মতামত? বিয়ের কথা না আপনি মত দেবেন কিনা?

—আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি মেয়েটি উপযুক্ত ভেবেছি কিনা?

—আপনি অমত করেছিলেন?

—আমি মত বা অমত কিছুই জানাইনি।

—আপনাকে বিয়েতে আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল?

—না।

—কেন? না কেন?

—কারণ ওরা জানতো আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

—আপনার ছেলে তার উইলে সব কিছু তার স্ত্রীকে দিয়ে গেছে?

বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে বেশ কয়েক মিনিট ভাবলেন।

এডওয়ার্ড ক্লার্ক পরের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

—আপনি আদালতে সেই উইল সম্বন্ধে আপত্তি দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি পুত্রবধূকে অপমান করেছিলেন যখন সে ছেলের সঙ্গে বসবাস করতে আসে?

নিরুত্তর সাক্ষী।

—পরে আপনার দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন লিখিতভাবে?

—হ্যাঁ, তাতে সই করেছি, তবে সেটা মিথ্যা ছিল।

—সেটা মিথ্যা জেনেও আপনি লিখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ বার্টলে যে পুত্রবধূর ওপর বরাবর অসন্তুষ্ট তা প্রমাণ খুব সহজ হয়েছিল তার আরো কিছু উত্তর থেকে। জুরিরা সন্দেহ শুরু করেছেন বৃদ্ধ বার্টলেকে। বিচারক উইলসত্ব তাঁর রায়ে লিখেছেন বৃদ্ধ বার্টলের সাক্ষ্যের ওপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

বার্টলে খুনের মামলায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ—এক বাড়িতে স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া যদি আর কেউ না থাকে এবং স্বামীর মৃত্যু ঘটে এমন এক প্রাণহানিকর দ্রব্যে তাহলে সে দ্রব্য ব্যবহার একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে ছিল রেভারেন্ড ডাইসনের সাক্ষ্য। এই ডাইসন মিসেস বার্টলের সঙ্গে অভিযুক্ত ছিলেন। সবকারপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিয়ে মিসেস বার্টলের বিরুদ্ধে এনেছেন কাঠগড়ায়। মিসেস বার্টলে কি ভাবে ক্লোরোফর্ম পেয়েছিলেন তার একমাত্র প্রমাণ রেভারেন্ড ডাইসন আর এই ক্লোরোফর্মই মিঃ বার্টলের মৃত্যুর কারণ। রেভারেন্ড তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন মিসেস বার্টলে তাঁকে স্বামীর চিকিৎসার জন্য ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করিয়েছিলেন। তিনি সরল বিশ্বাসে বহু কষ্ট করে তা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিনি সন্দেহ পর্যন্ত করেননি মিসেস বার্টলের এত নীচ মনের কথা। জুরিরা রেভারেন্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে রেভারেন্ডের মত এক ধর্মযাজককে অবিশ্বাস করা কঠিন। এডওয়ার্ড ক্লার্কের কাছে একটা বিরাট সমস্যা ছিল এই সহানুভূতি। ক্লার্ক প্রশ্ন শুরু করলেন—

—আপনার সঙ্গে মিসেস বার্টলের যে সম্পর্ক তা তার স্বামীর অজানা ছিল না নিশ্চয়?

—সে তো নিশ্চয়—ডাইসন উত্তর দিলেন।

—আপনি প্রথম থেকেই জানতেন মিঃ বার্টলের এক আজব চিন্তা ছিল বিয়ে বিষয়ে?

—হ্যাঁ—

—মিঃ বার্টলের কি ধারণা ছিল—বন্ধুত্বের জন্য একজন এবং সংসার কর্মের জন্য অন্য একজন স্ত্রীর প্রয়োজন?

—সে ধারণা ছিল।

—আপনি সে ধারণাকে নিশ্চয় ঘৃণা করতেন একারণে যে সেটা বাইবেলের বাণীর বিপরীত?

—বীভৎস ধারণা, অচিন্ত্যনীয় চিন্তাধারা।

—মিঃ বার্টলের কথায় কি এমন আভাস ছিল আপনার সঙ্গে তার স্ত্রীর ভবিষ্যতে বিয়ে দেবার?

—আমার তাই মনে হয়েছিল।

—মিসেস বার্টলে আপনাকে জানিয়েছিল যে তার স্বামীর দেহের ভেতরে একটা অসুখ আছে?

—হ্যাঁ।

—এও বলেছিল একটা জ্বালা ও ব্যথা হয়?

—হ্যাঁ।

—আপনি নিজেও মিঃ বার্টলেকে তার ব্যথার জায়গায় হাত রাখতে দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—সেটা একাধিকবার।

—হ্যাঁ।

—এবং সেটা স্ত্রীর উপস্থিতিতেই।

—হ্যাঁ।

মিসেস বার্টলে যে মিথ্যা বলেননি এবং যা বলেছিল তা সরল মনে তা ক্লার্ক কিছুটা প্রমাণে আনলেন।

—মিঃ বার্টলের সঙ্গে ডোভার বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার?

—হ্যাঁ।

—তখন সে কি বলেছিল অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্তি আসে?

—হ্যাঁ।

—মিঃ বার্টলের প্রথম অসুস্থতার সময় থেকেই আপনি উপস্থিত ছিলেন?

—ছিলাম।

—তার শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—অনিদ্রার কথা বলত আর খুব বিমর্ষ দেখাতো?

—হ্যাঁ—

—মিঃ বার্টলেকে দেখে কি আপনার মনে হ'ত সে কোনদিন সুস্থ হবে না?

—মনে হয়েছিল।

হঠাৎ ক্লার্ক একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। রেভারেন্ড প্রশ্নের পেছনে কি ইঙ্গিত আছে না বুঝেই উত্তর দিয়ে ফেললেন—আমি মিঃ বার্টলেকে ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করার কথা বলিনি।

মনে হয়েছিল মিসেস বার্টলে স্বামীর গুরুতর অসুস্থতার জন্য ক্লোরোফর্ম সংগ্রহের কথা বলা চাইতো না।

—কোন অবস্থাতেই মিসেস সেটা গোপন রাখতে বলেনি?

—না।

—প্রশ্নটা অন্যদিকে ঘোরালেন ক্লার্ক।

—আপনি চার্চ যাবার পথে ক্লোরোফর্ম যে বোতলে এনেছিলেন সেটা পথের ধারে ফেলে দিয়েছিলেন?

—ফেলে দিয়েছিলাম। ভীত হয়ে পড়েছিলাম বিপদে পড়ে যেতে পারি। মনে হয়েছিল আমার আনা ক্লোরোফর্ম মিঃ বার্টলের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে।

—আপনি ভেবেছিলেন আপনার কাজটা যদি প্রকাশ পেয়ে যায় আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন?

—ভেবেছিলাম আমার ভয়টা যদি সত্য হয় তাহলে আমার জীবনে আর কিছু থাকবে না।

—আপনাকে তো ওষুধ আনতে বলা হয়েছিল। আপনি পর পর তিনটি দোকান থেকে ক্লোরোফর্ম কিনে একটা বোতলে তো পুরেছিলেন?

—হ্যাঁ—

—এটা কি একজন কেমিস্টের কাছে পাওয়া যাবে না বলে?

রেভারেন্ড কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

—তিনজন কেমিস্টকেই মিথ্যা বলতে হয়েছিল?

—আমার কিছু মনে নেই। মিসেস বার্টলে বলেছিল এটা তার চাই। আমি বুদ্ধিহীন হয়েছি, নির্বোধ হয়েছি। আই ওয়াজ পারপেলকড্ আই ওয়াজ একফ্রড।

এতক্ষণে ক্লার্ক অনেকটা প্রমাণ করে ফেলেছেন সরকার পক্ষ ভীত হওয়া ডাইসনকে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু একই ভাবে জড়িয়ে পড়ার ভয়ের জন্য মিসেস বার্টলে কি বেশি অপরাধ করল। এরপর রেভারেন্ড যে সম্মান ও শ্রদ্ধার মুখাবয়ব নিয়ে কাঠগড়ায় এসেছিলেন তা, ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ইংরেজিতে তার বর্ণনা "He vanished to loose himself for ever in the nameless multitude"।

ডাঃ লিচ সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছেন মিঃ বার্টলের কতদিন কীভাবে চিকিৎসা করেছেন ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি কী দেখেছেন কেন ডেথ সার্টিফিকেট দেননি, কতদিন চিকিৎসা করেছেন। ক্লার্ক তারপর প্রশ্ন শুরু করেছেন।

—ডাঃ লিচ, আপনি দেখেছেন মিসেস তার স্বামীর পাশে থেকেছে সব সময়?

—হ্যাঁ।

—আপনার কি কোন নার্স রাখার কথা মনে হয়েছিল?

—কোন মুহূর্তেই তো মনে আসেনি।

—আপনি জানেন রাত নেই, দিন নেই সর্বক্ষণ মিসেস স্বামীর বিছানার কাছে থাকতো, এমনকি ঘুমের মধ্যেও?

—সেটা ঠিক।

এরপর নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ক্লার্ক দেখিয়েছেন মিঃ বার্টলে সর্বদা চেষ্টা করেছে আত্মহননের, রোগের বৈশিষ্ট্য ছিল দাঁতের মাড়ির রং, অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁত তুলতে মাড়ি ফাঁক

হয়ে যায় এবং ঘা সৃষ্টি হয়। যন্ত্রণা বাড়তে থাকে।

মিঃ বার্টলে বলেছে তার গলা পর্যন্ত পোকা নষ্ট করছে।

সে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ডাঃ লিচ নিজের থেকেই একটা দিনের কথা বলেন। এক রাত্রি মিঃ বার্টলের কিছুতেই ঘুম না আসায় দু ঘণ্টা ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এটা আমি ভাবতেই পারি না। ক্লার্কের প্রশ্ন—

মিসেস তো চেয়েছিল তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম হোক?

হাঁ—কিন্তু অভিজ্ঞ প্যাথোলজিস্টের অভাবে সম্ভব হয়নি—

মিসেস বলেছিল—কোন ব্যবস্থাই কি করা যায় না।

—বলেছিল।

—তাহলে প্যাথলজিস্টকে সেদিন পাওয়া গেলে বিকেলের মধ্যে তা করা সম্ভব হ'ত?

—নিশ্চয়ই।

এবার প্রশ্ন অন্য বিষয়ে।

—আপনি আগে কখনও ক্লোরোফর্মের প্রয়োগে মৃত্যু দেখেছেন?

—না।

—তাহলে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে মৃত্যু কচিৎ-কদাচিৎ হয়?

—সাধারণত হয় না।

—আপনি নিজে কোন রোগীর ওপর ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করেছেন?

—হ্যাঁ। অন্তত দুশো বার।

—যে প্রয়োগ খুব সাবধানে এবং নিপুণ হাতে করতে হয়:

—নিশ্চয়ই।

—ক্লোরোফর্মের বদলে ইথার প্রবর্তন হয়েছে রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য?

—হয়েছে।

—কেন? বলতে পারেন?

—কারণ ইথার অনেক কম বিপজ্জনক।

—তাছাড়া এটা আরো সুবিধাজনক অর্থাৎ বমির আশঙ্কা কম থাকে।

—হ্যাঁ।

—বিচারক একটা প্রশ্ন করেছেন।

—ক্লোরোফর্মের গন্ধ নাকে দেওয়ার পর ঘনঘন বমি হতে পারে?

—দেওয়ার পর এবং নিঃশ্বাস নেওয়াকালীন বমি হয়।

—খাবার খাওয়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে?

—নির্ভর তো করেই। আমি নির্দেশ দি অন্তত চার ঘণ্টা আগে খাবার খেতে হবে এবং খাবার অবশ্য জলীয় হবে যা সহজে হজম হয়।

—খাবার হজম না হওয়া অবস্থায় ক্লোরোফর্ম দিলে নিশ্চয় বমি হবে?

—হতে পারে।

—হবে কি না বলুন।

—হবেই, বলতে পারব না।

—আমি জানতে চাই আপনি আশা করবেন কি না?

—আমি আশা করব।

সরকারপক্ষের থিয়োরি অনুসারে বাইরে থেকে, নিশ্বাসে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের আগে মি বার্টলের শরীরের ভেতর ক্লোরোফর্ম যায় জলীয় খাবার হিসেবে। প্রমাণ করার চেষ্টা এসেছিল সাক্ষীর মাধ্যমে বিনা ব্যথায় এবং চিৎকারে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু ক্লার্ক একের এক প্রশ্ন বানে সে থিয়োরি ভেঙে দিলেন তার নিজ মুখ দিয়ে। আরো একটা মারাত্মক প্রশ্ন করলেন ক্লার্ক।

—আপনি কখনও কোন ঘুমন্ত মানুষের ওপর ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করেছেন?

—না।

সরকারপক্ষে তারপর এসেছেন ডাঃ টমাস স্টিভেনসন যিনি কেমিক্যাল পরীক্ষা শেষে মত দিয়েছেন। মৃতদেহের পেটের ভেতর একটা ঘা হয়েছিল পুড়ে যায় এই রকম কোন জলীয় পদার্থ দিয়ে। সেটা খাইয়ে দিলে হতে পারে। জলীয় পদার্থটা ক্লোরোফর্ম।

ব্যারিস্টার রাসেলের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ টমাস বলেছিলেন যে মৃতব্যক্তি জীবিত অবস্থায় নিজে অন্য কিছু সাধারণ জিনিস ভবে মারাত্মক এই ক্লোরোফর্ম কোনো মতেই খেতে পারে না। রাসেলের প্রশ্ন—এটা কি সম্ভব—কোন মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে ভেতরে অনুভূতি থাকা কালীন তার গলা দিয়ে এই রকম জলীয় পদার্থ ঢেলে দেওয়া?

—সম্ভব। নিশ্বাসে ক্লোরোফর্ম সাহায্যে অজ্ঞান করার পর জলীয় পদার্থ মুখে ঢেলে দেওয়া বিচিত্র নয়।

—এটা কি খুব কষ্টসাধ্য?

—যদি চিত অবস্থায় মুখ খুলে শুয়ে থাকে তাহলে কষ্টসাধ্য নয়।

এবার ডাঃ টমাসকে মুখোমুখি হ'তে হল ক্লার্কের।

—ডাঃ টমাস, আপনি এমন কোন স্বীকৃত বা—রিপোর্টেড ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন যেখানে জলীয় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে?

—আমি জানি না।

—নথিভুক্ত হত্যার ঘটনা না হ'য়েও দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্লোরোফর্ম খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে?

—হ্যাঁ।

—কতখানি?

—প্রায় বিশটা নথিভুক্ত হয়েছে।

—নিঃশ্বাসে ক্লোরোফর্ম সাহায্যে অজ্ঞান অবস্থায় তা খাওয়ানো হলে—মস্তিষ্ক স্বাভাবিক হবে না, সেখানে খারাপ একটা গন্ধ থাকবে?

—আশা করি।

—আপনার দেখা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলে মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ছিল এবং কোন গন্ধ ছিল না।

—তা দেখেছি।

—ক্লোরোফর্ম নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে গেলে আপনি নিশ্চয় আশা করবেন মস্তিষ্কে একটা গন্ধ?

—সব সময় নয়।

—আপনি গাই অ্যান্ড কেরিয়ারকে অথরিটি বলে মানেন?

—মানি।

—আপনি কি তাদের সঙ্গে একমত যে গন্ধ থাকবে?

—বেশি পরিমাণ ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হ'লে শ্বাসরোধ হবে এবং গন্ধ খুব প্রকট হবে।

—কোন প্রাপ্তবয়স্ককে ঘুমন্ত অবস্থায় নিঃশ্বাসে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করলে ঘুম ভেঙে যাবে?

—সব ক্ষেত্রে নয়।

—ডাঃ ডলবিউ তাঁর বিখ্যাত বই-এ তার উল্লেখ আছে। তিনজনের মধ্যে দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে এটা আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি দেখাতে পারবেন কীভাবে তা খাওয়ানো যাবে?

—হ্যাঁ। অজ্ঞান করার পর এই ভাবে চোখের পাতা তুলে দেখতে হবে এবং বিশেষ এক মুহূর্তের প্রতি খেয়াল রেখে এবং চোখের মণির অবস্থা দেখে তা খাওয়াতে হবে।

—আপনি নিশ্চয় মনে করেন যে পদ্ধতিটা সুকঠিন এবং নিখুঁত ও নিপুণ হাতের প্রয়োজন?

—আমি মনে করি সে এত কঠিন যে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা সফলের থেকে অনেক বেশি।

—আপনি নিশ্চয় মনে করেন খুব ধীরস্থির হাত ও নিপুণতার প্রয়োজন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। তা না হলে যে কোন সময় তা শ্বাসনালী দিয়ে গড়িয়ে পড়বে।

—যদি কোন মোহগ্রস্থ রোগী গলা দিয়ে জলীয় ক্লোরোফর্ম না নিতে পারে তাহলে শ্বাসনালীতে নেমে যাবে তা কিছুটা জায়গা পুড়িয়ে দেবে?

—কিছুটা যাবে।

—তা যদি যায় চিহ্ন থাকবে?

—আমি চিহ্ন আশা করব।

—আপনি কি মনে করেন পোস্টমর্টেম যথাশীঘ্র করা হ'লে মৃত্যুর সঠিক কারণ আরো ভালভাবে প্রকাশ পেত?

—নিশ্চয়ই।

ক্লার্ক বসে পড়লে জুরি প্রধান বিচারকের অনুমতি নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন। সে সব প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ টমাস বলেছিলেন—ক্লোরোফর্ম কিছুটা শ্বাসনালীর মুখে থাকবে যদি সম্পূর্ণটা এক নিমেষে গিলে ফেলা যায়। গলায় থাকবে চিহ্ন যাকে বলে ইরিটেশন, ও ইনফ্লামেশন। সম্পূর্ণ ক্লোরোফর্মটা মুহূর্তের মধ্যে পেটে চলে গেলে কোন চিহ্ন থাকবে না।

জুরি প্রধান এবার পাকা ব্যারিস্টারের মতো প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ যদি কেউ ক্লোরোফর্ম খেয়ে ফেলে তাহলে কোন চিহ্ন গলায়, শ্বাসনালীতে আপনি আশা করবেন না?

—না।

সরকারপক্ষের আর কোন সাক্ষী নেই। এবার জুরিদের সামনে বিচারকের উদ্দেশে অভিযুক্তের পক্ষের ব্যারিস্টার এডওয়ার্ড ক্লার্ক প্রথম পেশ করতে শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য।

মাননীয় বিচারক ও মহামান্য জুরি মহোদয়গণ।

আপনাদের বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে যে একজন গৃহবধূ বহু বছর স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেছে মহাসুখে, প্রেমবন্ধন এমন যে অসুস্থতার সারাটা কাল স্বামীর সেবা করেছে, বিনিদ্র দিন ও রজনী অতিবাহিত করেছে। চিকিৎসক ডেকে স্বামীকে রোগমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। স্বামীর ভেঙে পড়া মনকে আনন্দ দিয়ে সজীব করেছে, মৃত্যুর কারণ যাতে যথাশীঘ্র প্রকাশ পায় তার জন্য বার বার অনুরোধ করেছে, এমনই এক পতিপ্রাণা নারী, আপনাদেরকে বিশ্বাস

করতে বলা হয়েছে, বিনা কারণে, কোন লোভের বশবর্তী না হয়ে নূতন বছরের অব্যবহিত পূর্বের এক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের থেকেও সুনিপুণ হাতে ধীর স্থির হয়ে প্রথম নিঃশ্বাসে ক্লোরোফর্ম সাহায্যে অজ্ঞান করে এমন ভাবে জলীয় পদার্থ প্রয়োগ করেছে যে শুধু পেটের অভ্যন্তরে সামান্য ক্ষত ছাড়া আর কোন অংশে তার প্রমাণ রাখেনি। সরকারপক্ষ আপনাদের বিশ্বাস করতে বলবেন এক সজীব নজিরবিহীন ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে হত্যা এমন একজন করেছেন যাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই, কোন প্রশিক্ষণ নেই, নেই কোন চেষ্টা। এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক যা করবেন সন্তর্পণে তা এই নারী করেছে কখন কেউ বলতে পারে না। জাগ্রত অবস্থায় অথবা ঘুমের মধ্যে। জাগ্রত অবস্থায় অসম্ভব। ঘুমন্ত অবস্থায় তার চেষ্টা হলে ঘুম ভেঙে যাবে এবং বাধা দেবে। শরীরের অন্য অংশে তার চিহ্ন থাকবে। হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক। বমি করেছিল তার প্রমাণ নেই। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে একটা ঘরে এক ঘুমন্ত অসুস্থ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই সাহায্য করার, চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই কোন জ্ঞান। ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ অজ্ঞাত। যে কাজ ডাঃ স্টিভেনসন করতে সাহস পাবেন না সেই কাজ এই মহিলা করেছে অতি অনায়াসে, কোন চিহ্ন না রেখে, কোন ক্ষত সৃষ্টি না করে। এটা এক অলৌকিক, সত্যি অলৌকিক,—অলৌকিক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মহামান্য জুরিবৃন্দ,

সমবেদনশীল মন নিয়ে দেখুন, ভাবুন এক স্ত্রীর মনোযাতনা। স্বামী যন্ত্রণায় কাতর। সকলেই জানে আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই আদৌ। স্বামীও অন্তর থেকে তা জানে। চিন্তা করুন নিজে সেরকম এক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আছেন। কি মানসিকতা হয়। কোন একটা ঘটনা সন্দেহের কারণ হ'লে কিছু ধরে নেওয়া যায় না। খুনী সিদ্ধান্তে আসা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন অজুহাত দিয়ে মিসেস বার্টলে ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখবেন রেভারেন্ড ডাইসনও তা সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন কেমিস্টের দোকান থেকে এবং একটা বোতলে তা রেখেছেন। সে বোতলও তিনি ফেলে দিয়েছেন মৃত্যুর পর। শুধু মাত্র ভীতির কারণে। কিসের ভীতি? যে নির্দোষ হবে তার তো ভীতির কোন কারণ নেই। তিনি কি পারতেন না তাঁর সরলতা প্রকাশ করতে পুলিশের কাছে সে বোতল উপস্থিত করে? রেভারেন্ড ডাইসনের অবাধ গতিবিধি সে পরিবারে। মিসেস বার্টলের অনুপস্থিতিতে তার স্বামীর কাছে থাকারও সুযোগ যথেষ্ট। স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থেকেও তিনি মুক্ত নন। তৎসত্ত্বেও সরকার পক্ষ তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কোন প্রমাণ নেই বলেছেন। আমিও তার সঙ্গে একমত। কিন্তু আপনাদের যদি বলা হয় রেভারেন্ডের মিথ্যা সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করতে তখন কি মনে হবে না যে এই ধরনের বিষয়কে যদি গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে কেন তাঁর বিচার হবে না। আমি বলছি না তাঁর শাস্তি হোক। কিন্তু তার যদি কোন শাস্তি নাও হয় তাহলে এই ধর্মযাজককে আপনারা কি চোখে দেখবেন? চরম সন্দেহভাজন রেভারেন্ড হলেন সাক্ষী মিসেস বার্টলের বিরুদ্ধে। ডাইসন তাঁর নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য যত সন্দেহজনক কাজই করুন তাঁকে বিশ্বাস করে মিসেস বার্টলেকে শাস্তি দিতে হবে শুধুমাত্র একটাই কারণে যে সে ক্লোরোফর্ম আনতে বলেছিল। সে বলেনি তিনটে দোকান থেকে মিথ্যা ভাষণে সংগ্রহ করে একটা বোতলে ভর্তি করতে, মৃত্যুর পর সে বোতল ফেলে দিতে। এসব রেভারেন্ড স্বেচ্ছায় করেছেন। মনে রাখবেন মিঃ বার্টলের শারীরিক অসুস্থতা। মানসিক অবসাদ, নিদ্রাহীনতা, মাড়িতে জীবাণু প্রবেশ ইত্যাদিতে মন ভারাক্রান্ত। রোগমুক্তির আশা নেই। ক্ষণিকের অনুপস্থিতি স্ত্রীর যে কোন কারণে। মিঃ বার্টলে দেখলেন একটা বোতল, ক্লোরোফর্মের। অন্যান্য ওষুধ ও মদের বোতল গ্লাস যেখানে আছে নজর গেল। এটা যথেষ্ট

সম্ভব একটা গ্লাসে ক্লোরোফর্ম ঢেলে মি বার্টলে খেয়ে ফেলল। এত শীঘ্র যে তা সরাসরি পেটের মধ্যে চলে যায়। কোন জায়গায় থাকে নি কোন চিহ্ন। সে নিশ্চিন্ত উইল করা আছে। রেভারেন্ড বিয়ে করবে তার স্ত্রীকে। স্ত্রীও মুক্তি পাবে এই তার জ্বালা-যন্ত্রণার মনোবেদনা থেকে। এসব কথা সাক্ষ্য প্রমাণে আছে। ডাঃ লিচ ও ডাঃ টমাসের মতামতে আছে। বিচিত্র মানসিক অবস্থার মিঃ বার্টলের পক্ষে সবই সম্ভব। জীবন সম্বন্ধে চরম হতাশা গ্রস্ত এক মানুষের পক্ষে কি এটা অসম্ভব? স্ত্রী ফিরে এসে দেখেছে স্বামীর দেহ শীতল। ব্র্যান্ডির গন্ধ আসছে জামা থেকে। ডাঃ লিচ তা দেখেছেন, গন্ধ নিয়েছেন। কেন? স্বামীর শরীর শীতল দেখে স্ত্রী গ্লাসে ব্যান্ডি ঢেলে খাইয়েছে। কিন্তু তা কম্পিত হাতের জন্য পড়ে গেছে। ল্যান্ডলর্ড সে গ্লাস দেখেছে সামান্য ব্র্যান্ডি সহ।

মহামান্য জুরিবৃন্দ,

এই স্ত্রীর কি কোন বন্ধু থাকবে না। নিশ্চয় থাকবে। হৃদয় দিয়ে বুঝবার বন্ধু নিশ্চয় থাকবে। আপনাদের এবং আরো অনেকের মধ্যে। আমি বিশ্বাস করি প্রতি মানুষের মধ্যে সে হৃদয় আছে তাতে বিশাল বাসনা ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আছে—আমার মধ্যে সুবিচারের আলো দাও, শক্তি দাও, চিন্তা দাও। সে হৃদয় থাকুক অভিযুক্তকে ঘিরে। সে হৃদয় সারা পৃথিবীকে জানাক নিঃসঙ্কোচে—সুবিচার করেছি অভিযুক্ত এডেলেইডি বার্টলের প্রতি তাকে মুক্তি দিয়ে।

সরকারপক্ষে প্রত্যুত্তর দিলেন রাসেল। বিচারক জুরিদেরকে তাঁর বক্তব্য বললেন। জুরিরা ভাবনাচিন্তার জন্য উঠে গেলেন অন্য এক ঘরে। এক সময় তাঁরা ফিরে এলে বিচারক মতামত জানতে চাইলেন। জুরি প্রধান জানালেন—আমরা মনে করি যথেষ্ট প্রমাণের অভাব আছে কি ভাবে এবং কার দ্বারা ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ হয়েছে। সন্দেহাতীত ভাবে অভিযুক্ত দোষী প্রমাণ হয়নি।

মিসেস বার্টলে মুক্ত বিহঙ্গ এমন। একে একে সকলে চলে গেছে। এডওয়ার্ড ক্লার্ক ছোট শিশুর মতো কান্নায় চোখের জল ফেলেছেন। বহু বছর পেশায় থেকে আনন্দের আতিশয্যে শেষ হয়েছে সে ঐতিহাসিক বিচার।

টনি ম্যানসিনি

মাননীয় জুরি মহোদয়,

এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক টনি ম্যানসিনির কোন ক্ষমা নেই। ডায়োলেট কেয়ি এক বারবনিতা যার উপার্জনেই নির্ভরশীল সে। ভুলে গেল কৃতজ্ঞতা। উপহার দিল মৃত্যু। তার পরও সে মৃতদেহ মাসের পর মাস একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে বন্দি রেখে একই ঘরে বাস করেছে। আচার আচরণে সহজ—সরল। মিথ্যাভাষণে পটু। শুরু করলেন সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার জে. ডি ক্যাসেলস্।

টনি ম্যানসিনি এমন এক সমাজের মানুষ যেখানে আছে সস্তা কাফে, নিম্নশ্রেণীর মেয়ে পুরুষের নাচ গান, মদের আস্তানা আর সব কিছুর দালাল শ্রেণী। রাতের অন্ধকারে যৌন লীলা খেলার সস্তা ঘর। চরিত্রের কলুষতা, যৌন উপভোগ, মদের নেশায় মত্ততা দৈনন্দিন জীবনের

ছবি। যে কোন হত্যাকাণ্ড হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। টনি ম্যানসিনি সেই অন্ধকার জগৎকে চিনিয়ে দেয়। টনির আরো নাম ছিল। হাই ম্যান গোল্ড, জ্যাক মোটায়ার। কিন্তু আসল নাম ছিল তার সিসিল লয়। ভদ্র পিতামাতার সন্তান ক্রমে ক্রমে অপরাধ জগতে প্রবেশ করেছে। চুরির অভিযোগে শাস্তি হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে ছোট একটা হোটেলে সামান্য চাকরি। কিন্তু হোটেল বন্ধ হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যে। টনির সামনে কোন চাকরি বা তার সম্ভাবনা নেই। সেই হোটেলে আসত ভায়োলেট কেয়ি। আসল নাম ভায়োলেট সন্ডার্স। যুবতী নর্তকী। জীবিকার কারণে পথে নামা। দেহোপজীবিনী। তার জন্য কারাবাসও। সেই হোটেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে টনিও কেয়ির মধ্যে প্রথম আলাপ, তারপর বন্ধুত্ব। কেয়ির প্রস্তাবে দুজনের যাত্রা সমুদ্রকূলে ব্রাইটন শহরে। কেয়ির পেশার দিক থেকে ঐ শহর উপযুক্ত। পর্যটন কেন্দ্র বলে ধনী মানুষের আসা-যাওয়া। বিলাসিতা ও উপভোগের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষে জনাকীর্ণ। অপরাধের অবাধক্ষেত্র। কেয়ির দেহব্যবসা থেকে আয় বড একটা কম হ'ত না। বরং যা আয় হ'ত তাতে দুজনের থাকা-খাওয়া ছাড়াও কেয়ি হাতখরচ দিত টনিকে। একটা শুধু অসুবিধা টনির। কেয়ি যখন তার মানুষ নিয়ে ঘরে থাকত। টনিকে দূরে চলে যেতে হ'ত। এই পেশায় দুজনেরই এক স্থানে থাকা সম্ভব হত না। যাযাবরের মত ডেভন শায়ার প্লেস, মিখেল স্ট্রিট, রাসেল স্কোয়ার স্ট্যানলি রোড, সেন্ট জর্জ টেরাস, ক্লারেন্ডন প্লেস গ্র্যান্ড প্যারেড, হোয়াই স্ট্রিট আরো বহু জায়গায়। যখন যেখানে ব্যবসার সুবিধে তখন তেমনি স্থান পরিবর্তন। শেষ দুজনের ঠিকানা ৪৪নং পার্ক ক্রেসেন্ট। ব্রাইটনে সব থেকে বেশি সময় তারা কাটিয়েছে এই পার্কক্রেসেন্টে। আয় বেড়েছে কেয়ির। মদ ও নাচ নিয়ে কেয়ির জীবন ভোগ। তারপর একটা সময় এসে ছিল কেয়ির দেহের আকর্ষণ দ্রুত কমে যেতে থাকলো। আয় বহু কমে যাওয়ায় টনি চাকরির সন্ধান করতে করতে একটা পেয়েও গেল। সমুদ্রতীরে স্কাইলার্ক কাফেতে, ব্যস্ত জনাকীর্ণ ওয়েস্ট স্ট্রিটে। সব কাজ করতে হ'ত এমনকি প্লেট ও টেবিল পরিষ্কারও। কেয়ি এ কাজ পছন্দ করত না। একটা ঈর্ষা ছিল কেয়ির মনে। সন্দেহ প্রবণতা ও জীঘাংসা প্রবৃত্তিও ছিল কেয়ির। স্কাইলার্ক কাফেতে টনিকে নজরে নজরে রাখার চেষ্টা করত সর্বদা। সকলের সামনে তাকে হেয় করতে খাবারের অর্ডার দিত। এসবের কারণ ছিল ফ্লোরেন্স এত্রেল সে কয়েকদিন আগে হোটেলে চাকরিতে ঢুকেছিল। টনি ও ফ্লোরেন্সের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়। সেদিন টনি ও ফ্লোরেন্সকে কাফেতে একসঙ্গে দেখে প্রচণ্ড রাগে কেয়ি কাফে থেকে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন টনি যথারীতি কাফেতে আসে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাজ করে। গত দিনের কেয়ির আচরণ সম্বন্ধে কৌতূহলী সহকর্মীর প্রশ্নে টনি বলে—কেয়ি তাকে ছেড়ে প্যারিস চলে গেছে। কেয়ি এক আত্মীয়া টেলিগ্রাম পায়। যেন কেয়ি জানিয়েছে—বাইরে যাচ্ছি। ভাল চাকরি। রবিবার জাহাজে। চিঠি যাচ্ছে। টেলিগ্রাম পেয়েও সে আত্মীয়া আর চিঠি পায়নি। কেয়ি চলে গেছে। কিন্তু টনির কোন বাহ্যিক পরিবর্তন কেউ লক্ষ্য করেনি। সপ্তাহ শেষে ফ্লোরেন্সের সাথে নাচ করেছে। আত্রেল এসেছে পার্ক ক্রেসেন্টের সেই বাড়িতে। কিছু সন্দেহজনক উক্তির কথা আপনারা শুনেছেন। তারপর দিন টনি ব্রাইটন বাজারে বেশ দাম দিয়ে বড় ট্রাঙ্ক কিনেছে। পার্ক কেসেন্টে নিয়ে গেছে বাড়ির মালিককে বলেছে কেয়ি নেই, এই ফ্ল্যাটের প্রয়োজন নেই। মালিক সমবেদনা জানিয়েছে স্ত্রী টনিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। পর দিন সব কিছু নিয়ে গেছে। থেকে গেছে ট্রাঙ্কটা আর কাবার্ডে রক্তের চিহ্ন শত চেষ্টায় যা ঘোচানো যায়নি। পরে হাতে টানা ট্রলিতে সে ট্রাঙ্ক পৌঁছেছে ৫২নং কেম্প স্ট্রিটে। একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে ট্রাঙ্কটা। এর পরও প্রায় দু মাস থেকেছে সে ট্রাঙ্ক ঘরে। পরিচিত জনকে টনি বলেছে গন্ধ

সম্বন্ধে—ভেতরে ফ্রেঞ্চ পালিশ আর ফুটবলের বুট রাখা আছে।

পুলিশ ব্রাইটন রেল স্টেশনের দুশগজ দূরে উদ্ধার করল একটা বড় ট্রাঙ্ক ক্লোক রুমে। দিন দশেক আগে সেটা রাখা হয়েছে। সন্দেহে ট্রাঙ্ক খুলে দেখা গেছে মুণ্ড, ও পা ছাড়া একটি মেয়ের গলিত দেহ। কিন্তু তা শনাক্ত করা গেল না। টনির প্রতি সন্দেহে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেপ্তার করা যায়নি। কিন্তু নজরদারি ছিল। একদিন দুপুরে পুলিশ কেম্প স্ট্রিটের বাড়ি আসে। কেয়ির হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া পুলিশের কাছে একটা তদন্তের বিষয় ছিল। ঘরের মধ্যে বিষাক্ত এক দুর্গন্ধ। সত্যটা বের হ'ল ট্রাঙ্ক থেকে। পুলিশ বিস্মিত। এই দুর্গন্ধ নিয়ে টনি বাস করেছে দিনের পর দিন। শনাক্ত হ'ল দেহটা ভায়োলেট কোয়র। কিন্তু টনি কোথায়? খবরের কাগজে বেরুল— ভায়োলেট কেয়ির মাথায় আঘাত করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। টনিকে গ্রেপ্তারের জন্য নজরদারি রাখা হয়েছে। তবুও টনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসেনি। কয়েকদিন পর তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। অস্বীকার করেছে কেয়িকে খুন করার কথা।

মহামান্য জুরি আমরা এসবই প্রমাণ করেছি পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক মত দ্বারা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এক ঘরে আছে এই দেহোপজীবিনী এবং অপরাধী। হঠাৎ একজন নিরুদ্দেশ হ'ল বলে অপরাধী প্রকাশ করল। তদন্তে প্রমাণ হ'ল অপরাধীর ভবিষ্যৎ আচরণ, পদক্ষেপ এবং কেয়ির মৃতদেহ গলিত অবস্থায় উদ্ধার হল। কোথায়? যেখানে তারা শেষ থেকেছে। প্রতিটি আচরণ দ্বারা অপরাধী নিজেকে প্রমাণের বেড়াজালে বেঁধেছে। কীভাবে তরতাজা একটা মেয়ে তারই ঘরে গলিত মৃতদেহে পরিণত হল এবং বহু পরে তার সংবাদ না দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ উদ্ধার করল। এরপর কি মনে হবে টনি নিরপরাধ? টনির বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হয়েছে? টনি যে জবানবন্দি দিয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়? আপনারা বিচার করবেন। অপরাধীর শাস্তি, ধর্মে ও সমাজের বিধান।

নর্মান বার্কেট ধৈর্য ধরে শুনছিলেন সরকারপক্ষের আবেদন জুরির কাছে। টনি একদিক থেকে ভাগ্যবান। বার্কেটের মত খ্যাতিমান ব্যারিস্টারের সাহায্য টনির মত দীন দরিদ্রের পাওয়া নিশ্চয় ভাগ্যছাড়া কিছু নয়। বার্কেটের মতো ব্যক্তিত্ব-চরিত্রের মাধুর্য এবং বাগ্মিতা সেকালে তাঁকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। টনি গ্রেপ্তারের পর হত্যার কথা অস্বীকার করলে ও পূর্ণজবান —বন্দিটা ছিল বার্কেটের কাছে দুর্লঙ্ঘ পর্বতের মতো। টনি বলেছে একদিন ফ্ল্যাটে ফিরে দেখে কেয়ির বিছানায় শায়িত, বড় রুমাল গলায় ফাঁস দেওয়া, বিছানা ও আশপাশ রক্তাক্ত। ভীত হয়ে পড়ে। সকলে তাকেই সন্দেহ করবে। শুধু ভয় তাকে বাধ্য করেছে মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে। বার্কেট জানেন, আদালতে সত্য এক কথা, বিশ্বাস যোগ্যতা অন্য কথা। বরং টনির বলা এসত্য সকলেই অবিশ্বাস করবে। বার্কেট ভেবেছেন অনবদ্য শৈলী প্রয়োজন এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সম্ভবনার মোড়কে আচ্ছাদন করে বিশ্বাসযোগ্যতার রূপ দেওয়া। সাক্ষীদেরকে জেরার মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্যকে আনতে হয়েছে আদালতে। অপ্রয়োজনবোধে অনেক সাক্ষীকে তিনি জেরাও করেননি। বার্কেটের দুটো দুশ্চিন্তা ছিল—একটা প্রমাণ মৃতদেহে মরফিন পাওয়া আর দ্বিতীয় টনির পোশাকে রক্ত পাওয়া।

মহামান্য জুরি, সংবাদপত্র প্রকৃত বিচারে অনেক বাধা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় সংবাদে যাকে অপরাধী বলে প্রকাশ করা হয় তাতে প্রকৃত অপরাধী সুবিধা পায়, তদন্তের চোখ তার দিকে না গিয়ে চলে যায় এমন একজনের দিকে যাকে সংবাদপত্র বিচারের আগেই দোষী বলে আঙুল তুলেছে। আমি অবাক হই যখন দেখি একজন সন্দেহের পাত্র হয়েছে, বিপদে পড়ে

আছে, জীবন মৃত্যুর সংশয়ে আছে তখন সংবাদ পত্রে নানা মিথ্যা ঘটনা প্রকাশিত হয়। এটাও এক অপরাধ। ফলে অভিযুক্তকে আইনের সাহায্য দিতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। সকলের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা গাঁথা হয়ে থেকে যায়। আদিযুগের পূর্ব ইতিহাস মনকে প্রভাবান্বিত করে। কোন মানুষের বিরুদ্ধে যখন হত্যার অভিযোগ থাকে জুরিমনে কোন ধারণা থাকা উচিত হবে না। আমার আবেদন প্রমাণের বাইরে যেন না যাওয়া হয়। প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন পূর্ব ধারণা একজন নিরপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড পেতে সাহায্য করবে।

মহামান্য জুরি, সাক্ষীদের আপনারা দেখেছেন, তাদের জবানবন্দি আপনারা শুনেছেন। তাদের মনে অভিযুক্ত টনি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের পেছন ফিরে দেখতে দেওয়া হয়েছে কোন ঘটনার অথবা কোন সংলাপের। আমার আবেদন সজাগ চোখ দিয়ে সাক্ষীদের বলা প্রতিটি শব্দ দেখবেন, অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনাদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে সরকারপক্ষ সন্দেহের উর্ধ্বে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি। প্রথম স্মরণ করুন হত্যার অস্ত্র হাতুড়ি সম্বন্ধে ডাঃ স্পিলসবেরির মত যা আমার জেরায় তিনি বলেছেন কেয়ির মৃত্যু অন্যান্য সম্ভাব্য কারণেও হতে পারে। মরফিন বেশি পরিমাণে শরীরে গেলে তাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। একজন মাথায় গুরুতর জখম নিয়ে অজ্ঞান হতে পারে এবং সুস্থও হতে পারে। এরকম মাথার জখমের ক্ষেত্রেও সুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। এই রকম এক জখমীকে প্রচুর পরিমাণে মরফিন প্রয়োগ করলে তাতেও মৃত্যু হতে পারে। এও প্রমাণে এসেছে কোন শক্ত জিনিস দিয়ে মারলে যেমন মাথায় জখম হয় তেমনি উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেলেও হয়। একজন মদ্যপ সাতফুট উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়লে এই জখম হবে। পার্ক ক্রেসেন্টের সাত ফুট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ফ্লাটে। পাথরের সিঁড়ি। নীচে জানলার একটা পাথর বেরিয়ে আছে। ম্যাপ ও ফটোগ্রাফ লক্ষ্য করুন। সিঁড়ির ওপর থেকে মদ খেয়ে টলমল কেয়ি যদি নীচে পড়ে যায় তাহলে মাথার বাইরে এবং ভেতরে এই রকম জখম হতে পারে। এটা ডাক্তার স্বীকার করেছেন। তাহলে কি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হ'ল যে শুধু হাতুড়ি দিয়েই এই জখম হতে পারে? তারপর সে হাতুড়ি কি ভাবে পার্ক কেসেন্টের ফ্ল্যাটে এসেছিল। পূর্বের এক ভাড়াটিয়া তা ফেলে গিয়েছিল এবং সেটাই নাকি এক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। স্মরণ করুন সেই ভাড়াটিয়া কে এই হাতুড়ি দেখানো হয়েছে। সে বলেছে এটাই সেটা কি না বলা সম্ভব নয়। ডাঃ লিঞ্চ স্বীকার করেছেন। দেহোপজীবিনীরা মরফিন ব্যবহার করে। কিন্তু তা মারাত্মক পরিমাণে কি না বলতে পারেন নি। রক্ত মানুষের চাররকম গ্রুপের হতে পারে। এক এক জনের এক এক গ্রুপ। মৃতের রক্তের গ্রুপ এবং আততায়ীর পোশাকে রক্তের গ্রুপ যদি এক হয় তাহলে অভিযুক্তকে তার কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন মৃত্যুর ক ঘণ্টা পর্যন্ত মৃতের রক্ত বের হয়ে পোশাকে লাগতে পারে আর যদি প্রমাণ হয় যে কেয়ির মৃত্যুকালে টনির এ পোষাক ছিল না।

পারিপার্শ্বিক সাক্ষী পার্ক কেসেন্টের মালিক বলেছে—সে নিজের চোখে কেয়ির কাছে আসতে দেখেছে নানা মানুষকে রাত্রিতে। টনিকে সে সময় বাইরে থাকতে হত। টনি যে কাফেতে কাজ করত রাত্রি পর্যন্ত সেখানে থাকতে হত। টমাস কার্নলেক বলেছে যে রাত্রে কেয়ির মৃত্যু হয় তার অব্যবহিত আগের বিকেলে সে কেয়ি সঙ্গে কথা বলেছে। কেয়ি তখন খুব উত্তেজিত ছিল। এবার আমার প্রশ্ন ও তার উত্তর পড়ে শোনাই।

—আপনি জানেন মানুষের ওপর ড্রাগের কি প্রতিক্রিয়া হয়?

—হ্যাঁ।

—এবার বলুন—কেয়িকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছিল যে কেয়ি ড্রাগের নেশাগ্রস্ত?
—ড্রাগ ও মদের নেশাগ্রস্ত।
—সে অবস্থায় সে খুব উত্তেজিত ছিল?
—হ্যাঁ।
—তাকে কি খুব ভীত দেখাচ্ছিল?
—হ্যাঁ।

মহামান্য জুরি, তাহলে কী দাঁড়াল? দেহোপজীবিনী কেয়ির কাছে যাতায়াত করা বহু মানুষ, ড্রাগ ও মদে যার প্রচুর আসক্তি। মরফিন একটা ড্রাগ। উত্তেজিত কেয়ি সেই বিকেলের পর যদি সিঁড়ি থেকে পড়ে যখম হয়। তারপর কেউ না কেউ তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় অজ্ঞান ভেবে। পরে টনি ফ্ল্যাটে ফিরে তা দেখে। ভয় পায়। ভয় তার সকলে তাকেই সন্দেহ করবে খুনী হিসেবে। ভয় তার যে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে না। বিবেচনা করুন এই টনি কি অবস্থায় পড়েছে। কাজ থেকে রাত্রিতে ফিরে সে দেখল তার সাথী মৃত। সে বেরিয়ে গেল আচমকা ভয়ে। ভীত-সন্ত্রস্ত মন শুধু ভাবতে লাগল কি করা যাবে এই মৃতদেহ নিয়ে। চিন্তায় এল এক ভ্রান্তিকর পদক্ষেপ। মৃতদেহ গোপন করা এবং একটার পর একটা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। হত্যা এক কথা আর মৃতদেহ গোপন রাখা ও মিথ্যা বলা অন্য কথা। মিথ্যার নিয়মই এই। একবার শুরু মিথ্যার পথে বাধ্য করে মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে আরও মিথ্যার আশ্রয় নিতে। আর পেছনে ফেরা যায় না।

মহামান্য জুরি টনি যার আসল নাম সিসল লয়কে আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি। কারণ সে-ই একমাত্র বলতে পারে তার মানসিক অবস্থার কথা। খুন না করার কথা। সে শপথ নিয়ে বলেছে—খুন সে করেনি। এই হাতুড়ি কখনও ব্যবহার করেনি। কেয়ির সঙ্গে ব্রাইটনে এক সঙ্গে বসবাস করার কথা অস্বীকার করেনি কেয়ির জীবন, চরিত্র ও উপার্জন পন্থা সে হুবহু বর্ণনা করেছে। মদ্যপ ও ড্রাগের নেশাগ্রস্ত কেয়ির সঙ্গে তার কোন দিন ঝগড়া হয়নি। বরং তাকে সে মনেপ্রাণে ভাল বেসেছে। সে রাত্রে স্কাইলার্ক কাফে থেকে রাতে ফিরে সে দেখে কেয়ি বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। প্রথমটায় সে ভেবেছে কেয়ি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বলেছে—ওঠ, কেয়ি, ওঠ, তখনই সে দেখেছে রক্ত বালিশে ও মেঝেয়। টনিকে জিজ্ঞাসা করেছি—কেন পুলিশ ডাকোনি? উত্তরে সে বলেছে—পুলিশ। আমি ডাকবো পুলিশকে। যার আগে শাস্তি হয়েছে সে কি পুলিশের কাছে সুবিচার পায়?

অভিযুক্তের হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে দর্জি যে বলেছে কেয়ির মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে সে ফুলপ্যান্ট তৈরি করেছে। তাহলে এ রক্ত কেয়ির হতে পারে না। কী প্রমাণ থাকলো টনির বিরুদ্ধে যে সে খুন করেছে। তার পরবর্তী কার্যকলাপ শুধু সন্দেহ উদ্রেক করার জন্য সৃষ্টি। সন্দেহ যত গুরুতরই হোক না কেন তা প্রমাণের জায়গা নিতে পারে না। অভিযুক্তকে কাঠগড়ায় এনে আমি শুধু অপেক্ষা করেছি সরকার পক্ষের মিঃ ক্যাসেল টনিকে জেরা করেন কি না কেন সে কেয়িকে খুন করল? তিনি কোন প্রশ্ন করেননি। যা কিছু প্রমাণ এনেছি তাতে দেখা যায় কেয়ির মৃত্যুর আগে দুজনের মধুর সম্পর্ক গভীর প্রেম বন্ধন। কোন ঝগড়া নেই। কোন বিতণ্ডা নেই। নেই কোন প্রতিহিংসা বা ঘৃণা।

নির্যাতন নেই কোন কেয়ির ওপরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারপক্ষের কি কর্তব্য ছিল? প্রশ্ন করা, কোন ইঙ্গিত দেওয়া কেন সে খুন করল? না, কোন প্রশ্ন নেই, নেই কোন ইঙ্গিত। কেউ সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী নেই খুনের। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ নির্ভর সরকারপক্ষ। তবু কেন এই

নীরবতা। কেয়ির দেহে মরফিন পাওয়া গেল্। ডাঃ লিঞ্চ বলতে পারলেন না সেটা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট কি না। এটাও কি আশ্চর্যের নয় মরফিন সম্বন্ধে কেন টনিকে একটাও প্রশ্ন করা হল না। কেয়ি মরফিন কোথায় গেল? কে দিল? এবং কেনই বা কেয়ি তা নিল? সরকারপক্ষে নীরব। কেন তাহলে এই মরফিন পাওয়াটা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে? তারপর মাসাধিক কাল পর একটা হাতুড়ি উদ্ধার হল। এটা টনির পক্ষে এমন কী কঠিন কাজ ছিল যে সেটা নিয়ে গিয়ে অতল সমুদ্রে ফেলে দেওয়া। আমি হ'লে কি করতাম? এক সাধারণ জ্ঞান থাকা মানুষ কী করত। সরকারপক্ষ বলছেন টনি ঠাণ্ডা মাথায় সব কাজ করে গেছে। তাহলে তো হাতুড়ি উদ্ধার সম্ভব নয়। হত্যার অস্ত্র মাসের পর মাস পড়ে থাকতে দেবে কেন আততায়ী যে দেহকে লুকিয়ে রাখবার বুদ্ধি রাখে।

মহামান্য জুরি, অভিযুক্তের ওপর কোন প্রমাণের দায়িত্ব নেই খুনি কে তা বলার। কিন্তু কেয়িকে কে খুন করল এ প্রশ্ন সকলের মনেই থাকবে। অভিযুক্ত কেবল সম্ভাবনার কথা বলতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে কেয়ির আদিম পেশা ; কি চরিত্রের মানুষের আনাগোনা তার মতো বারবনিতার কাছে। তার এই পেশার জন্য তাদের দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যেতে হয় ভয়ে। বারবনিতার জীবনে ব্ল্যাকমেল এক গুরুতর সমস্যা। যদি সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া এবং জখম হওয়া সন্দেহ জনকও হয়, ফার্সলকে যে মানুষকে শেষ দেখেছে কেয়ির সঙ্গে। এ ছাড়াও অন্য মানুষ যারা সেদিন কেয়ির কাছে এসেছে। তারা বলতে পারে কেয়ির মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে। কিন্তু কোন কথা নেই, কোন তদন্ত নেই। খবরের কাগজ যা বলেছিল পুলিশও চলল সেই পথে। শুরু থেকে শেষ শুধু সন্দেহ। খবরের কাগজ সন্দেহ করল টনি খুন করেছে পুলিশও ব্যাগ্র হ'য়ে পড়ল সাক্ষী খুঁজতে। তারা এল। কারোকেই বিশ্বাস করা যায় না।

এবার আসুন দেখি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অন্য একটা দিক। মনে রাখবেন একজন পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ খ্যাতিমান, পরিচিত বা অপরিচিত, তিনি কিন্তু মানুষ। ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন। বিজ্ঞানের পুঁথিগত বিদ্যা বাস্তব পরীক্ষায় সব সময় যে নির্ভুল হবে তা নিশ্চিত নয়। বৈজ্ঞানিক মতামত মূল্যহীন যদি দেখা যায় সে প্যান্ট আদৌ টনির পরনে ছিল না মৃত্যুকালতক এবং যা তৈরি হয়েছে পরে তাহলে সে মতামতের কি মূল্য আছে? কি গুরুত্ব দেওয়া যাবে হাতুড়ির মত অস্ত্রের যা কেউ বলতে পারে না এটা সেটাই কি না। শুধুই মাথার জখম নয়, মৃতা দেহোপজীবিনী মরফিন ব্যবহারে অভ্যস্ত। মাথায় জখম থেকে মৃত্যু না হ'তেও পারে। কিন্তু অধিক পরিমাণে মরফিন মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে।

বার্কেট আরো বহু প্রমাণ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করে সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করলেন যে সরকার পক্ষের মামলা ভ্রান্তিজর্জর এবং সন্দেহের ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে। অবাস্তব কথোপকথনকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে।

মহামান্য জুরিবৃন্দ,

আমি আবেদন জানাব সমগ্র বিষয়টা সুবিবেচনা করুন, সংবাদপত্রের অধিকার নেই কারোকে দোষী বা নির্দোষ বলার বা কারো আদৌ বিচার করার। বৃটিশ জুরির ঐতিহ্য বজায় থাকবে যদি শুধু প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত হয়। তাহলে আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলব আমি দাবি করি অভিযুক্ত নির্দোষ সাব্যস্ত হোক।

জুরিরা নির্দিষ্ট ঘরে আসন নিয়ে আলোচনায় কাটালেন আড়াই ঘণ্টা। তারপর যখন তাঁরা এলেন—ঘোষণা করলেন অভিযুক্ত নির্দোষ।

রাধিকা-সাধিকা

আজ যখন কানে আসে বধূ নির্যাতন—পণের বা অন্য কিছুর দাবিতে উৎপীড়ন অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া—তখন সবটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। হাসি পায় যখন বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে এমন এক মেয়ে যে শ্বশুরবাড়িতে এসেছে হাতে গোনা কয়েকটা দিন। সরকারি বা বেসরকারি অফিসে কাজ করে সেই মেয়ে। স্বামীর চাকরিস্থল সত্তর কি আশি মাইল দূরত্বে। শ্বশুরবাড়ি হয়তো আরো অনেক দূরে। ভেবে পাই না এমনই এক মেয়ে দিনের পর দিন তার ওপর নির্যাতন হয় এই অভিযোগ করে। একদিন যদি সত্যি ঝগড়া বিতণ্ডা হয় তারপর সে কি বার বার আসবে অত্যাচারীতা হ'তে। সে চাকরি বা নিয়মিত করে যায় কি ক'রে। মনটা ভারাক্রান্ত হয় যখন দেখি আইনের নতুন একটা ধারাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে শুধুমাত্র—শ্বশুরবাড়ির সকলকে জব্দ করার জন্য এবং নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। অসহায় আইনজীবী আমি। ঘৃণা করার সুপ্ত অধিকার আছে কিন্তু প্রতিকারের শক্তি নেই। সত্যি যেক্ষেত্রে বধূ নির্যাতন হয় সহানুভূতি স্বভাবতই আসে সেই বধূর প্রতি। সে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করে গৃহবধূ ব'লে এবং ভবিষ্যৎ সুখের আশায়। চাকরিরতা কেউ অভিযোগ করলে সন্দেহ জাগে। বধূনির্যাতন যেমন সামাজিক এক ব্যাধি—মিথ্যা অভিযোগ আরো গুরুতর ব্যাধি। আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বধূ নির্যাতনের ছবিটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। তখন বধূ নির্যাতন ছিল কিন্তু অভিযোগের কোন সুযোগ ছিল না। মিথ্যা অভিযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বহু বছর পর রাধাবৌদিকে দেখলাম। আমার মনে নানা স্মৃতি এল। এই রাধাবৌদি তার স্বামীর ভালবাসা পেলেও শাশুড়ি প্রধান সংসারে কি কষ্ট পেত তা মনে পড়তে লাগল। রাধা বৌদিকে না দেখে সে সব কথা বেশ ভুলেই ছিলাম। আজ আবার মনে পড়ল সেই করুণ দৃশ্য। রাধাবৌদির স্বামী কেশব রায়ের মৃতদেহ আনা হল বাড়িতে। কেশবদাকে মেজদা বলতাম। কেশবদা নাকি বিষ খেয়েছে। রাধাবৌদি তখন দরজা বন্ধ করে ভেতরে। দরজা ভেঙে বৌদিকে বের করা হ'ল। অচৈতন্য অবস্থায়। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। ডাক্তার এল। বমি করাবার ব্যবস্থা হ'ল। সকলেই তখন বলাবলি করছিল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খেয়েছে। রাধা বৌদি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু মৃত্যু হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল। এখন তা মনে হয় না। তখন তাই মনে হ'ত। কারণ কেশবদার মৃত্যুর পর রাধা বৌদির ওপর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা বেড়েছিল। রাধাবৌদি একদিন সকলের অজ্ঞাতে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেঁচেছিল। তারপর আর কোন খবর পাইনি।

বহু বছর পর রাধা বৌদির সাথে দেখা হবে চিন্তাই করিনি। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ। উড়িষ্যার এক শহরে সমুদ্রের ধারে এক মন্দিরে দেখতে পেলাম। মুখের আদল একই আছে। প্রথমটা চিনতে কষ্ট হ'য়েছিল। উনি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। তারপর একসময় বলেছিলেন—"বিশু না?" আমি বলেছিলাম আপনাকে তো—আমার কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—"রাধাবৌদিকে মনে নেই?" আমি বললাম "আমাকে মনে আছে আপনার?" রাধা বৌদি বললেন—একটু হেসে, "ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ? ভুলবার চেষ্টা করলে মনে থেকে যায় বেশি। সন্ন্যাসজীবন নেবার সময় ভেবেছিলাম সব ভুলে যাব কৃষ্ণকেশবের ধ্যানে। কিন্তু পারলাম কৈ। তোমার দাদা কৃষ্ণকেশব হ'য়ে আমার কাছে ফিরে এল।" রাধাবৌদি আশ্রমে আমাদের ভোগ প্রসাদ না খাইয়ে ছাড়লেন না। সন্ধ্যায় নামগানের সময়ও থাকতে হল। আশ্রমের

কি সুন্দর পরিবেশ। নানা গাছের সারি, ফুলের বাগান মন্দিরের চারদিকে। মনোরম এক প্রকৃতির প্রকাশ। রাধাবৌদিকে সকলে অন্নদা মা বলে ডাকে। তাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসিনী। সকলের তিনি শ্রদ্ধেয়া। ওঁর যে গানের এত মিষ্টি গলা তা জানা ছিল না। একঘণ্টা ধরে নামগান করে সকলকে অভিভূত করে দিলেন। মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন এক ভক্ত। মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণকেশবের মূর্তি পেতলের তৈরি। সামনে নাটশালা যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় নাম গান হয়। সব কিছু মিলে এক অনুভূতি হয় যা আগে কখনও হয়নি। তারপর দিন বিদায় নিলাম আশ্রম থেকে। রাধাবৌদি আমাদের এগিয়ে দিলেন আশ্রমের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত। বললেন "বহুবছর পর তোমাকে দেখে একদিকে যেমন ভাল লাগলো তেমনি যে সব দুঃখ-যন্ত্রণা এতকাল ভুলে ছিলাম তা তোমায় দেখে মনে এল। আবার ভুলতে বেশ কষ্ট হবে।" চোখদুটো ছলছল করে উঠলো। রাধাবৌদি চোখ মুছে অতি কষ্ট চেপে হাসলেন। পথে আমার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

ট্রেনের কামরায় বসে সারাটা রাস্তা মনে আসতে লাগল কত কথা, কত ঘটনা। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল কেশবদাদের বাড়ি। রাধাবৌদি যখন বিয়ের পর নববধূ হয়ে আসেন তখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ। অপরূপ রূপ নিয়ে এলেন এমন এক সংসারে যেখানে ব্যক্তিত্বহীন শ্বশুর, বাড়ির মূল কর্তা। শাশুড়ি, ছয় ভাই ভাসুর ও দেওর মিলে। আর ছিল অবিবাহিতা ননদ অলকা। ভাসুর ও বড় জা পৃথক থাকতে শুরু করে অনেক আগে থেকে। চাকরিস্থল বোলপুরে। কেশবদা ছিল মেজ। বাকিরা সবই দেওর। চারজন দেওরের মধ্যে একজন ছিল আমার সম বয়সী ও সহপাঠী। সেই সূত্রে অবাধ যাতায়াত ছিল আমার। কেশবদার মার মতো জীবনে আমি খুব কম মহিলা দেখেছি। প্রতিটি কথার মধ্যে ছিল কাঁটা যা মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কারো সাহস ছিল না তার অমতে কোন কাজ করার। যে কোন কথা বা ব্যবহার উল্টো ক'রে দেখা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সকলের প্রতি সন্দেহ, হিংসা। গঞ্জনা ছাড়া বৌদের সঙ্গে কথা বলতে পারত না। এমন কি বড় বৌ-এর গায়ে হাত দিতে, চড়চাপড় মারতে কোন দ্বিধা ছিল না। বড় বৌদির বাপের বাড়িতে ধনী বাবা ছিল। বেশিদিন সে কারণে তাকে শ্বশুর বাড়িতে থাকতে হয়নি। বড়দা চাকরি করত। বড়বৌদির বাবা বোলপুরে বাসা করে দিয়েছিল। সেখানেই বড়দা স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। বড়ছেলে বৌ এর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল মা। কারোকে সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। এমন কি কেশবদার বিয়েতেও তাদের আসবার অধিকার ছিল না রাধাবৌদির বাবার অর্থ ছিল না। শুধুমাত্র সুন্দরী হওয়াটাই বিয়ের কারণ হয়েছিল। কেশবদার মা বড় বৌদির কথা চিন্তা করে রাধাবৌদিকে পছন্দ করেছিল। বিয়ের পর দু-তিন মাস কেশবদার মায়ের ব্যবহারে রাধাবৌদি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেটা যে কৃত্রিম তা বুঝতে পারেননি। কেশবদা শহরের একটা সিনেমা হল লিজ নিয়ে ব্যবসা করত বিয়ের আগে থেকে। কেশবদার বাবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে লাইসেন্স বিভাগে ছিল বলে কেশবদার সিনেমা ব্যবসা করা সুবিধে হয়েছিল। প্রতি রাত্রিতে কেশবদা সিনেমা হলে টিকিট বিক্রির টাকা মাকে দিত। অবশ্য সৌখিনতার জন্য কেশবদা কিছু টাকা সরিয়ে রাখত। বিয়ের পর কেশবদা রাধাবৌদিকে যখন থেকে কিছু করে টাকা দিতে শুরু করল লুকিয়ে তখনই শুরু হল ঝামেলা। কেশবদার মা সন্দেহ করতে লাগল তাকে টাকা কম দিয়ে কেশবদা স্ত্রীকে দেয়। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দেওয়া আরম্ভ হ'ল রাধাবৌদিকে। কেশবদা অলকাকেও খুব ভালবাসতো। বোন যা নেবার জেদ ধরে তা এনে দেয়। রাধাবৌদিও অলকাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। অলকা ছিল বন্ধুর মতোই। শাশুড়ির সব কিছু অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেন বৌদি। ভাবতেন পেটে

ছেলে এলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের তিন বছরের মধ্যে কোন ছেলে বা মেয়ে এল না রাধাবৌদির ভাগ্যে। কেশবদা বৌদিকে সান্ত্বনা দিত ছেলে বা মেয়ে হলে যে সুখ হবে তার তো মানে নেই। মনের মত না হ'লে তো আরো দুঃখ। রাধা বৌদি স্বপ্ন দেখতেন মেয়ে হ'লে বিয়ে দেবেন বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজে। মাঝে মাঝে চলে যাবেন মেয়ের কাছে। ছেলে হ'লে তাকে মানুষ করে এমন চাকরি হবে যে দেশের সব বড় বড় জায়গায় যেতে পারেন। ছেলের সুন্দরী বৌ হবে। তাকে প্রাণভরে ভালবাসবেন। কেশবদাও হয়ত একই স্বপ্ন দেখতো গোপনে। ভালবাসা দিয়ে কেশবদা রাধাবৌদির সব কিছু দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করত। রাধা বৌদিও তার ওপর শাশুড়ির সারাদিনের নির্যাতন কেশবদাকে বলতেন না। কেশবদা সিনেমা শেষে রাত্রি বারোটায় ফিরে যাতে মনে কোন অশান্তি না পায়। এসব বহু কথা রাধাবৌদি বলতেন আমাকে। বলে হয়তো তার মনটা হালকা হত। রাধা বৌদির কষ্ট দেখে বা শুনে আমার কিছু করার ছিল না। মনে কষ্ট হ'ত। কোন সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। কেশবদার মাকে আমিও ভয় করতাম। এভাবেই কাটছিল কেশবদার বিয়ের পর চারবছর। কিন্তু হঠাৎ যে এমন ঝড় আসবে ওদের জীবনে কেউ ভাবতে পারেনি।

একদিন সন্ধ্যার কিছুটা পর সিনেমা হলের ম্যানেজার কেশবদাকে খবর দিল—অলকা একটা ছেলের সঙ্গে হলে সিনেমা দেখছে। কেশবদা ছেলেটার কথা জানতো। বখাটে ছেলে। সব রকম নেশা করে। বহু মেয়ের সঙ্গে মিশে কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। কেশবদা কোনদিন ভাবতেই পারে নি অলকা এমন একটা ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। শো ভাঙার আগেই কেশবদা গেটের কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখল দুজনকে হাসতে হাসতে বেরোতে। মাথায় খুন চেপে গেল কেশবদার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কেশবদা অলকাকে মারতে মারতে ঘরে নিয়ে এল। মাকে বলল—তোমার আদরের মেয়ে প্রেম করে জীবন নষ্ট করতে শিখেছে। লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখেছে আজ। অলকা শুধু কেঁদেছে। মাও বকাঝকা করেছে খুব। তারপর কেশবদা ফিরে চলে গেছে, আবার সিনেমা হলে। নাইটশো শুরু হবে। কর্মচারীদের বিশ্বাস নেই। টিকিট না কেটেও পয়সা দিয়ে দর্শক সিনেমা দেখবে। তারপর রাতে ফিরে রাধাবৌদির কাছে জেনেছে অলকা না খেয়ে ঘর বন্ধ করে শুয়েছে। কেশবদা স্থির থাকতে পারেনি। দরজায় টোকা মেরে ডেকেছে। কোন সাড়া নেই। তারপর দরজা ভাঙতে হয়েছে। ঘরে ভেতরে ঢুকে স্তম্ভিত। অলকা মেঝেতে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে ফেনা ঝড়ছে। পাশেই র‍্যাটম নামে ইঁদুর মারা বিষের ফাঁকা প্যাকেট। কেশবদা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। বলেছে—অলকা, তোর মঙ্গল চিন্তা করে একদিন বকলাম, মারলাম তাতেই তোর এত অভিমান হ'ল? আমার এতদিনের ভালবাসা সব ভুলে গেলি? অজ্ঞান অলকার কানে সে কথা পৌঁছেছে কি না কেউ জানে না। ডাক্তার এসেছে। বমি করিয়েছে। কোন ফল হয়নি। দু-এক ঘণ্টা পর অলকা মারা গেছে। তারপর শুরু হয়েছে ইতিহাস। যদিও স্বল্প সময়ের। কিন্তু নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের করুণ ইতিহাস।

কেশবদা তো পাথর হ'য়ে গেল। সব সময় অনুশোচনা এ আমি কি করলাম। আমি আমার এত স্নেহের বোনের মৃত্যুর কারণ হয়ে গেলাম। কেশবদার মা হ'তে থাকল হিংস্র। অলকার মৃত দেহ যখন দাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে মা তখন চিৎকার করছে "কেশব আর ঐ অলুক্ষণে বৌ আমার মেয়েকে খেলো।" কেশবদা ও বৌদি নীরবে সহ্য করছিল। তারপর দিন থেকে কেশবদা অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে। বাড়িতে থাকলে সব সময় মায়ের এক কথা। রাধা বৌদিকে বাড়িতে থাকতে হয়। শুধু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাই নয়। নানা অত্যাচার বাড়তে থাকে।

কারণ সৃষ্টি করে মারধর করতেও পিছপা হয় না মা। সকলে খাচ্ছে, কেশবদা অভুক্ত। ওর খাবার পড়ে থাকে আঢাকা। খেতে যদি বসেও সঙ্গে সঙ্গে মায়ের একটাই কথা। "আমার মেয়েকে খেয়েও খিদে মিটল না।" কেশবদা একটা ভাতের দানাও খেতে পারলে না। হাত খানা মুখ থেকে থালায় নামিয়ে উঠে পড়ল। হাত ধুয়ে বেড়িয়ে গেল বাড়ি থেকে। মুক্ত হ'ল কেশবদা আপাতত। আর রাধাবৌদি?

তার ওপর তো অত্যাচার বাড়তে থাকল দিনের পর দিন। বাড়িতে সকলের রান্না করার যে লোক ছিল তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। প্রথম প্রথম রাধাবৌদি প্রয়োজন মতো সাহায্য করতেন রান্নায় তরকারি কেটে বা মশলার জোগান দিয়ে। রাঁধুনীকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর সব কাজ তখন রাধা বৌদির। ভোর থেকে উঠে সংসারের অন্য কাজ। রান্নাবান্না এবং এক একটা সময়ে এক এক জনকে খেতে দিয়ে খাবার সময় যখন পেতেন তখন বেলা তিনটে। স্বামী কিছু না খেয়ে চলে গেলে কোন স্ত্রী খেতে পারে। খেতে বসার সাহসও হারিয়ে ছিলেন বৌদি। নিজের ছেলেকে যে মা খাওয়ার শুরুতেই তেমন কথা বলতে পারে সে কি বৌকে অব্যাহতি দেবে কটূক্তি থেকে? শুধু কি কটূক্তি। প্রতিপদে খুঁত ধরে নানা অত্যাচার। রাধা বৌদি রান্না করছেন। সেই সময় কেউ হয়ত চা চেয়ে পায়নি। শাশুড়ি এসে গরম খুন্তি বৌদির হাত থেকে কেড়ে হাতে, পিঠে বা শরীরের অন্যস্থানে আঘাত করেছে। ফোস্কা পড়েছে ঘা হয়েছে নানা জায়গায়। বৌদি স্নান ক'রে সবে বেরিয়েছেন, কোন না কোন অজুহাতে মাথার চুল ধরে শাশুড়ি চড়-থাপ্পড় মেরেছে। জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। সারা শরীর নোংরায় ভরে গেছে। এরকম দু একদিনের ঘটনা আমার চোখে পড়েছে হঠাৎ আমার বন্ধুর খোঁজ করতে গিয়ে। একদিন কেশবদার মা কোথায় গিয়েছিল। আমি কি একটা বই আনতে গেছি। বন্ধু বা অন্য কেউ ছিল না। বৌদি রান্না ঘরে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এল। আমি বললাম আর কত সহ্য করবেন? বৌদি বলল 'তোমার দাদা যতদিন এ বাড়িতে থাকবে আমাকে তো সহ্য করতে হবে।' বৌদির গায়ে ফোস্কা ও ঘা দেখি। শিউরে উঠি। বাড়িতে ফিরে মাকে বলি। মা বলে—রায় গিন্নিকে যদি বলতে যাই, আমাকে তো অপমান করবেই, মেজবৌমার কোন লাভ হবে না—বরং অত্যাচার বেড়ে যাবে। মা বাবাকে বলে—'কোর্ট-কাছারী থানা আছে কি জন্যে? তুমি কিছু করতে পার না? বাবা বলে কিছু একটা তো করতেই হয়।' তারপর বাবা থানার বড়বাবুকে একদিন খবরও দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়বাবু যখন সময় পেল আসবার তার মধ্যে আর একটা অঘটন ঘটে গেল। অলকার মৃত্যু তখন একমাস হয়ত আগে হয়েছে।

কেশবদার মৃতদেহ আনা হল সিনেমা হল থেকে। তখন বেলা প্রায় একটা। হলে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে ঘণ্টাখানেক আগে। কর্মচারীরা ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল। কেশবদা আনতে দেয়নি। বলেছে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর যখন মুখ থেকে ফেনা বের হ'তে আরম্ভ করেছে ডাক্তার আনার চেষ্টা করা হয়েছে। দেরি হয়ে গেছে ডাক্তারের পৌঁছতে কোন কারণে। ডাক্তার এসে দেখেছে কেশবদা মৃত। জানায় কেশবদাও ইঁদুর মারা বিষ র‍্যাটম বেশ কয়েকটা খেয়ে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও ডাক্তার ডাকতে দেয়নি। মৃতদেহ যখন বাড়ি আনা হ'ল সকলের নজর তখন সেদিকে। আরো বিস্ময় তখন অপেক্ষা করছিল। মৃতদেহ ঘিরে অনেকেই। কেশবদার মাও কাঁদছিল। ঘৃণা হচ্ছিল আমার তা দেখে। রাধা বৌদিকে কেন দেখা যাচ্ছে না। বন্ধুকে নিয়ে এসে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। কড়া নেড়ে সাড়া পাওয়া গেল না। কয়েকজনকে ডেকে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে অজ্ঞান রাধাবৌদিকে আনা হল। ঘরের মধ্যে র‍্যাটমের কাগজ। ক'টা খেয়েছে বোঝা গেল না। পাড়ার ডাক্তারবাবুর জল দিয়ে পেট ওয়াশ করা শুরু হ'ল।

কয়েক ঘণ্টা পর ডাক্তারবাবু বললেন ভয়ের আর কারণ নেই। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রাণটা বাঁচানো গেছে। কেশবদার দেহটা অনেক আগেই চলে গেছে। বাড়ি থেকে। নানা পুলিশী কার্য্যকলাপ আছে। তারপর সৎকারের পর শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এসেছে। রাধা বৌদির এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান ফেরেনি। অনাহারে দুর্বলতা তার একটা কারণ। কেশবদার মা তারপর কিছুটা সংযত হয়েছে মাত্র কয়েকদিন। চারদিন কেটেছে শ্রাদ্ধের নানা কাজে। এরমধ্যে রাধাবৌদির জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু কোন কথা বলেননি কারো সঙ্গে। বাড়িতে বাবাকে বলতে শুনেছি আত্মহত্যার চেষ্টাও আইনে অপরাধ। ভয় হয়েছে আমার। রাধাবৌদিকে আবার পুলিশী ঝামেলায় পড়তে না হয়। এখন হয় তো অসুস্থতা এবং গৃহবধূ হওয়ার জন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। সেটা তো বেশিদিন হবে না। এই সব ভেবে আমি একদিন বৌদিকে বললাম—'দাদা তো আর এ বাড়িতে নেই। আর থাকা কেন?' বৌদি বললেন 'কোথায় যাব? বাবা তো মারা গেছে ছমাস আগে। শেষ দেখা দেখতেও পাইনি। বিধবা মা আমার ভার কী করে নেবে? আমি বললাম—'ওসব না ভেবে আপনাকে পালাতে হবে যততাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি আপনাকে সাহায্য করব'। বৌদি অনেক ভেবে সন্ধেবেলা ডেকে পাঠালেন। কথামত শেষরাত্রির অন্ধকারে বৌদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আমি তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসেছিলাম। বৌদি সেকারণেই আমাকে ভুলতে পারেননি। অতি সহজেই চিনতে পেরেছিলেন আশ্রমে।

আমার ট্রেন থেমেছে বহু স্টেশনে। কিন্তু খেয়ালেই আসেনি। আমি চোখ বন্ধ ক'রে আছি। আমার স্ত্রী ঘুম ভেবে ভাঙাতে চায়নি। স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন ছিলাম। বিষাদঘন এক স্মৃতি যা জীবনের কর্মক্ষেত্রে লীন হয়েছিল। স্মৃতি যত বিষাদ ঘনই হোক বর্তমান যে এত সুখ দেবে বুঝতে পারিনি।

আশ্রমে রাধাবৌদিকে একান্তে প্রশ্ন করেছিলাম কৌতূহল মেটাতে। বৌদি বলেছিলেন আশ্রমে আসার আগের করুণ দিনগুলোর কথা। বৌদি বাবার বাড়িতে কয়েকদিন কষ্টে থাকার পর সাধক জগদীশ বাবা এসেছিলেন গ্রামে। বৌদির কষ্টের কথা জেনে তাকে নিয়ে যান দুমকার আশ্রম। সেখানে বৌদি মন্দির পরিষ্কার, ফুল বেলপাতা তুলে আনা, মন্দিরের মেঝেয় আলপনা দেওয়া ইত্যাদি কাজে দিন কাটাতেন। জগদীশবাবার দুমকায় ছাড়াও উড়িষ্যার একটা গ্রামে আশ্রমে ছিল। সেখানেও যেতেন বছরে কয়েক বার। বৌদির আচার-আচরণ মুগ্ধ করেছিল জগদীশ বাবাকে। তাকে যোগ্যা শিষ্যা হিসেবে তৈরি করছিলেন। দুমকা আশ্রমে প্রায় দশবছর থাকার পর জগদীশ বাবা বৌদিকে উড়িষ্যায় সে আশ্রমে আনেন। বৌদিকে রেখে যান সেখানে। তারপর থেকে বৌদি সেখানেই থেকে গেছেন। অনেক দূরত্ব সে পথের। আশ্রমের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি মারা গেলে বৌদি তার দায়িত্ব নেন। তার বহু আগেই বৌদি অন্নদা মা হয়ে গেছেন। বেশি কিছু বলেননি বৌদি। বলার প্রয়োজনও ছিল না। 'অন্নদা মা' হওয়াটাই আমার কাছে বিস্ময়। কত পথ কী ভাবে অতিক্রম করে অন্নদা মা হয়েছেন তার মূল্য আমার কাছে ততটা নয়। কিন্তু যেটা আনন্দের তা হল স্বামী কেশবকে হারিয়েও ফিরে পেয়েছেন কৃষ্ণ কেশবকে। হয়ত সে মূর্তিতে দেখতে পায় দেবতা ও স্বামীকে। স্বামীও তো তার কাছে দেবতা ছিল। জীবনের সায়াহ্নে তো একটা শান্তি পান বৌদি। ফুল বেলপাতা চরণে অর্পণ করে পূজার পরিতৃপ্তি।

কেশবদার ভাই যে আমার বন্ধু ছিল, মারা গেল গত বছর। একে একে সব ভাই মারা গেছে বিভিন্ন সময়ে দু বছর তিন বছরের ব্যবধানে। শুধুমাত্র সব থেকে ছোট দুই ছেলে, একজন আমার

বন্ধু, অন্যজন তার ভাই বেঁচেছিল তাদের মা মারা যাবার দশ বছর পরও। যতদিন আমার বন্ধু বেঁচেছিল রাধাবৌদির কথা প্রকাশ করতে পারিনি। বন্ধু মনে কষ্ট পাবে। যতই হোক কেশবদার মা তো তারও মা। এখন যারা বেঁচে আছে সে পরিবারের তাদের কাছে এসব ঘটনা হয়তো অজানা। কিন্তু যদি কেউ কিছুটাও শুনেও থাকে সে কারণে স্থান, কাল ও পাত্রের নাম পরিবর্তন করেছি। কারণ গল্প লেখার তো অনেক বাধা। কিন্তু ঘটনা অধিকাংশ সত্য। গল্পের আরো একটা উদ্দেশ্য আছে। সত্যিকারের বধূনির্যাতন এবং সহনশীলতা। এই যুগের মেয়েরা জানুক। অহেতুক আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করুক। একদিন কোন গঞ্জনা, লাঞ্ছনা বা কোন নিপীড়ন হলেই তো স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করা যায় বহু ক্ষেত্রে। দিনের পর দিন সহ্য করে যাওয়া আধুনিক যুগে অনেকটা অবান্তর। তাছাড়া আইনের একটা ধারার যেন অপব্যবহার না হয়। তা হলে একদিন আসবে যখন সত্যিকারের অত্যাচারিতাকেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

আর একটা কথা। এইজন্ম—পরজন্ম জানি না। পাপ বা পুণ্য—তার ফলশ্রুতি কখন তাও বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যা চোখে দেখা যায় ইহজন্মে তাকে পাপের ফল ধরে নেবার যুক্তি কতটা গ্রাহ্য তা বিবেচনা সাপেক্ষ। কেশবদার মা সারাটা জীবন যে আচার ও আচরণ করেছেন তা যেমন দেখেছি তেমনি তার শেষ বছর গুলো যে অতি দুঃখে কেটেছে তাও তো চোখে পড়েছে। তার জীবদ্দশায় তাকে মৃত্যু দেখতে হয়েছে একের পর এক। শুধু দুই ছোট ছেলে ছাড়া। সেই দুজনের একজন দুর্ঘটনায় একটা পা হারিয়েছে। সে অবস্থা দেখে তার জীবনের শেষ তিন চার বছর কেটেছে। শুধু ছোট ছেলের কোন কষ্ট দেখতে হয়নি। কেশবদার মা যখন মারা যায় দুজনের মধ্যে কোন ছেলেই কাছে ছিল না। তার দেহটা কখন থেকে যে মৃত অবস্থায় ছিল কেউ জানতে পারেনি। সকাল দশটায় যখন ঝি আসে কাজ করতে তখনই প্রথম জানা যায়। তারপরও সে মৃতদেহ সৎকার করার অপেক্ষায় থাকে বেশ কয়েকঘণ্টা। তার মুখাগ্নি করার সুযোগ পায়নি দুই ছেলের কেউ। পাড়ার সৎকার সমিতি তার দেহ চরম হেলায় দাহ করে ছিল। এসব কিছু আমাকে দেখতে হয়েছে আমার তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মধ্যে। রাধাবৌদিকে এসব কথা বলতে পারিনি। কারণ তখন তিনি অন্নদামা—রাধিকা-সাধিকা।

রাধাবৌদির কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় কেন আজকের মেয়েদের সহনশীলতা নেই? কেন একদিন কি দুদিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে আত্মনির্ভরতার পথ নিতে পারে না? আত্মহননের প্রবৃত্তি কেন বর্জন করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার তো প্রসার হয়েছে অনেক। মুখ বুজে কেন সহ্য করে দিনের পর দিন? কেনই বা পণের লোভ সম্বরণ করতে পারে না? সব ক্ষেত্রেই কি মাসের পর মাস বছরের পর বছর উৎপীড়ন করে যাওয়া সম্ভব? আরো কত প্রশ্ন— মনকে জর্জরিত করে যার সদুত্তর পাই না।

কোন এক গাঁয়ের বধূ

খুনের রাজনীতি নয়। রাজনৈতিক কারণে খুনও নয়। আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন। সে খুন অন্যান্য সংবাদপত্রে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রকাশ পাওয়া খুনের মতোই সকলে ভাববে। সেটাই স্বাভাবিক। ধরেই নেবে সাধারণ মানুষ, অন্যায় দাবি মেনে নিতে না পারার কারণে স্বামীকুলের সকলেই ষড়যন্ত্র করে স্ত্রীকে খুন করেছে। করুণা মমতা সহানুভূতি পাবে না স্বামীকুল। সেটাও স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষকে তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। কত কথা অজানা থেকে যায় তাদের। আমারও হয়ত অজানা থেকে যেত অনেক কথা। কিন্তু সুদেষ্ণা খুনের মামলায় আমার কাছে এসেছিল অভিযুক্তেরা। দোষ স্বীকার করে নিতে চেয়েছিল। আমি হতচকিত হয়েছিলাম যখন বলেছিল—'আমাদের সকলের যাতে ফাঁসির আদেশ হয় আপনি তাই করুন। গ্রামে আমরা কোনদিনই থাকতে পারব না। আজীবন জেলে থাকলে একমাত্র ছেলের আত্মহত্যার দুঃখ। তার সঙ্গে বিনা দোষে যে শাস্তি হয়ে গেছে তা নিয়ে অহরহ যন্ত্রণা। তার থেকে মৃত্যু ভালো।' আমি বলেছিলাম—'ফাঁসি দেবার ক্ষমতা সব ক্ষেত্রে বিচারকেরই নেই। আমার তো প্রশ্নই ওঠে না। অভিযুক্তের হয়ে দাঁড়িয়ে আমি লড়াই করতে পারি আইনের বেড়াজালের মধ্যে, প্রমাণ পরীক্ষা করে নিতে সাহায্য করতে পারি, দেখাবার চেষ্টা করতে পারি অবিশ্বাস্য ঘটনা বা প্রমাণ এবং প্রার্থনা করতে পারি অভিযুক্তের মুক্তির। শ্রম দিতে পারি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারি। দোষ না করেও দোষ স্বীকার করার পরামর্শ দিতে পারি না।' তাদের রাজি করেছিলাম বিচার নিতে। তারা আমার কথা শুনেছিল। তারপর সে মামলা করতে গিয়ে যা জেনেছিলাম তা কল্পনা করতে পারিনি কোনদিন। আজো দুঃস্বপ্নে অভিযুক্তদের আর্তনাদ শুনতে পাই আমাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করে দিন।"

সুদেষ্ণা খুন হয়েছিল স্বামীর হাতে। সেই খুনের পিছনে ছিল কদর্য রাজনীতি। রাজনীতির প্রকাশ যে এত নির্মম হতে পারে সুদেষ্ণা খুনের মামলা তার প্রমাণ। সে কারণেই সুদেষ্ণাকে নিয়ে গল্প হয়। সেও এক মায়ের মেয়ে। সুন্দরী সপ্তদশী। বিয়ে হয় কল্যাণের সঙ্গে। একে বিয়ে বললে বিয়ে কথাটারই অমর্যাদা হবে। কারণ সুদেষ্ণার প্রাক বিবাহ জীবন অন্যান্য অনেকের থেকে আলাদা। সে সুন্দরী সেই সুবাদে অনেকেই আকৃষ্ট হত। সে মিশতোও অনেকের সঙ্গে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এমন অবাধে মেলামেশা করত তা সে জানত। আর কারো জানা সম্ভব ছিল না। যাদের সঙ্গে মিশত তারা সকলেই রাজনীতি করে। কল্যাণের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা সে করেছে। কল্যাণ আমল দেয়নি। সে জানতো সুদেষ্ণা কেমন মেয়ে। তার মেলামেশার লোক কারা। তাই চেষ্টা করত দূরে দূরে থাকার। কিন্তু তবুও তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হতে হল। এখানেই কল্যাণ ও তার বাবাকে মাথা নত করতে হ'ল এমন সব যুবকদের কাছে যারা রাজনীতি ক'রে ক্ষমতা পেয়েছে। স্থানীয় নেতার তারা হাতিয়ার। সুবোধ, বিকাশ, শশাঙ্ক, রমেন, অনীশ, সুরেশ, কমল, মহেশ ও রথীন সাহায্য করত সুবিমল সেনকে নানা ভাবে। তাদের সুবিমলদা শহরে যে মিছিল নিয়ে সমাবেশ করত বা সভায় লোক জমায়েত করত তাতে সুবোধ—বিকাশরা দায়িত্ব নিত জনস্রোত সংগ্রহের দশ-বিশটা গ্রামের লোক যখন মিছিল করে শহরে যেত তখন সামনে স্লোগান দিত তারা। তাদের এই শক্তি প্রদর্শনে বিরোধী দল যাতে ভীত হয় সেটাই ছিল তাদের দলের প্রধান উদ্দেশ্য। যে দল যখন ক্ষমতায় তখন সুবোধ বিকাশেরা সেই দলে। প্রাপ্তির আশা চলে গেলে অভিনব পন্থায় দল পরিবর্তন। সত্তরের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত সুবোধ বিকাশের মতো মানুষেরা ক্ষমতার শীর্ষে। তাদের

বিরুদ্ধে মুখ তুলবার শক্তি কোন মানুষের ছিল না। চরিত্রের দিক থেকেও তাদের তুলনা ছিল না। সুদেষ্ণাদের মতো মেয়েদেরকে খেলনার মত ব্যবহার করত। অন্য মেয়েদেরও চাকরির মোহ দিয়ে উপভোগ করত। তারপর তাঁদেরকে কারো না কারো মাথায় চাপিয়ে দিত। সুদেষ্ণাও এইরকম পরিস্থিতিতে গর্ভবতী হ'লে সুবোধ বিকাশরা অপবাদ দেয় কল্যাণ এর জন্য দায়ী। সুদেষ্ণাও তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি রাখেনি। ফলে কল্যাণকে গ্রামের এক মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সুদেষ্ণার সিঁথিতে জোর ক'রে সিঁদুর দিতে বাধ্য করে। তারপর তাকেও সুদেষ্ণাকে আনে কল্যাণের বাবা সুদর্শনের কাছে। সুদেষ্ণা প্রণাম করে। সুবোধরা বলে—আপনার বৌমা। সুদর্শন হত চকিত হয়ে যায়। কিছু বুঝে উঠবার আগেই তারা বলে—"বৌমাকে ঘরে স্থান না দিলে বধূনির্যাতনের মামলা করে সব আত্মীয়কে হাজত বাস করাব।" তিন বছর জেল হতে পারে এবং তার আগে দুমাস জামিন না পাবার ভয় সুদর্শন ও কল্যাণকে বাধ্য করেছে সুদেষ্ণাকে বৌ হিসেবে বাড়িতে রাখতে। তার পরিণাম যে এত মর্মন্তুদ হবে কেউ ভাবতে পারেনি।

গ্রামের মেয়ে সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল পঞ্চাশের দশক থেকে তা এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হবে ভাবতে পারা যায়নি। ছেলেবেলা থেকে যুবক হওয়ার পরও গ্রামের মেয়েদের নাম শুনতাম তরুলতা বা চারুশীলা। নয়তো বা প্রভাবতী ব৷ প্রভা। যাদের দেখতাম ঘরের যুবতী বৌ তারা ছিল সহজ, সরল, লজ্জাশীল। ঘরের বাইরে বেরোবার কোন স্বাধীনতা থাকতো না। পাঠশালা পর্যন্ত লেখাপড়া, তারপর বিয়ে এবং স্বামীর বাড়ি। সেখানে যৌথ পরিবার। কারো শান্তির, কারো অশান্তির জীবন। অশান্তির মধ্যেও নীরব সহনশীলতা। শৈশব ও কৌশারে দেখা সে যুগ যেন এক ইতিহাস। গ্রাম তখন কলকাতা। মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে বহু দূরে। যেন লন্ডন প্যারিসের মত বিদেশ। লন্ডন প্যারিসের নামও জানতো না অনেকে। তাঁবুতে, সিনেমায় রাম-লক্ষ্মণ বা কৃষ্ণ, কর্ণ, দুর্যোধনকে যারা দেখতো তাদের অভিনেতারাও যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। বাস্তবের পৃথিবী ছিল ছোট গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিকটস্থ কোন গঞ্জ সেখানে শুধু সপ্তাহে একদিন হাট বসত। যা কিছু কেনাকাটা একবারই জমির ফসল, পুকুরের মাছ আর জমিতে ফলতো লাউ কুমড়ো শাক। স্বল্পে সন্তুষ্ট মানুষের জীবন। কামনা বাসনার পাহাড় ছিল না। সেই যুগ থেকে স্যাটেলাইট কম্পুটার। ইলেকট্রনিক্সের যুগে আসতে ক'টা বছরই বা লাগল। বিগত বিশ-তিরিশ বছরে বিবর্তনটাও খুব দ্রুত। সুশীলা নামে এক গ্রাম্য নারীর জীবনধারা থেকে সুদেষ্ণা নামে অন্যজনের সেই ধারা যেন রকেটের বেগে এসে গেল। সেক্স ভায়োলেন্স জীবনটাকে এনে ফেলল এমন এক জায়গায় যেখানে মানুষের আরোও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনলো। রাজনীতি সেই আচার-আচরণকে করে তুলল কলুষতায় পূর্ণ। এই বিবর্তনই জন্ম দিল সুদেষ্ণার মতো মেয়েদের। ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ ব্যাভিচারে লিপ্ত হল। সৎ, চরিত্রবান ও শিক্ষিত মানুষ হ'য়ে পড়ল অসহায় এই সমাজে। মেয়েরা কারণে অকারণে বধূ নির্যাতনের নালিশ শুরু করে দিল নানা অসদুদ্দেশ্য মূলে। সত্যিকারের নিপীড়িত নারী হয়তো আইনের সাহায্যই পেল না। সত্তর ও একাত্তরের নকশাল আন্দোলন সকলকে শিখিয়ে দিল ক্ষমতা অপব্যবহার করা যায় যদি প্রশাসন করায়ত্তে থাকে। নানা মহিলা সমিতির জন্ম হল রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন হল। সত্য হোক মিথ্যা হোক মহিলা সমিতির কাছে অভিযোগ এলে পুরুষ বিদ্বেষী পদক্ষেপ নেওয়া হল বহু ক্ষেত্রে। গ্রামের রাজনৈতিক সেনা বা জওয়ানেরা তাদের শক্তি প্রদর্শন শুরু করল। নেতৃত্ব তাদের পুলিশ রক্ষা কবচ দিল। তারা যদি বলে এদের বিয়ে হয়েছে তাহলে নিশ্চয় হয়েছে। তাদের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল পারিবারিক ক্ষেত্রেও। কে কার জমি চাষ করবে, কার পুকুরে মাছ চাষ করবে।

ফসলের ভাগ মালিককে দেওয়া হবে কি না বা হলেও কতটা দেওয়া হবে এসব কিছুর সীমাহীন বিচার ক্ষমতা তাদের। সুদেষ্ণাকে গায়ের জোরে সুদর্শনের বাড়িতে স্থান করে দিয়ে সুবোধ বিকাশেরা চুপ করে বসে থাকেনি। এর পরের ছ'মাস সুদর্শনের সারা পরিবার দুর্বিষহ জ্বালা ও যন্ত্রণায় ভুগেছে।

সুদর্শনের বাইরে বসার ঘরকে সুবোধ বিকাশেরা তাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য আডডার জন্য ব্যবহার করেছে। প্রায়ই সকাল বা দুপুরে তাদের মিটিং। তা চলে কখনও তিন ঘণ্টা, কখনও তারও বেশি। সকাল থেকে টানা বেলা দুটো পর্যন্ত মিটিং-এর নামে চলে আড্ডা। চার পাশের গ্রামগুলো থেকে তিনজন বা চারজন করে আসে প্রতিনিধি। দুপুরের খাওয়ার আয়োজন সুদর্শনকে করতে হয়। ভাগের ধান যৎসামান্য যা পায় তাও পাবে না এই ভয়। সুদেষ্ণা সংসারের কোন কাজ করে না। প্রায় সময় সুবোধ বা অন্য কারো না কারো সাথে বাইরে থাকে পার্টির কাজে। শুধু দিনে একবার খাবার জন্য আসে। আবার চলে যায়। সন্ধ্যার সময় পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরলেও সান্ধ্য আড্ডায় থাকে রাত্রি নটা দশটা পর্য্যন্ত। বার বার চা তৈরির আদেশ দেয় শাশুড়ি বা ননদকে। তার সঙ্গে জলখাবার। কোনদিন ওমলেট, তেলেভাজা, সন্দেশ। কোনদিন বা রুটি মাংস। সুদেষ্ণা ভাবে এবং প্রকাশও করে—কেউ তো ভালবেসে তাকে বাড়ির বৌ করে আনেনি। সে এসেছে নিজের শক্তির জোরে। সকলে সবসময় তটস্থ থাকে তার ভয়ে। কল্যাণকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। রাত্রিতে অকারণে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। কল্যাণকে মাদুর বালিশ নিয়ে ঘরের বাইরে শুতে হয়। মুখ বুজে সহ্য করে কল্যাণ সব কিছু অত্যাচার সুদেষ্ণার। সে জানে পুলিশ কাদের বশে। সকলকে সে বোঝায় চুপ করে সহ্য করতে। যারা তাদের আত্মীয় দূরে দূরে বাস করে তাদেরকেও জড়িয়ে মিথ্যা মামলা হবে। কতদিন যে জেলে থাকতে হবে তাদের, কল্যাণদের পরিবারের সকলের সাথে, তা ভাবলে সকলে শিউরে ওঠে। তারপর আছে শিব, কালি দেব দেবীতে অগাধ বিশ্বাস। পাপ পুণ্য তার ফল হবেই এসব চিন্তায় সহ্য করে সুদেষ্ণা ও সুবোধদেব সব অত্যাচার। সহ্য করা যেন অভ্যাসে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এইভাবে প্রায় দু' মাস কাটে। কিন্তু সব সহ্য শক্তি কল্যাণ হারিয়ে ফেলে যখন সুদেষ্ণা বলে তার পেটে সন্তান এসেছে। কল্যাণ কতটুকুই বা চোখ চেয়ে দেখেছে সুদেষ্ণাকে। বিয়ের একমাস পর তো একেবারেই স্বামী স্ত্রী-র মধ্যে দেখাও হ'ত না। সুদেষ্ণা সেই একমাসের মধ্যে এক বিছানায় শোয়নি কোন দিন। কল্যাণের জীবনে ফুলশয্যার রাত আসেনি। অহেতুক ঝগড়া সৃষ্টি করে কল্যাণকে ঘরের বাইরে একা শুতে হয়েছে প্রথম দিন থেকে। কিন্তু যখন শুনেছে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আছে তখন সব কিছু অর্থ খুঁজে পেয়েছে। এ তবে কার সন্তান? তার জন্যই কি বিয়ের এই নাটক। সুদর্শনের পরিবারের সকলেরই চোখে পড়েছে সুদেষ্ণার পেটের পরিবর্তন। তারা ভেবেছে এটা অসম্ভব। কল্যাণের সঙ্গে বিয়ে দেড়মাস হয়নি। তবুও তাকে স্পষ্টত গর্ভবতী দেখায় কী করে? কিন্তু এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস থাকে না। গ্রামের লোক বুঝতে পারে কার না কার সন্তানের পিতৃত্ব জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কল্যাণের ওপর। বয়স্কেরা ভাবে এ কেমন গাঁয়ের বধূ? তাঁরা তাঁদের শৈশব, কৈশোর যৌবনে যে গাঁয়ের বধূ দেখেছেন বার্ধক্যের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তারা কি দেখছে! কিন্তু প্রতিবাদের শক্তি কেড়ে নিয়েছে রাজনীতির কালো হাত। গত পঁয়ত্রিশ বছরে স্বাধীনতা যে কলুষতা এনেছে তার কারণে নিজের নিজের সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। সমস্যা আর কেউ বাড়াতে চায় না। কল্যাণের মানসিক অবস্থা আরও মর্মান্তিক হয়ে পড়ে যখন দুমাসের মধ্যে সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে দেখে। এতো কম করেও পাঁচ মাসের গর্ভবতী। তবে কি আর গোপন রাখা যাবে না বলেই জানানো। কিন্তু কল্যাণ

মাথার ঠিক রাখতে পারে না যখন সুদেষ্ণা হুমকি দেয়—আত্মহত্যা করবে। সকলকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করে যাবে কয়েকটা লাইন মাত্র লিখে একটা ছোট্ট কাগজে। কল্যাণকে মেনে নিতে হবে। সকলের কাছে স্বীকার করতে হবে বিয়ের আগে থেকেই ভাব ও ভালবাসার ফলে এ সন্তান। প্রথমটা হতবাক হয়। তার পর হিংস্র পশু হয়ে পড়ে।

ভোরবেলায় দেখা যায় কল্যাণের ঘরের দরজা এবং বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। কল্যাণের মা অন্ধকার থাকতে সদর দরজায় গোবর দিয়ে মারুলি দেবার সময় দেখে দরজাই খোলা। প্রথমটা কিছু সন্দেহ করেনি। ভেবেছে কল্যাণ হয় তো বাইরে গেছে। তারপর মনে হয়েছে বাইরে দরজায় তো কোন তালা নেই। নিতান্ত কৌতূহলে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই আঁতকে ওঠে। ঘরের মেঝেতে রক্তের বন্যা বইছে। চীৎকার করে ওঠে। অনেকে আসে। দেখে সুদেষ্ণার মুখটা একটা কাপড় দিয়ে বাঁধা। মনে হয় সে যাতে চিৎকার করতে না পারে তার জন্য। খাটের মধ্যে চিৎ হয়ে শোয়া। শরীরের সব জায়গায় ধারালো অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বিছানা রক্তে ভেজা। কল্যাণের পড়ার টেবিলে একটা ছোট চিঠি—তাতে লেখা—'মা, এই এক কালনাগিনী আমাদের সংসারে বিষ ঢেলেছে। এর বাঁচার কোন অধিকার নেই। আমি নিজে হাতে ওকে শেষ করেছি। ছুরির আঘাতে আঘাতে ভরিয়ে দিয়েছি শরীর। কোনক্রমেই যেন বাঁচতে না পারে। আমায় ক্ষমা কোর। আমি চলে যাচ্ছি।'

পুলিশ সংবাদ পেয়ে আসে। তার আগেই সুবোধ বিকাশেরা ঘরে ভেতর ঢুকে সেই চিঠি হস্তগত করে। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয় কল্যাণের পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে। বৃদ্ধ বাবা-মা, দুই বোনকে তো অভিযুক্ত করেই। এমনকি অন্য দুই বিবাহিতা বোন ও জামাইদের রেহাই দেয় না। কল্যাণ সম্বন্ধে তারা ভেবেছিল সুদেষ্ণাকে খুন করে সে আত্মগোপন করেছে। এই খুনে সকলে ষড়যন্ত্র করেছে। পুলিশ মৃতদেহ সুরতহাল করার আগেই সকলকে গ্রেপ্তার করেছে। থানায় যখন তাদের চালান দেওয়া হচ্ছে তখন খবর এসেছে দ্বারকা নদীর পাড়ে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। পুলিশ স্থির নিশ্চিত মৃতদেহ কল্যাণের। সুবোধ বিকাশ নদীর পাড়ে মৃতদেহ দেখে নিরাশ হয়। পুলিশের সাথে তারাও দেখে কল্যাণের মৃতদেহ। কল্যাণের বাবা-মা ও অন্যান্য সবাইকে গ্রেপ্তার করা আগে হলেও কল্যাণের মৃতদেহ তাদের দেখানো হয়। কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা। কনেস্টেবলদের হেপাজতে তাদের থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কল্যাণের মৃতদেহ গাছ হ'তে নামিয়ে সুরতহাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় না। মৃতদেহের কাছে দারোগা বসে থাকেন প্রায় একঘণ্টা। এই সময়ে গ্রামে সুদর্শনের বাড়ি লুঠপাট হয়। সুবোধ বিকাশদের নেতৃত্বে। খড়ের চালের বাড়ি তছনছ করে তাতে আগুন লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। কেউ সাহস করে না সে আগুন নেভাবার। সকলকে সুদেষ্ণা খুনের মামলায় জড়িয়ে দেবার জন্য সুবোধ বিকাশের দল কল্যাণের লেখা চিঠি পুলিশকে না দিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। বহু পরে পুলিশ তা উদ্ধার করলেও তা কারো কাজে লাগে না। মামলা তখন শুরু হয়ে গেছে।

জেলে থাকতে-সুদর্শন ও অন্যান্যরা খবর পায় লুঠপাট ও বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার কথা। সেজন্য জেল থেকে বের হবার কোন আগ্রহ তাদের ছিল না। কারণ তারা তখন নিরাশ্রয়। একমাত্র ছেলে আত্মহত্যা করেছে এ দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে নীরবে। নিজেরা বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি কল্যাণের বাবা ও মা। বারবার বলেছে এক কথা। আমাদের ফাঁসির আদেশ করিয়ে দিন উকিলবাবু। পাপই যদি আমরা করে থাকি সে পাপে কেন মৃত্যু হবে না আমাদের? আমরা দোষ স্বীকার করব। কোন আইনি সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি

বার বার তা নিষেধ করেছি। সত্য ঘটনা আমি শুনেছি ব'লে। সুবোধ বিকাশদের দলের একটি ছেলে আমার কাছে উপকার পেয়েছিল আগে। তার নাম ছিল তমাল পাল। কংগ্রেসী জমানায় তাকে একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। অভিযোগ হ'তে মুক্তি পেয়ে সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। সুবোধ বিকাশদের দলের হলেও সে এই ঘটনায় নিজে যুক্ত ছিল না। সে কিন্তু তাদের সব কীর্তিকলাপ জানতো এবং নিজে থেকে এসে আমাকে বলেছিল প্রকৃত সব ঘটনা। সেও তাদের কাজ মনে মনে মেনে নিতে পারে নি। বরং সকলের জন্য এমনকি কল্যাণের জন্যও তার করুণা ছিল। কল্যাণের সেই চিঠি সে পুলিশকে না দিলে কোনদিন সে সত্য জানা যেত না। তার জন্য সে সুবোধ বিকাশদের বিরাগভাজন হয়েছিল। পার্টি থেকে তাকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছিল। তমাল সাহস করে সাক্ষী দিতেও পেছপা হয়নি।

তমাল সাহায্য না করলে সরকারপক্ষের মামলা ছিল খুব সহজ সরল। সুদেষ্ণাকে বিয়েতে পণ দেওয়া হয়েছিল অনেক। তবুও শ্বশুরবাড়ির দাবির শেষ ছিল না। দাবি না মেটাতে পারায় তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করত সকলে। তারপর একদিন সকলে ষড়যন্ত্র করে তাকে খুন করেছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা সাক্ষীর অভাব ছিল না। সুবোধ বিকাশদের কল্যাণে। কিন্তু তমাল যদি সাহায্য না করতো বা যে দারোগা তমালের কাছে চিঠি নিয়েছিলেন তিনি না সাহায্য করলে সেই মিথ্যাকে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না কল্যাণ যে মেরেছে সুদেষ্ণাকে তা কেউ অস্বীকার করিনি সে মামলায়। কারণ কল্যাণ আত্মহত্যা করার তার আর শাস্তির কোন সুযোগ ছিল না। অস্বীকার করেছে অন্যের ষড়যন্ত্রের কথা। সামান্য একটা চিঠি যা কল্যাণের মৃত্যু পূর্ব জবানবন্দি তা অন্যান্যদের মুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী কখনও মিথ্যা বলে না এটাই আইনের কথা। কল্যাণ একা হত্যা অপরাধে দোষী এটা প্রমাণ করতে পেরেছি তাতে যে তৃপ্তি তার থেকেও বেশি তৃপ্তি প্রমাণ করায় যে কোন এক গাঁয়ের বধূর চিত্রটা আমাদের মনে ভাসে—সুদেষ্ণা সে গাঁয়ের বধূ নয়। সেখানেই চরম প্রাপ্তি এবং সার্থকতা। কিন্তু আক্ষেপ থেকে গেছে সুবোধ বিকাশদের দল যারা রাজনীতির ছত্রছায়ায় ঘৃণ্যতম অপরাধ করে তাদের কোন শাস্তি হয় না। কারণ ক্ষমতাশালী দল থাকে তাদের পেছনে। কোন দলই পারেনি উৎখাত করতে তাদের মতো রক্তবীজের ঝাড়দের। তারা একদিকে পায় পার্টির শক্তি যা পুলিশকেও নিয়ন্ত্রণ করে। জানা নেই সমাজে এই দূষিত রক্ত কতদিন থাকবে।

রাইমণি উপাখ্যান

রাইমণি কিস্কুকে একবার চোখের দেখা দেখবার ইচ্ছে ছিল খুব। ইচ্ছেটা বড় একটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তাকে আর কোনদিন দেখা যাবে না জেনেও মনে একট আকর্ষণ বোধ করলাম। দেখতে পাব না এটা ভালই জানি। কারণ সে তো আর বেঁচে নেই। কিন্তু তবু কেন আফসোস হয় একবার দেখতে পেলাম না বলে। জীবনে বহু সাঁওতাল মেয়ে তো চোখে পড়েছে পথে বা গ্রামে। তাদের দেখে কোন কৌতূহল জাগেনি মনে কোনদিন। দেখবার আকর্ষণও ছিল না। যদিও সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়ে অন্যান্য জাতের মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তাদের জীবনযাত্রায়

বৈশিষ্ট্য ছিল। সরল প্রকৃতির মানুষ। সভ্যতার কলুষতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তারা সকলকেই বিশ্বাস করত। নিজের বা অপরের জমিতে ধান পোঁতা বা কাটা ছাড়াও জঙ্গলের কাঠ কাটা এবং মেয়েদের ঘাস কেটে তা বিক্রি করা ছিল উপজীবিকা। তাদের ছিল নিজেদের একটা সমাজ। অন্যায়ের বিচার করতো তাদেরই সর্দার। কোর্ট কাছারি বা সরকারি অফিসের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সে এক যুগ। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছি। আমরা সভ্য সমাজের মানুষ ধীরে ধীরে তাদের জীবন ধারায় প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছি। ফলে তারাও আমাদের শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। ধানকলে, চীনে মাটির খাদানে, কালো পাথরের জমিতে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ কাজের জন্য এসেছে। সিনেমা 'ও পরে টেলিভিসন তাদের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে। এমন কি সাঁওতাল মেয়েদের কাছে দেহ ব্যবসাও অজ্ঞাত নয়। ধানকলে বা খাদানে কাজের সঙ্গে সঙ্গেই দেহ ব্যবসায়ে উপার্জন করতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করে না। হিন্দি সিনেমার নায়িকারা সাঁওতাল মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এই রকম এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাইমণির কথা জেনে তাকে দেখবার সুযোগ না পেয়ে মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি এসেছে। বীরভদ্র সিং যখন রাইমণি খুনের মামলায় অভিযুক্ত হ'য়ে এল তখন একটা নতুন জগতের দরজা খুলে গেল আমার কাছে। রাইমণি কিস্কুদের জগৎ। সেখানে রাইমণিকে প্রাণ দিতে হয় নিষ্পাপ প্রেমের জন্য।

বীরভদ্র আমাকে বলেছিল—"বিশ্বাস করুন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। রাইমণিকে আমি সত্যি ভালবেসেছিলাম। সামাজিক সব বাধা অগ্রাহ্য করে তাকে বিয়েও করতে চেয়েছি। বিয়ে করতে চাওয়াটাই আমার কাল হ'ল।"

আমি তার কাছে যে ঘটনা শুনলাম তাতে হতবাক হয়ে গেলাম। বিহার, বাংলা সীমান্তে একটা গ্রাম রানী বহাল। গ্রাম থেকে কিছুটা তফাতে মাঝিডাঙ্গা। পনেরো-ষোল ঘর সাঁওতাল বাস করে সেখানে। পাহাড়ঘেরা মাঝিডাঙা। প্রকৃতি এক অপূর্ব রূপ নিয়ে আছে। সবুজ গাছের সারি। কিছুটা ধানী জমি। রাইমণিদের সেখানে স্থান হয়নি। সেই ধানীজমিটা মাঝখানে রেখে একটা ছোট কুঁড়েঘরে পতিত হয়ে থাকতো রাইমণি ও তার বাপ-মা। তার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। রাইমণির মা ও বাবা মাঝিডাঙায় আসে তখন রাইমণির বয়স চার কি পাঁচ। তার আগে তারা থাকতো মহুল পাহাড়ী মিশনারি হাসপাতালের কাছে একটা গ্রামে। রাইমণির দিদিমা অর্থাৎ মায়ের মা কাজ করতো মিশনারি হাসপাতালে। সাদা চামড়ার বিদেশী এক ডাক্তারের নজরে পড়ে অবৈধ সম্পর্ক হয়। ফলশ্রুতিতে রাইমণির মায়ের জন্ম। মা ফুলিয়াও বড় হ'য়ে হাসপাতালে কাজ করে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডার যোগিয়া কিস্কুর সাথে ফুলিয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের বছর তিনেক পর রাইমণির জন্ম। তিনবছর বয়সে বাপ যোগিয়াকে হারায়। তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে ফুলিয়া অসহায় হয়ে পরে। যোগিয়ার এক দূর সম্পর্কের কাকা তাদের রাণী মহলের মাঝিডাঙ্গায় আনে। কিন্তু ফুলিয়া ও রাইমণির সাদা চামড়া ফর্সা সাহেবদের গায়ের রং। তারা আবার ধর্মে খ্রীশ্চিয়ানও। মাঝিডাঙার সাঁওতাল সমাজ তাদের মাঝে স্থান দিতে অস্বীকার করে। সালিশ করে ঠিক হয় তাদের আলাদা থাকতে হবে। তাদের কোন পরবে তারা আসতে পারবে না। রাইমণি—ফুলিয়া সাঁওতাল নয়। তারাও মেনে নিয়েছে এই পতিত জীবন। কিন্তু পেট তো মানে না। জীবিকার একটা প্রয়োজন আছে। ফুলিয়া রাণীশ্বরের এক মাড়োয়ারীর বাড়িতে কাজ করত। মাড়োয়ারীর ধানের আড়ত। রোদে ধান মেলতে দেওয়া, তা তোলা আর সংসারের কিছুটা ঝিয়ের কাজ করা। ছোটবেলায় রাইমণিকে সঙ্গে করে আনত।

নিজের খাবার দুজনে ভাগ করে খেতো। এইভাবে রাইমণি একদিন বড় হ'ল। বয়স যখন ষোল-সতেরো তখন সমবয়সী মেয়েরা যারা রানীশ্বরের কাছাকাছি মাঝি ডাঙায় থাকতো রাইমণির বন্ধু হল। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে সে চীনেমাটির খাদানে চাকরির সন্ধান পেল। তাদের সঙ্গে ট্রাকে চেপে সকলে আসত খাদানে, বিকেলে ফিরে যে তো। রাইমণি যে পরিবেশে মানুষ তাতে তার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। সাঁওতাল কেউ তাকে বিয়ে করবে না তাদের সমাজ বিয়ে হতে দেবে না। তাই জীবনটা নিজের ইচ্ছামতো চালাবার মানসিকতা থাকলেও সে তার চরিত্রকে কোন কালিমায় কলুষিত হতে দেয়নি। তার সঙ্গী সাথী সাঁওতাল মেয়েরা ধানকল বা খাদানের বাবুদের সঙ্গে অবোধ মেলামেশা করে বাড়তি আয় করার সুযোগ নিত। দৈহিক সম্পর্ক করে অনেক সাঁওতাল মেয়েকে শাড়ি-ব্লাউজ পয়সা নিতে রাইমণি দেখেছে। কিন্তু সে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়নি। কারো দিকে না তাকিয়ে একমনে কাজ করেছে। প্রলোভনকে শক্ত মন নিয়ে উপেক্ষা করে সংযত করেছে নিজেকে। খাদানের ম্যানেজার কাশী সাহা রাইমণিকে সুযোগ সুবিধা বাড়তি দেবার এবং কাছে টানবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হ'তে পারেনি। রাইমণির সঙ্গী-সাথীরা ভেবেছে এটা তার সুন্দরী হওয়ার অহঙ্কার। গায়ের রং ফর্সা তাই সে কাউকে পাত্তা দেয় না। কাশী সাহা বিফল হয়ে রাইমণিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। তাকে অন্য খাদানে কাজ নিতে হয়েছে। কোন খাদানেই দুমাস কি তিন মাসের বেশি থাকতে পারেনি। লোভাতুর চোখগুলো তাকে তাড়া করেছে।

এমনিভাবেই একদিন রাইমণি এসে পড়ে বীরভদ্র সিং-এর খাদানে। কয়েকদিন যেতে না যেতে সে নজরে পড়েছিল খাদানের খোদ মালিকের। প্রথম যেদিন বীরভদ্র দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি অনেকক্ষণ। রাইমণিও হঠাৎ বীরভদ্রকে দেখে তার এতদিনের অভ্যাসকে ভুলে গিয়েছে কয়েক মিনিটের জন্য।

বীরভদ্র আঠাশ-তিরিশ বছরের যুবক। অপরূপ রূপের অধিকারী। নায়কের মতো চেহারা। তার বাবা জানকীনন্দন সিং খাদানের ইজারাদার। এতকাল তিনি দেখেছেন এই খাদান। দুমকা থেকে এসে সপ্তাহ খানেক থেকে চলে যেতেন। তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়লে বীরভদ্রকেই আসতে হয় খাদানে। বড়লোক বাপের ছেলে। বি. এ. পাশ ক'রে বসেছিল বাড়িতেই। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা আর তারাই বীরভদ্রকে টেনে নামিয়েছিল কুপথে। তার টাকায় মদ মেয়ে নিয়ে ফূর্তি বন্ধুরা ভালই উপভোগ করত। বাবা জানকীনন্দন যদি অসুস্থ না হ'য়ে পড়তো হয়তো এরকমই চলতো। বীরভদ্রের এই জীবন যাত্রার কথা জানকী নন্দনের কানেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারছিলেন না। তাঁর অসুস্থতা যেন একটা সুযোগ এনে দিল। অন্তত জানকীনন্দন তাই ভাবলেন। বীরভদ্র খাদানে আসার আগে তাকে তার মা সাবধান করে বলেছিল—খাদানে এমন কিছু কাজ করবি না যাতে তোর বাবার অসম্মান হয়। বীরভদ্র নিজের স্বভাব পরিবর্তন না করলেও মায়ের কথাটা ভুলতে পারেনি।

প্রথম দিন খাদানে আসার পর থেকে বীরভদ্র নিজেকে সকলের চোখে এক সৎ ধার্মিক ও শিক্ষিত প্রকাশ করতে কোন ত্রুটি রাখেনি। অফিস সংলগ্ন একটা ঘরে থাকা-শোয়া। ছোট্ট বারান্দায় ঠাকুরপুজোর ব্যবস্থা। সকলে দেখতে পেতো বীরভদ্র ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফুল তোলে। স্নান সেরে প্রায় এক দেড় ঘণ্টা পুজো তারপর ফলমিষ্টি দুধ খেয়ে কাজে বেরুত। দুপুরে নিরামিষ রান্না করত বামুন ঠাকুর। দুমকা থেকে এসেছিল সে। নিরামিষ রান্না খাওয়া দুপুরে। বিকেলে দুমকা যাবার নাম করে জিপ চালিয়ে বেরিয়ে যেতো। ফিরত রাত্রি এগারোটা বারোটায়। তখন খাদানের সবাই ঘুমিয়ে। দুমকায় বাবাকে খাদানের সব কিছু জানাতে বা সমস্যা

সমাধানের জন্য তাঁকে নাকি যেতে হয়। খাদানে সারাদিনের জীবনে কেউ চরিত্রভ্রষ্ট হতে দেখেনি তাকে। বিকেলের পরের জীবন কেউ দেখতে পেতো না। একমাত্র মাতলা টুডু ছাড়া। মাতলা ছিল বীরভদ্রের খাস লোক। মাতলা জানতো বীরভদ্র কোনদিনই দুমকা যায় না। মাতলাকে সাথে নিয়ে যায় বিলকান্দি বা আশেপাশের সাঁওতাল পল্লীতে। মাতলা সাঁওতাল মেয়ে জোগাড় করত নিত্যনূতন। মুরগী কিনতো। তারপর চলে যেতো ম্যাসানজোরে। যে সব সাঁওতাল মেয়েরা বাইরে খাদানে বা ধানকলে যেত তাদের পেতে কোন কষ্ট ছিল না। আগের যুগে যা কল্পনা করা যেত না তা সম্ভব হয়েছিল ষাটের দশক থেকে। মাতলাকে কাজে লাগিয়ে এবং তাকে টাকা আশাতীত দিয়ে বীরভদ্রের জীবনটা ঠিকই নিজের ইচ্ছা মতো চালাত। বাবা জানকী নন্দন ও মা খবর পেতেন ছেলের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। দুমকার কুসঙ্গ থেকে ছেলেকে সরিয়ে খুব উপকার হয়েছে। ছেলেকে কাজে মন বসাতে পেরে বাবা আত্মতৃপ্তিতে অবসর নিয়েছেন। এইভাবে দু আড়াই বছর কাটার পর দুমকায় খবর গেছে—বীরভদ্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এক সাঁওতাল মেয়েকে খুন করার অভিযোগে।

বীরভদ্র আমাকে বলেছিল—প্রথম দৃষ্টির পর রাইমণির প্রতি আকর্ষণটা যে কখন আমার মধ্যে প্রেম জাগিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। তাকে দেখার আগে যে জীবন কাটিয়েছি সে জীবনকে নিজেই ঘৃণা করতে শুরু করেছি। তাকে ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারতাম না। রাইমণির দেহটা মনে হত কিছুই নয়। তার মনটাই সব। তার জীবন নিয়ে খেলা করার ইচ্ছাই আসতো না মনে। আমার সমাজ, আমার বাবা মা কোন বাধা দিলেও আমি রাইমণিকে বিয়ে করব। ঘর বাঁধব দুজনে। বিয়ের আগে তার দেহকে স্পর্শ করতেও মন হ'ত না। আমার মতো বাঁধন ছাড়া পুরুষ যে এমন বন্ধনে বাঁধা পড়বে ভাবতেই পারি নি। তাকে শুধু চোখের দেখা দেখব বলে মাঝিডাঙা চলে যেতাম। কোন কথা না বলে তার সামনে বসে থাকতাম। কয়েক মাসের মধ্যে ফুলিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম—রাইমণিকে আমি শহরে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। আমার বিয়ে করার প্রস্তাবটা মাঝিডাঙার সব সাঁওতালরা জানলো। তাদের আপত্তি আছে এই বিয়েতে। একদিন তারা মজলিস ডাকলো মানঝি থানে। আমাকেও যেতে হ'ল। তাদের প্রস্তাব তাদের দেবতা মারাং বুড়ুর নামে ত্রিশ বিঘে জমি কিনে দিতে হবে। তা নাহলে এই বিয়ে হবে না। ভাবতে অবাক লাগে যে সাঁওতালরা রাইমণিদের এক ঘরে করে রেখেছিল এতকাল তারাই অভিভাবক হল। আমি রাজি হলাম। ওদের সর্দার মানঝি হাবাজের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দিলামও কয়েকদিন পর। খাদানে ফিরলাম কত আশা ও আনন্দ নিয়ে। দুশ্চিন্তামুক্ত মন নিয়ে ঘুমালাম রাত্রিরে। পরদিন দুপুরে পুলিশ এলো খাদানে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম পুলিশের কথা শুনে। মাঝিডাঙার সর্দার মানঝি হারাম আমার নামে অভিযোগ করেছে রাইমণিকে হত্যা করার। সে বলেছে আমি নাকি তাকে নষ্ট করেছি, সাঁওতালরা জোর করেছে তাকে বিয়ে করতে হবে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সামনে রাজি হয়েছি। তারপর রাইমণিকে হত্যা করে তার দেহটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছি।

যেদিন দ্বিতীয় সালিশ হয় এবং বীরভদ্র ত্রিশ হাজার টাকা দেয় তার পরের ভোরে সাঁওতাল ছোট ছেলেরা দেখতে পায় গ্রাম থেকে সামান্য দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে একটা গাছে রাইমণির দেহটা ঝুলছে। ছেলেরা খবর দেয় মাঝিডাঙায়। সর্দার বা মানঝি হারাম যেন অপেক্ষাই করছিল এই সংবাদের। থানায় খবর দিতে দেরি হয় না। নানা অভিযোগে ভরা বীরভদ্রের বিরুদ্ধে। পুলিশ আসে। মৃতদেহ নামায়। ময়নাতদন্তে পাঠান হয়। ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ পায় রাইমণিকে গলা টিপে মারা হয়েছে এবং তার আগে একাধিক মানুষ তার ওপর বলাৎকার

করেছে। মৃত্যুর পর তাকে গাছের ডালে টাঙানো হয়েছে। বীরভদ্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তে প্রধান বাধা সাঁওতাল পল্লীর মানুষেরা। তারা বীরভদ্রের বিরুদ্ধে নানা কথা বললেও কোন সাঁওতালের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না। কয়েকজন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পুলিশ সক্ষম হলেও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেউ স্বীকারোক্তি করেনি। আমাদের আইন তাদের সজাগ করে দিয়েছে। সাধারণত পুলিশ তাদের ওপর বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর জন্য আইনে অভিযুক্তকে সতর্ক করার বিধান আছে। পুলিশের ভয়ে যদি কেউ সত্যকে স্বীকারও করে আইনের সাবধান বাণী তাদেরকে সেই সত্য গোপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। দোষী হয়েও অনুশোচনার কারণে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করলেও আইন ধরে নেয় সেটা নির্যাতন ও নিপীড়ন হয়েছে। থানা থেকে আদালত, আদালত থেকে জেল এবং জেল থেকে আবার আদালত অনেকটা পথ। অনেকের সাথে দেখা হয় গোপনে তারা সাবধান করে। তার স্বীকারোক্তিতেই সাজা হতে পারে। অন্য প্রমাণের তখন প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া অনুশোচনায় স্বীকারোক্তি করার মানুষ প্রায় অবলুপ্ত।

জঙ্গল হাঁসদা এবং মিটিং কিস্কু পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছিল তা অতি মর্মান্তিক। সে সাঁওতাল সমাজকে আমরা আগে দেখেছি আর তখন যাদের দেখলাম আকাশ পাতাল তফাৎ। আমাদের সভ্যসমাজে যে সব ক্লীব আছে তাদের সমাজও ক্লীবতায় ও পশুত্বে পেছিয়ে নেই। জঙ্গল ও মিটিং যে কথা প্রকাশ করে তা একই। "সেদিন রাতে যখন দেখলাম বীরভদ্র যে কোন মূল্যে রাইমণিকে বিয়ে করবে তখন আমরা সামনে তো মেনে নিলেও রাইমণির ওপর রাগ বেড়ে গিয়েছিল। সতীপনা দেখিয়েছে এতকাল আর ভাল বেসেছে এক বিহারীকে। এটা আদৌ ভালবাসা নয়। ধনী এক সুপুরুষকে সে বিয়ে করে সুখী হ'তে চায়। আমাদের কারোকে মানুষ বলে মনে করে নি। বীরভদ্রও তার দুদিন পর যখন এতগুলো টাকা দিল তখন আমরা স্থির করলাম রাইমণিকে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। রাত তখন বারোটা। আমরা ছ'জন গেলাম রাইমণির কুঁড়েতে। আমাদের যাতে চিনতে না পারে তার জন্য মুখটা গামছা দিয়ে ঢাকলাম। দরজায় আওয়াজ দিতেই ফুলিয়া দরজা খুলল। তাকে দুজন ধরে নিয়ে কাছেই একটা গাছে বাঁধল। আওয়াজ যাতে করতে না পারে তার মুখটাও বেঁধে দেওয়া হ'ল। আমরা চারজন ঘরে ঢুকে রাইমণিকে জোর করে বলাৎকার করলাম একজনের পর একজন। অন্য দুজনও আমাদের পর তার ওপর বলাৎকার করল। রাইমণির মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। ছয়'জনের এই বলাৎকারের পর রাইমণি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভাবলাম যে যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমাদের বিপদ। তার গলায় আঙুল দিয়ে জোর চাপ দিতেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল দেহ থেকে। আমরা সকলে রাতের অন্ধকারে তার দেহটা নিয়ে গেলাম ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। গাছের একটা শক্ত ডালে তার গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। গ্রামে ফিরে ফুলিয়াকে ভয় দেখালাম। বললাম আমরা বীরভদ্রের খাদানের লোক। তোমার ওপর কোন রাগ নেই তাই তোমাকে প্রাণে মারলাম না। আমাদের দলে সর্দারের ছেলে বুধন ছিল। সর্দারকে সব জানালাম। সর্দার বললো তোরা এখন সরে থাক। কয়েক দিন পর গ্রামে ফিরলাম। কি জানি কেন মনে একটা আপসোস এল। ভাবলাম সত্যি এটা অন্যায় হল। নিজে থেকেই আমি ধরা দিলাম। মিটিং তার জবানবন্দিতে কোন অনুশোচনা বা নিজের থেকে ধরা দেবার কথা বলেনি।

কারো সাজা হয়নি সে মোকর্দমায় কারণ প্রমাণ আসেনি আইনে যা সব থেকে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বীরভদ্র যে নির্দোষ এবং কিছু মানুষের পশুর লালসার সে স্বীকার তার প্রমাণিত হয়েছিল পারিপার্শ্বিক ঘটনায়। সে যে ঘটনার রাত্তিরে খাদানে ছিল তার প্রমাণ পেয়েছিল পুলিশ। খাদান

থেকে মাঝিডাঙার দূরত্ব পঁচিশ মাইল। বীরভদ্র খাদানে ফিরেছিল রাত্রি আটটা নাগাদ মাঝিডাঙা থেকে। সর্দারের নিজের জবানীতেই প্রকাশ পায় সন্ধ্যা ছয়টা সাড়ে ছয়টায় বীরভদ্র মাঝিডাঙা থেকে চলে গিয়েছিল। তাছাড়া একাধিক লোকদ্বারা বলাৎকারের চিহ্ন যা ডাক্তার রাইমণির দেহে দেখেছিলেন এবং সেই বলাৎকার ও হত্যার সময় রাত্রি বারোটা থেকে একটা। এটাই প্রমাণ করে যে বীরভদ্র নির্দোষ। তবুও কারাবাস তাকে করতে হয়েছে তিনমাস। বীরভদ্র বলেছিল যখন পাপ করেছি, ঘৃণ্য কাজ করেছি, মদ খেয়ে একের পর এক সাঁওতাল যুবতীকে নিয়ে ফুর্তি করেছি তখন কোন অশান্তি তো ছিলই না। বরং আনন্দে কাটিয়েছি সারা রাত ও দিন। কিন্তু যখন সত্যি ভালবেসেছি রাইমণিকে অন্তর থেকে উদাস হয়েছি তার জন্য। সব কিছু বাধা অতিক্রম করে বিয়ে করতে চেয়ে উদ্বেগে কাটিয়েছি বিয়ে হবে আশা যখন এক রাত্রির জন্য হলেও আনন্দ দিয়েছে, তখন এই তিন মাসের কারাবাস আমার কাছে দুঃসহ হ'য়েছে। প্রাণাধিক প্রিয় রাইমণিকে পশুর দল, কি কষ্টই দিয়েছে ভাবলে গা শিউরে উঠত। এক নিষ্পাপ মেয়েকে ভালবেসে তার যে জীবনহানি হ'ল এই ভেবেই জেলখানার মধ্যে ঘুমুতে পারিনি কত রাত্রি। মনে হ'ত রাইমণির বদলে যদি ওরা আমাকে খুন করত তাহলে এই অসহ্য দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হ'ত না। বলতে বলতে বীরভদ্র কান্নায় ভেঙে পড়েছে। প্রথম যেদিন সে গ্রেপ্তার হল তখন ওর চেহারা দেখেছি রাজপুত্রের মত। তিনমাসে কি চেহারা হয়েছে। কোন জৌলুস নেই। এক যুবক তিন মাসে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে।

বীরভদ্র ও রাইমণি আমার জীবনে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাদের প্রেমের সূত্র থেকে রাইমণির জন্মের ইতিহাস, তার সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের বিচিত্র ধ্যান-ধারণা, পাশবিক চিন্তাধারা এসবই অজানা থেকে যেতো আমার কাছে যদি না বীরভদ্র আসতো আমার জীবনে। রাইমণির রক্তে ছিল বিদেশী রক্তের মিশ্রণ। তাই সে সাঁওতাল নয় সমাজ তাকে পতিত করে রাখবে, সমাজে তার বিয়ে হবে না, কোন পার্বণে তার প্রবেশাধিকার থাকবে না। কিন্তু সে যদি সমাজের বাইরের কোন মানুষের প্রেম-ভালবাসা পায় তা সে গ্রহণ করতে পারবে না। তার দিদিমার একটা ভুলে তাকে নিপীড়িত হ'তে হল কোন অন্যায় না করে। বীরভদ্রের মতো পথভ্রষ্ট এক যুবককে স্বর্গীয় প্রেমের উপলব্ধি দিল সে, নতুন জীবনের আস্বাদ দিল। তার বদলে সে কি পেল?

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট

আজকের অনেক মানুষ দেখেনি বা জানেও না। ইংরেজ যুগে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে বহু ফৌজদারী মামলার বিচার হ'ত। এস. ডি. ও, ডেপুটি ও সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের ফার্স্টক্লাশ, সেকেন্ড ক্লাশ ও থার্ড ক্লাশ পাওয়ার বা ক্ষমতা থাকত। তাঁরা ছিলেন বেতনভোগী শাসকশ্রেণী। তার সঙ্গে বিচারকের কাজ। আর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা শুধু বিচার করতেন বিনা পারিশ্রমিকে। সম্মানজনক পদ। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জমিদার যাঁরা ইংরেজের প্রিয় পাত্র তাঁরাই হতেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিচারের সময় ছিল বেলা দুটো থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত। যেহেতু তাঁরা ধনী পরিবারের কর্তা। বেলা বারটায় দিনের খাবার খেতেন। পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোজন শেষে একটু

দিবানিদ্রা। তারপর ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কাঁধে চাদর ও মাথায় ছাতা নিয়ে রাজসিক পদক্ষেপে কোর্টে আসতেন এবং আর্দালি যথাযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাতাটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে চেম্বারে নিয়ে যেতো। তারপর তিনি এজলাসে ওঠার আগে পেয়াদা হাঁক দিত পক্ষদের নাম ধরে। উকিল মোক্তাররা এসে চেয়ারে বসত। এজলাসে বসেই তিনি সকলের কুশল সংবাদ নিতেন। এতেই প্রায় এক ঘণ্টা চলে যেত। কুশল সংবাদ নেওয়া মানে নানা গল্প করা। হাসি ঠাট্টা করা। এরপর বাদী কাঠগড়ায় উঠতো। ম্যাজিস্ট্রেট আর্দালিকে বলতেন—'ভাল করে শপথটা পড়িয়ে দাও।' শপথ নেওয়া হ'লে বাদীকে শপথের অর্থ, ভঙ্গের কি শাস্তি, সত্যভাষণে ঈশ্বরের তৃপ্তি এবং স্বর্গলাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। তারপর তিনি বাদীর উকিল বা মোক্তারকে বলতেন—আপনার মক্কেলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন, একটা মিথ্যার জন্য প্রাণদণ্ডও হতে পারে। এসব করতেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হ'য়ে যেতো। তারপর বাদীর এজাহার নেওয়া শুরু। মাঝে মাঝে রসিকতা। এভাবেই সাড়ে চারটে বেজে যায়। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এজলাস ছেড়ে ওঠেন। পরের দিন বাকি সাক্ষ্য গ্রহণ হবে। খুব কম মানুষের ধৈর্য থাকে মামলা শেষ পর্যন্ত চালাবার। খুব যাদের জেদ তারা চালিয়ে যায় মামলা। একপক্ষে উকিল মোক্তার মিলে পাঁচ কি ছয় জন। সেটা নির্ভর করে বাদী ও আসামী দু'পক্ষের জেদের ওপরে। জমিদার ও ধনীর মেজাজ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বিচার চালিয়ে যান। যদি মনে হয় ঘটনাস্থল দেখার প্রয়োজন তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হয় দুপক্ষকে। সেই প্রয়োজনটা মামলার জন্য যতটা তার থেকেও যদি মন্দির থাকে কাছাকাছি সেখানে পূজা দেওয়ার। সকালে মোটরে দুপক্ষের উকিল মোক্তার নিয়ে ঘটনাস্থলের কাছে মন্দিরে যাওয়া। পূজা দেওয়া এবং প্রসাদ গ্রহণ আবশ্যিক। ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে কারো দেওয়া খাবার খাওয়া আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু বাদী আসামীরা দেবদেবীর অন্নভোগের ব্যবস্থা করে তাহলে সে প্রসাদ খেতে কোন বাধা থাকে না। সকলেই সে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রসাদ খেলে ভোগের আয়োজন সেই রকম হতে হবে। একে নিরামিষ। শুধু তো একটা তরকারি আর ডাল ভোগে দেওয়া যায় না। নানা রকমের ভাজা, দু-তিন রকমের তরকারি। পায়েস ও মিষ্টি দেবতার ভোগে দিতে হয়। এ ভোগ যে দেবতাকে নয়, ম্যাজিস্ট্রেটে সাহেবকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরমতৃপ্তি নিয়ে প্রসাদ খাবার পর বিশ্রামের ব্যবস্থা। সেটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট করেন। তাঁর নামটা যাতে জুরি হিসেবে থাকে তার জন্য প্রেসিডেন্টের একটা স্বার্থ থাকে। দারুণ রৌদ্রতাপে তো ঘটনাস্থল সরজমিন তদন্ত সম্ভব হয় না। সূর্যতাপ কমলে ম্যাজিস্ট্রেট বলেন—'যাবার পথে যে গাছটা, সেটা আম, জাম, বা তেঁতুল হ'তে পারে, দেখতে হয়। গাড়ি দাঁড় করানো হয় তেমনি একটা গাছের কাছে। সকলে গাছটাকে পাঁচ মিনিট ধরে দেখেন। ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ গম্ভীর হ'য়ে যায়। তিনি যেন মামলাটা বুঝে ফেলেছেন। তারপর শহরে প্রত্যাবর্তন। রবিবার বা ছুটির দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন। তাও প্রায় এক সপ্তাহ কি দু'সপ্তাহ অন্তর। কোন্ ঘটনাস্থল দেখবেন ম্যাজিস্ট্রেট তা নির্ভর করে এক এক পক্ষের কতজন উকিল মোক্তার নিয়োগ হয়েছে তার ওপর।

আর এক ধরনের মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিল বা মোক্তারকে যেতে হত থানায়। সাধারণত আসামী গরিব। কিন্তু চুরি চোরাই মাল সামলানো ইত্যাদি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কোর্টে মামলা দেবার কোন ঘটনা নেই। কিন্তু মানুষটার চোরও দুর্ধর্ষ বলে গ্রামে নাম আছে। পুলিশের সাক্ষী। একটাই কথা "ও খুব দুর্ধর্ষ ও গুণ্ডা প্রকৃতির। চুরি-চামারি পেশা"। বিশ তিরিশ সাক্ষী বলে আর তাদের জেরাও এক। "তুমি নিজে কিছু দেখনি?" উত্তর একই। 'না'। এসব মামলা করা হ'ত একটাই কারণে। যতদিন মামলা চলবে সে অপরাধ করবে না। অনারারি

ম্যাজিস্ট্রেটরা যেতেন না সে মামলা করতে। এস. ডি. ও একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট। থানায় যে কোর্ট বসত আমিও গেছি অনেকবার। বড়বাবু খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আমার প্রথম পেশার জীবনে দারোগাদের সঙ্গে আলাপ দরকার ছিল। তাঁদের সাহায্য পেয়েছি অনেক। সার্থকতার পথে সেগুলো ছিল সিঁড়ির মত। মামলা হাতে এলে তবেই তো প্রশিক্ষণ। তা না হ'লে অন্যের হারমোনিয়াম বাজানো দেখার কোন মূল্য নেই। নিজেকেই তো বাজিয়ে বাজানো শিখতে হয়।

প্রথম জীবনে বার লাইব্রেরিতে প্রায় একটা মামলার আলোচনা হত। সে মামলায় উকিল মোক্তারদের যা অর্থাগম হয়েছিল, কোন খুনের মোকর্দমায় তা হয়নি। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সে মামলায় বিচারক ছিলেন। একজন নালিশ করেছে দশজনের নামে। অভিযোগ তার পুকুর থেকে মাছ এবং বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ জোর করে চুরি করেছে। বাদীর পক্ষে শিবনারায়ণবাবু, গোবর্ধনবাবু, অনিলবাবু ও সুনির্মলবাবু উকিল আর মোক্তার আছেন বিকাশবাবু, নকুলবাবু, জিল্লার রহমান ও প্রকাশবাবু। প্রত্যেকের নিজস্ব মুহুরী আছে। দৈনন্দিন উকিল মোক্তারের ফি এর সঙ্গে মুহুরীর তহুরী আছে। আসামীদের পক্ষেও সাতজন উকিল পাঁচ জন মোক্তার আর বার জন মুহুরী আছে। প্রতিদিন একটা করে সাক্ষীর এজাহার নেওয়া এবং তারপর দিন তার জেরা। প্রায় কুড়ি দিন সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব। ম্যাজিস্ট্রেট বুঝে নিয়েছেন দুই পক্ষই সরেস এবং জেদী। উকিল মোক্তার নিয়োগে রীতিমত প্রতিযোগিতা। সাক্ষ্যশেষে দুই পক্ষের সওয়াল চলল পাঁচ-ছয় দিন। সব বক্তৃতা শেষ হলে সত্যপ্রসন্নবাবু বললেন—বাদী এবং আসামী দুপক্ষই শোন। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বক্তৃতা শুনে আমি এখনোও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। এই মামলায় বাদী বা আসামী যে কোন পক্ষের সাজা হতে পারে। সরজমিনে পুকুর এবং বাঁশঝাড় আমি দেখে এসেছি। তার স্বত্ব দখল বিচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটাও মনে রাখবেন। আমি আগামী যে দিন দিচ্ছি রায় দেবার তার আগেই আপনারা একটা মীমাংসায় অসুন। উকিলবাবুও মোক্তার বাবুগণ আপনারা নিজ নিজ মক্কেলকে সদুপদেশ দিন। তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে নেয়। আবার বলছি যে কোন পক্ষের শাস্তি হ'তে পারে।' এই বলে সত্যপ্রসন্নবাবু এজলাস ত্যাগ করলেন।

রায়ের দিন সত্যপ্রসন্নবাবু মুখ গম্ভীর ক'রে এজলাসে বসলেন। সময় পার হচ্ছে মিনিটের পর মিনিট সকলের দুশ্চিন্তা নিয়ে। এক সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন উকিলবাবুদের—কোন মীমাংসায় পৌঁছেছেন? দুপক্ষের উকিলবাবু জানালেন অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেছে। আর কয়েকটা দিন সময় লাগবে। সত্যপ্রসন্নবাবুকে উকিল মোক্তারবাবুরা ভালই জানেন। তিন পাতা মামলার রায় লেখার ধৈর্য তাঁর নেই। রায়ের জন্য একটা নয় পাঁচটা দিন হবে। তিনি দুই পক্ষকে বললেন—আমি আবার বলছি। যদিও চুরি করা মাছের দাম পাঁচ টাকা এবং বাঁশের পনের টাকা। সেটা বিচারের দিক থেকে বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে চুরি করা গুরুতর অপরাধ। মিথ্যা অভিযোগ আনা আরো গুরুতর। যে কোন পক্ষকে তিন বছর পর্যন্ত কারাবাসের আদেশ দেবার ক্ষমতা আমার আছে। এটা মনে রেখে কাজ করবেন। দু'পক্ষই হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রায়ের জন্য অন্য একদিন ধার্য করলেন সত্যপ্রসন্নবাবু। এরপরও আরো দুটো দিন পড়েছে রায় দেবার। একই কথার পুনরাবৃত্তি।

অবশেষে দুই পক্ষ মীমাংসা করে লিখিত আবেদন দাখিল করল। সত্যপ্রসন্নবাবুর এখন অন্যরূপ। গম্ভীর হয়ে বললেন চুরির মামলা মীমাংসা করতে হ'লে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগে। আমার অনুমতি সাধারণত দেবার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু আপনাদের খাতিরে আমি অনুমতি দিচ্ছি। যান, আসামীরা খালাস।

দুপক্ষ তাদের সঞ্চিত অর্থ উকিল মোক্তার, মুহুরী, পেশকার পকেটস্থ করেছেন এই উপলব্ধির আর কোনদিন আদালতে পা রেখেছে মনে হয় না। জেদ এবং প্রতিহিংসার খরচ তাদেরকে হয়ত সাবালক করেছে। খ্যাতিমান উকিল আনন্দগোপাল মিত্র একটা গল্প করতেন। দুপক্ষের মধ্যে একটা জমিজমা সংক্রান্ত মামলা মুন্সেফ কোর্ট থেকে জজ কোর্ট ও হাইকোর্ট হয়ে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে যায়। সেখানে ইংরেজ ব্যারিস্টাররা ছাড়াও এদেশ থেকে নামি ব্যারিস্টারও যান দুপক্ষের জন্য। তিন চারদিন শুনানি হওয়ার পর সাহেব বিচারক প্রশ্ন করেন "how much property is involved in this case? অর্থাৎ কত সম্পত্তি নিয়ে এই মামলা। উত্তরে দুপক্ষের ব্যারিস্টার জানান—My Lords two fools are fighting our six inches of land। দুই মূর্খ ছয় ইঞ্চি জায়গা নিয়ে লড়াই করছে। প্রিভি কাউন্সিল সে মামলা পাঠান মুন্সেফ কোর্টে পুনর্বিচারের জন্য। দুপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তৃপ্তি হয়ত পেয়েছিল। মূর্খ বিশেষণটা পেতে দুর্ভোগ ও খরচান্ত হওয়ার যে তৃপ্তি। দুপক্ষ মুন্সেফ কোর্টে মামলা মীমাংসা করে নিয়ে মূর্খ দুর্নাম থেকে মুক্ত হয়েছিল। আজ আমরা ভাবতেই পারি না কত সামান্য ঘটনার জন্য তখনকার কালে মামলা হত। কত বিচিত্র সব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদের আচার-আচরণ। একজন এই রকম এক ম্যাজিস্ট্রেট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়েছিলেন। এক বৃদ্ধকে পনের দিনের জেল আদেশ দিয়ে বললেন—"জেলে তোমার কোন রকম যাতে অসুবিধা না হয় তা লিখে দিয়েছি। আর সঙ্গে এই ঔষধ দিলাম। পুরিয়াতে সব লেখা আছে। অম্বল হ'লে কোনটা খাবে, আমাশয় হ'লে কোনটা। তারপর আর্দালিকে বললেন—এ বৃদ্ধকে যত্ন করে নিয়ে যাবে জেলে। এর যেন কোন অসুবিধা না হয়।" মোক্তারবাবু বৃদ্ধকে বললেন, 'আপিল করলে নিশ্চয় খালাস পাবে।' বৃদ্ধ বলল—অনারারি হাকিম তো সম্মানীয় লোক। মানীর মান রাখতে আমি জেল খাটব। আপনি প্রতি কথায় ইওর অনার যাকে বলেছেন তাঁরই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে বলছেন? এটা অন্যায়। মোক্তারবাবু হতবাক।

সেই সব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের উকিল মোক্তারবাবুরা একটু যেন বেশি খ্যাতির করতেন। কারণ তাঁদের তো বদলি নেই। স্থানীয় হওয়ার কারণে খুব পরিচিতও। তাঁরা সাধারণত তোষামুদি পছন্দ করতেন। সকলকেই একটা মুখের ভাব আনতে হোত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট যখন ইংরেজ সরকার করেছে তখন জ্ঞানে বুদ্ধিতে তিনি সকলের থেকে বড়। তোষামুদি বুঝতে পারতেন তাঁরা। কিন্তু একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন। পছন্দও করতেন। না করলে পক্ষপাত করাটাও অসম্ভব ছিল না। রায় লেখা কঠিন ছিল। কোন উকিল বা মোক্তার রায় লিখে দিতেন যাঁরা সে মামলায় নিযুক্ত নন। ম্যাজিস্ট্রেট শুধু বলে দিতেন সাজা হবে না খালাস হবে। এ নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ তুলতো না সেকালে। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজদের এক সৃষ্টি বিচারে ব্যয় সংকোচন যতটা করা যায়। সেই ব্যয় সংকোচনের আদর্শ ইংরেজ শাসকের থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার পরও তা যখন শাসকশ্রেণী করেন তখন দুঃখ হয়। এতকাল কি দিয়ে এসেছেন শাসকশ্রেণী আর কি দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন সুবিচারক পেতে গেলে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন আছে। শুধু সম্মান দিয়ে মানুষের পেট ভরে না। সেটা সম্ভব ছিল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটদের যুগে।

চৌকিদার

আমার ছেলেবেলার দেখা যুবক ভূপতি চৌকিদারকে আবার দেখলাম প্রায় তিরিশ বছর পর। আমার যখন বয়স বারো তখন প্রথম দেখি গ্রামের বাড়িতে। দু-তিন বছর দেখেছি। তাও পুজোর সময় গ্রামে দশ-বারো দিন যখন থেকেছি। ইংরেজ রাজত্বের শেষ কয়েক বছর। তারপর আর গ্রামে যায়নি লেখাপড়া শহরে করার জন্য। ভূপতি চৌকিদারকে ভুলেই গিয়েছিলাম। হয়ত কোনদিনই মনে পড়ত না যদি না আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষী দিতে দেখতাম। না দেখাই ছিল ভাল। তার করুণ কাহিনী শুনতে হ'ত না। সেই ভূপতি চৌকিদারকে নিয়েই এই গল্প। গল্প হলেও সত্যি।

আজকের মানুষ চৌকিদার কি জিনিস জানে না। তাদের কি ক্ষমতা ছিল গ্রামে তা আদৌ জানে না। চৌকিদার শব্দটাও আজকের মানুষ অনেকে হয়ত শোনেনি। সে যুগের গল্প উপন্যাসের পাতায় হয়ত পড়েছেন কিছু পাঠক। সেখানে চৌকিদার অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে একটা চরিত্র মাত্র। তাও কাহিনীর প্রয়োজনে। কিন্তু আমার দেখা চৌকিদার গল্পের একটা প্রধান চরিত্র এক কালের পল্লীসমাজে। সে চৌকিদার আমার শৈশবের স্মৃতি এবং আইন পেশায় আসার প্রথম কয়েক বছর। তারপর চৌকিদারের পদও অবলুপ্ত। শৈশবে দেখা চৌকিদার এক জীবন্ত চরিত্র। আইন পেশায় এসে দেখি তারা ক্ষমতাহীন অবসর প্রাপ্ত। শুধু পুরনো মোকর্দমার সাক্ষ্য দিতেই তাদের অস্তিত্ব। এর বেশি কিছু নয়।

ক্ষীণ স্মৃতিতে শৈশবের সেই দিনগুলো ভেসে আসে। গ্রামে তখন ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। এখন যা হয়েছে অঞ্চল পঞ্চায়েত। সাধারণত জমিদার হতেন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে হত বোর্ড। চৌকিদার ও দফাদার দুই শ্রেণীর পদ ছিল। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল প্রধান। অন্যান্য কাজও ছিল। দফাদার আদায় করত বোর্ডের ট্যাকস ও সেস। ইংরেজ শাসনে ইউনিয়ন বোর্ড শাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন। প্রেসিডেন্ট সম্মানীয় পদ—বেতন দিতে হ'ত না ইংরেজ সরকারকে। চৌকিদার দফাদারের বেতন হত বোর্ডের নিজস্ব আদায় থেকে। আর কতই বা বেতন। চৌকিদারী চাকরান নামে জমি বন্দোবস্ত থাকত। ভরণ-পোষণের দিন থেকে তা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চৌকিদারের আসল দাপট ছিল থানার বড়বাবুর দেওয়া ক্ষমতায়। গ্রামের সহজ সরল মানুষের কাছে চৌকিদারই ছিল যেন পুলিশ সাহেব। থানার পুলিশ অগম্য পথে গ্রামে সচরাচর যেত না। চৌকিদারই সে কাজ করে দিত। প্রতিদিন তাকে থানায় রিপোর্ট দিয়ে আসতে হত দাগী আসামীদের রাত্রির গতিবিধির। চৌকিদার যদি কোন লোককে বলত বড়বাবু থানায় ডেকেছে তাহলে তার আহার-নিদ্রা ছুটে যেত। চৌকিদারকে সবাই সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত তরীবাড়ির লাউ কুমড়ো বা পুকুরের মাছ দিয়ে। সেটা ভয়ে। কখন কি জানিয়ে দেবে থানায় আর টানা হ্যাঁচড়া শুরু হবে। পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। আমিও ভয় করতাম সবাই ভয় করত বলে। কারণ শহরে থেকে পুলিশ দেখে অভ্যস্ত এবং নামী মোক্তারের ছেলে হিসেবে কোর্ট থানা আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। কত দারোগাকে বাবার কাছে আসতে দেখেছি। তবুও ছেলেবেলায় মনে হত চৌকিদার ভয়েরই যোগ্য। গায়ে খাকি রংএর কোট। আর কোমরে থাকতো পেতলের চাকতি দেওয়া বেল্ট। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। মাথায় পাগড়ি। পেতলের চাকতিতে এলাকার নম্বর লেখা থাকত। হাতে লাঠি ও লণ্ঠন। বড় বড় ডাকাতরা ভয় পেত। সারারাত ধরে টহল দিত হাঁক দিয়ে—'সাবধান'। তার হুঙ্কারে ঘুম ভেঙে যেতো। ভয়ে মায়ের গা সিঁটিয়ে থাকতাম। দুই বোনও কুঁকড়ে থাকতো। মা জড়িয়ে থাকবার চেষ্টা

করত। বাবা দুচারদিন গ্রামে থাকলে অতটা ভয় থাকতো না। এমনি এক চৌকিদার ভূপতি বাগ্‌দি। বাবার কাছে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াত প্রণাম করে। দারোগা ও বাবা এক শহরে থাকে। ভূপতি সমীহ করতো পাছে বাবা দারোগাকে কিছু বলে দেয় তার বিরুদ্ধে। বাবা ভূপতিকে বলত—'আমি এখানে না থাকলে লক্ষ্য রাখবি। কোন বিপদ আপদ না হয়।' বাবার সঙ্গে বোর্ড প্রেসিডেন্টেরও খাতির ছিল। বাবা জমিদারের বাঁধা মোক্তার। জমিদারের পক্ষে বছরে একশ দেড়শ মামলা করত প্রজাদের বিরুদ্ধে। ভূপতি চৌকিদার নিজে য়া পেত ফল সবজি মাছ তার থেকে মাকে কিছু দিয়ে যেত। এমনি আসা যাওয়ার ফলে তার প্রতি ভয় আমার কেটে যায়। এক সময়ে সে আমার ভূপতিদা হয়ে গিয়েছিল। ভূপতিদা বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। কত গল্প শোনাত তার নিজের বীরত্বের। বলতো 'আমি ছাড়া বড় দারোগা খোঁড়া'। ডাকাত অমূল্য হাড়ি, বদরোদোজা, কালু ডোম, নঈম খাঁর মতো দুর্ধর্ষ ডাকাতদের কীভাবে ধরে থানায় হাজির করেছিল, কত টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। পুলিশ সাহেব তকে বাহবা দিয়েছিল এই সব গল্প বলত। ওর তখন বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, আমার থেকে তের-চৌদ্দ বছর বড়। কিন্তু শরীর ছিল দৈত্যের মতো। ছ'ফুটেরও বেশি উচ্চতায়। তেমনি শরীরের গঠন। বুকের ছাতিই ছিল মনে হ'ত পঞ্চাশ ইঞ্চি। তার চলাফেরার মধ্যেও ছিল এক বৈশিষ্ট্য। ভয় পাবার মতো চেহারা। ভূপতিদা বলত 'হরি মিছির, অবিনাশ মিত্তিরের মতো উকিল নাকি ঘামতো ও সাক্ষীর কাঠ গড়ায় দাঁড়ালে। ভোলা মোক্তার, নরেন মোক্তার কাঁপত তাকে জেরা করতে। আমার সামনে আমার বাবার কথা বলতো না। ওর কথা শুনে মনে হত আমার বাবাও নিশ্চয় ওকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় জেরা করতে কাঁপত এবং ঘামত। ভূপতিদার ধারণা সে আছে বলে গাঁয়ের লোক সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারছে। আমি অবাক চোখ নিয়ে শুনতাম ও বিশ্বাস করতাম। সে সব দিনগুলো মনে এলে ফিরে চলে যাই সেই শৈশবে। খড়ের চালের কুঁড়ে ঘরের সারি। জমিদারের পাকা দালানের থেকে ভাল লাগত। দুর্গামন্দির, মনসা থান—পাশে বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট। পুকুরপাড় জুড়ে আম জাম কাঁঠালের বড় বড় গাছ। ছায়ায় বসে পুকুরের পদ্মফুল দেখতাম। বাঁধান ঘাটে বসে ভূপতিদার কাছে নিত্য-নূতন গল্প শুনতাম। চৌকিদারের কাজ করেও ভূপতিদা রামায়ণ মহাভারতের গল্প করত। নিজে টিপ সই করে মাইনে নিত। কিন্তু সে গল্প কারো না কারো কাছে শুনে মনে রাখতে পারত তা। ভূপতিদা আমার শৈশবের এক বিস্ময়।

প্রায় তিরিশ বছর পর একদিন হঠাৎ দেখলাম ভূপতিদাকে। বার্ধক্যের গোড়ায়। দেখে সহজে চেনা কঠিন প্রথমটা। কিন্তু নামটা আমার ভোলা যায় না। চৌকিদার ভূপতি বাগ্‌দি হাঁক দেয় কোর্টের পেয়াদা। খাকি রং-এর কোট আর চৌকিদারের বেল্ট পড়ে সে উঠল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। নামটা কানে আসতেই খটকা লাগল। তারপর সে যখন তার গ্রামের নাম বলল, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চিনতে পারলাম। বয়সের ভারে শরীর ও বেশি ক'রে মুখের খুব পরিবর্তন হয়েছে। তবুও কষ্ট করে চেনা যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ যুবক আমি। তার সঙ্গে কালো কোট ও গাউন। কোর্টের পরিবেশ ও চারিদিকে অচেনা মানুষের মুখ। আমাকে সে চিনতে পারেনি। আধঘণ্টার ওপর সে ছিল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। উকিলের জেরায় সে ভুল ভাল উত্তর দিচ্ছিল তাতে হাসি পাচ্ছিল সকলের। আমার তো আরো বেশি। এক কালের বাঘা বাঘা উকিল মোক্তারকে ঘায়েল করার অহঙ্কারী চৌকিদারের জবাব শুনে। বেশ উপভোগ করছিলাম। আমাদের উকিল মহলে একটা প্রবাদ ছিল। কোন মামলায় একটা মাস্টারমশাই বা চৌকিদার থাকলে সরকারপক্ষের সারা মামলাটাই নষ্ট করে দেয়। চৌকিদার সেই মামলায়

সাক্ষী দিতে এসেছিল শুধু বলতে যে দারোগাবাবু তাকে মৃতদেহ পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছিল। সে মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিল কিছু গ্রামের লোক যাদের কাছে আসামী স্বীকার করেছে সে খুন করেছে এবং মৃতদেহ মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে। সাক্ষীরা তা জেনে থানায় সংবাদ দেয়। চৌকিদার জেরার উত্তরে বলল—আসামী যখন স্বীকারোক্তি করে তখন সে এবং দারোগা দুজনেই উপস্থিত ছিল। দারোগা আসামীকে প্রথম থানা থেকে গ্রামে আনে। আসামীর শরীরে মারপিটের জখম ছিল। মামলার শেষ। কারণ পুলিশের সামনে স্বীকারোক্তির আইনে কোন মূল্য নেই। চৌকিদার কাঠগড়া থেকে নেমে বারান্দায় তার কোট খুলছে। সাক্ষী দেবার আগে সেই কোট পরেছিল। এটাই তাদের রেওয়াজ ছিল। আমি গেলাম তার কাছে। বললাম—ভূপতিদা না? সে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকেই বলতে হল খোকাবাবুকে মনে নেই? মোক্তারবাবুর ছেলে। পারুলিয়া গ্রামে তোমার পাহারায় বাবা রেখে আসতো পুজোর ছুটিতে। কত গল্প শোনাতে ডাকাত ধরার, রামায়ণ মহাভারতের। হরিমিছির, অবিনাশ মিত্তিরের মতো উকিলকে ঘায়েল করতে।

ভূপতিদা বলল—খোকাবাবু, সেই ছোট্ট খোকাবাবু আজ এত বড়ো হয়ে গেছে। গায়ে কালো কোট। সত্যিই চিনতে পারিনি আপনাকে।

আমি বললাম আপনাকে নয়। তোমাকে।

বেশ তাই বলছি—বলল ভূপতিদা। আমি ভূপতিদাকে জড়িয়ে ধরলাম। মনের যা আনন্দের অনুভূতি তা ভুলিয়ে দিল চারপাশের মানুষকে। কে দেখছে এ নিয়ে কোন চিন্তাই হল না। ভূপতিদাকে জোর করে নিয়ে গেলাম ভাতের হোটেলে। তারপর শুরু হল স্মৃতি রোমন্থন। ভূপতিদা সেদিন এমন অনেক কথা বলল যা ছিল আমার অজানা। তার শেষ কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। তার দীর্ঘশ্বাস ভরা কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে আছে। ভূপতিদা বলেছিল—সবার জন্য চৌকিদারি করে নিজের বাড়ির জন্য চৌকিদারী করতে পারলাম না।

ভূপতিদার স্ত্রী মিনতিকে আমি দেখেছি। কতই বা বয়স তখন তার। ভূপতিদার বয়স যদি তখন পঁচিশ, মিনতির বয়স তের কি চৌদ্দ। প্রায়ই আমার বয়েসী। মিনতির বাপের বাড়ি ছিল করমশাল গ্রামে। বিয়ের পর তিনদিনের জন্য এসেছিল। তারপর অষ্টমঙ্গলা করতে যায়। বাপের বাড়িতেই ছিল চারবছর। পূর্ণযৌবনা হয়ে যখন আসে তখন দুর্গাপূজার সময়। ছুটিতে তখন আমি কয়েকদিনের জন্য গ্রামে। ভূপতিদার মুখে শুনেছিলাম সে বিয়ের কথা যখন মিনতি বাবার বাড়ি চার বছর ছিল। তাদের বাগ্‌দি সমাজে রীতি ছিল পাত্রী কম বয়সের হলে তিন-চার বছর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পাবে না। সে সব রীতি বহুকাল উঠে গেছে। সতের আঠারো বছর না হ'লে কোন মেয়ের বিয়ে হয় না। সেটাও দেখেছি। সেই পূজার পর আর আমার গ্রামে যাওয়া হয়নি লেখাপড়া ও কর্মজীবনের কারণে। ইতিমধ্যে আমাদের সে বাড়ি ছিল তাতে এক আত্মীয় বসবাস করতে থাকে। চাষবাস করত বর্গাদার। ধানের ভাগ পৌঁছে দিত আমাদের শহরের বাড়িতে। ভূপতিদা শহরে আসত কোর্ট-কাছারি বা থানার কাজে। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি কখনও। তার সঙ্গে যা কিছু মেলামেশা ছেলেবেলার পাঁচ-ছ' বছর। তার সংসারে জন্ম নিয়েছে তিন ছেলে এক মেয়ে। বিয়ের পর মিনতি বেঁচেছিল চৌদ্দ বছর। ছোট মেয়ের জন্মের দু বছরের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। ভূপতিদা বিপদে পড়ে যায় তখন। রাত্রে পাহারাদারি ছাড়াও দিনে নানা কাজ। তার মধ্যে ছেলেদের ও মেয়েকে দেখা। তার পাশের বাড়ির তরুবালা বাগ্দি সাহায্য করত বলেই ছেলে-মেয়ে মানুষ করা সম্ভব হয়েছিল। ভূপতিদা বলেছিল 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। নানা কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট করে ছেলেমেয়ে মানুষ করে কী হল। মানুষ তো

কারোকে করতে পারিনি। তখন লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ ছিল না। ছেলে তিনটে একটু বড় হলে কারো বাড়িতে মাহিন্দারের কাজ করত। খাওয়াটা দিনের গেরস্থ দিত। গরু চড়ানো কাজ। তার পর বয়সটা বাড়তে থাকলে ছেলে তিনটেই বেবাগী হয়ে গেল। মাঠে চাষের কাজে থাকলে সংসারের সংস্থান হয়। কিন্তু কেউ তা করবে না। বড় ছেলে ভাল বাঁশী বাজাতো। যাত্রাদলে নাম লেখালো। প্রায় প্রতি রাত্রে এ গাঁ সে গাঁ যাত্রায় বাঁশী বাজায়। বাড়িতে ফেরে কম। মেজছেলে রাজনীতি করতে শুরু করেছে গোপনে। টিপ সই করার ক্ষমতা নিয়ে স্বপ্ন দেখে প্রধান হবে। এদিকে জমিদারের কিছু জমি খাস রেখে বাকী চলে যায় সরকারে। জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে কাটিয়েছে বহু বছর। তখন গ্রামের মানুষ অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। জমিদারকে আর প্রেসিডেন্ট রাখতে চায় না। আমার মেজছেলে কম্যুনিস্ট হয়ে সকলকে জমিদারের বিরুদ্ধে বোঝায়। সরাসরি শত্রুতা তার সঙ্গে জমিদারের। জমিদার কংগ্রেসি করে তখন। বৃটিশের দেওয়া উপাধি রায় সাহেব ছেড়ে মাথায় গান্ধিটুপি। গ্রামে তার বশংবদ চেলাদের দিয়ে মেজো ছেলেকে বহু মামলায় আসামী করে দেয় জব্দ করতে। দুচারটে ডাকাতি মামলায় চালানও করে দেয় তাকে। তার ফলে মেজছেলে সত্যি একদিন ডাকাত হয়ে গেল। ভূপতিদার চোখে জল এসে গেল। আমি বললাম আজ থাক। পরে শুনব কোন একদিন। তারপর ভূপতিদা সেদিন চলে গেছে গ্রামে। আমার সঙ্গেও আর দেখা হয় নি বেশ কয়েকবছর।

একটা খুনের মোকার্দমার ঘটনাস্থল দেখতে গেছি ভূপতিদারই গ্রামে। সে গ্রাম আমাদের নয় বহু বছর। ভূপতিদার খোঁজ নিয়ে তার ঘরে গেলাম। তার তখন বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। একাকীত্বের জীবন। ঘরে তাকে ছাড়া কাউকে দেখতে না পেলে জিজ্ঞেস করলাম ছেলেদের ও মেয়ের কথা। উত্তরে যা জানলাম তাতে মনে হ'ল জিজ্ঞাসা না করাই ছিল ভাল। ভূপতিদা আমাকে দেখে খুশী হয়েছিল আমি তাকে দেখতে গেছি বলে। কিন্তু আমি কেন তার দুঃখকে মনে পড়িয়ে দিলাম। অনুশোচনা এল। পরে দুঃখ এল। ভূপতিদা বলল—বড়ছেলে যাত্রা দলে মিশে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এখন আর যাত্রায় বাঁশী বাজায় না। খয়রাডিহি গ্রামে একজনের বিয়ে করা বৌকে নিয়ে পালিয়েছে কোথায় কেউ জানে না। সেই বৌকে নিয়ে এলে খয়রাডিহির মুসলমানেরা তাকে মেরে ফেলতো। এই ভয়ে সে পালিয়েছে এক অজানা ঠিকানায়। ছোট ছেলেও রাজনীতি করতে করতে নকসাল হয়ে গেল। কত মানুষকে সে খুন করেছে দলে পড়ে তার কোন হিসাব নেই। গণ আদালত করত ওরা। গ্রামেরই যারা মহাজনী কারবার করত, বন্ধকী কারবার করত বা পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখত তাদেরকে তারা ধরে নিয়ে যেতো কোন নির্জন জায়গায়। বিচারে প্রাণদণ্ড দিত। পনের কি ষোলজনের সে দল প্রত্যেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করত। সকলকেই চোট মারতে হবে এমনকি তো মৃতদেহ হয়ে যাওয়ার পরও। পুলিশ ছেলেকে খুঁজতে আসত ভূপতিদার ঘরে প্রতি রাত্রে। দুর্বিষহ সে জীবন। তারপর দিন নেই রাত নেই পুলিশের ডাকাডাকি যখন তখন। একদিন পুলিশ এসে ডাকল আমাকে। থানায় যেতে হবে। কেন কিছু বলে না। দুরুদুরু বুক নিয়ে থানায় গেলাম। কাপড়ে ঢাকা একটার পর একটা মোট পাঁচটা মৃতদেহ। তারই মধ্যে চিনতে পারলাম একটা। সেটা ছোটছেলের। পুলিশ বলল তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গিয়ে এই পাঁচজন মারা গেছে। এদের দলে উনিশ-কুড়িজন ছিল। ওরা ডাকাতি করে-পালাচ্ছিল মাও সে তুং জিন্দাবাদ করতে করতে। পাঁচজন মারা গেছে। দু'একজন জখম হয়ে থাকতে পারে। এদের কাছ থেকে দোনলা বন্দুক, কার্তুজ-পাইপ গান পাওয়া গেছে। কিছু নগদ টাকাও। আমার মতো চৌকিদারের কাছে দুই ছেলে ডাকাত এটা অনেক পাওয়া। বলতে বলতে অঝোরে কেঁদে ফেলল ভূপতিদা। বেশ

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। আমিও কথা বলতে পারছি না। আবার কী শুনব কে জানে। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। অনেকক্ষণ পর ভূপতিদা কথা বলল।—খোকাবাবু, আরো শোন আমার পাওনার কথা। একমাত্র মেয়ে ষোল বছর বয়স হতে না হতেই একদিন পালিয়ে গেল এক মুসলমান ছেলেকে ভালবেসে'। গাঁয়ের লোক আমাকে একঘরে করে দিল। যার দুইছেলে ডাকাত আর মেয়ে ধর্ম ত্যাগ করেছে সে বাপকে তো সমাজ মেনে নিতে পারে না। তাই একাই আছি। এর মধ্যেও একটা সুখ আছে। তরুবালা আমাকে ছেড়ে যায়নি। অতি কম বয়সে বিধবা হ'য়ে সেও কম কষ্টে কাটায়নি। মিনতি মারা যাওয়ার পর থেকে আমার ছেলে মেয়েকে কোল দিয়েছে, বড় করেছে, তাদের জন্য সেও কষ্ট পেয়েছে। তরু বোধ হয় আমাকে ভালবেসে এসেছে সংগোপনে। আমি বুঝে উঠতে পারিনি অনেক কাল। যখন বুঝতে পেরেছি তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। বিয়ের আর বয়স নেই। ঠিক সময়ে বুঝতে পারলে তাকে সাঙ্গা করতে পারতাম। সাঙ্গা করলে হয়ত আমার জীবনটা সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ের জীবনটা হয়ত বদলে যেত। তরু দুবেলা খেতে দেয় বলে খেতে পাই। ওরও বয়স হয়েছে। কতদিন খাওয়াতে পারবে কে জানে। সারাদিন বসে বসে ভাবি—আমি যেন তরুর আগে যাই। আবার ভাবি কি স্বার্থপর আমি। আমার বিয়ে করা বউ নয় বলেই ভাবি ও একা বেঁচে থেকে কষ্ট পাক। জানো খোকাবাবু সব হাকিমের বা জজের ওপরে এক জজ আছে যাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। শুধু তার রায় মেনে চলতে হয়, চলতে বাধ্য হ'তে হয়।

এক সময় ভূপতিদার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। পথে ভাবছি ভূপতিদা তো সুন্দর কথাটা বলল। বিচারকের ওপরে যিনি আছেন তিনি তো বিশ্ব বিচারক। অলিখিত রায় দেন, তা মানতেও মানুষ বাধ্য। একসঙ্গে কত মানুষের বিচার করেন তিনি। ভূপতিদা উপলব্ধি করেছে একজন বিশ্ববিচারক আছেন। আমি এতকাল কত মানুষের বিচার দেখেছি। তবুও উপলব্ধি আসেনি। উপলব্ধি হতে কি জীবনের অগ্নিপথ দিয়ে চলতে হয়? ভূপতিদা সকলের জন্য চৌকিদারি করে নিজের চৌকিদার হতে পারেনি।

বিচারক যশোদানন্দন

ছেলেবেলা থেকে যশোদানন্দনের মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার জীবন হবে সকলের কাছে এক আদর্শ। কি শিক্ষায় কি জীবন ধারায়। প্রকাশভঙ্গিতে থাকবে এক বৈচিত্র্য। আমাকে যারা দেখবে তারা ভাববে এমনই জীবন ভাল। যশোদা চেয়েছিল এক আদর্শ পুরুষ হবে। সুলোচনা জীবনে আসার আগে তেমনই এক জীবন কাটিয়েছে বিনা বাধায়। তারপরও চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি তার সে আকাঙ্ক্ষা পেতে যতটা সে স্বপ্ন দেখতো। যশোদা ভাবতো পুরুষকারই সব। ভাগ্য নির্ভরতা কাপুরুষতা। সারা ছাত্রজীবন এবং অনেকটা কাল কর্মজীবনে এই ভাবনা ছিল প্রবল। জীবনকে নিয়ন্ত্রণ মানুষ নিজেই করতে পারে। ভবিষ্যৎ মানুষ নিজেই তৈরি করে। এই ভাবনাটা স্বাভাবিক ছিল। কারণ মেধাবী ছাত্র। পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে শিক্ষাজীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। কর্মজীবনে সুনাম অর্জন করেছে। সেজন্য পুরুষকার কথাটা মন থেকে মুছে দিতে পারেনি বহুবছর। তারপর জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাত এসে মনকে দুর্বল করে দিয়েছে। সেই দুর্বলতা এক অন্য চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। ফলে তার এখন মনে

হয় পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং এক অদৃশ্য শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কর্মজীবন। যা কিছু পুরুষকার সুখ, দুঃখ, চাওয়া ও পাওয়া কোন কিছুই মানুষের নিজের হাতে নয়। একটা জীবনের নির্দিষ্ট পরিণতি যেন জন্মলগ্নেই নির্ধারিত হয়। মানুষ যা করে ঠিক মনে করেই তা করে। সেটা ভুল হ'লে অনুতপ্ত হয়েও সে অসহায়। কিন্তু এমনই হয়। যশোদানন্দন আমার জীবনে এক উপলব্ধি।

বিহার আমার খুব ভাল লাগে। শীতের সময় তো তার তুলনাই নেই। প্রকৃতি এক নতুনরূপে সামনে হাজির হয়। পাহাড়, নদী, জঙ্গল নতুন সাজে এসে দাঁড়ায় সামনে। প্রকৃতির সে রূপ আমাকে বার বার টানে। বিহারের কোন না কোন জায়গায় প্রতিবছর যাই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে। মনে সুখ, শান্তি, আনন্দ পাবার জন্য যেতে গিয়ে জানতে পারি কত ঘটনা, পরিচয় হয় কত নতুন চরিত্রের। এমনই এক চরিত্র যশোদানন্দন সিং। এই ভাবেই তো কোন না কোন বছর দেখেছি দেবকীনন্দন ঝা, রুপেন্দ্র মোদি, বনওয়ারীলাল ভাও সিংকা, রঘুনাথ চৌবে, ফুলকুমারী যশোধারা, ফুল বাসিয়া, আরো কত চরিত্র আর তাদের নিয়ে কত অজানা ঘটনা। যশোদানন্দন ও সুলোচনা তেমনি দুই চরিত্র। স্বামী মুন্সেফ, স্ত্রী কি? তাদের নিয়েই এই কাহিনী। দুই মানসিকতার দ্বন্দ্ব। স্বামী এক বিচারক। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শিক্ষা জীবন শেষ। কর্মজীবন শুরু মুন্সেফের চাকরি নিয়ে। বাবাকে হারিয়েছে কোন শৈশবে। মা যশোদানন্দনকে অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে। কিনা করতে হয়েছে বিধবা মা'কে। পরের বাড়িতে ঝি কখনও কখনও বা কাপড় সেলাই করে আয়। তার থেকে অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়ে ছেলে যশোদাকে মুন্সেফ করেছে। চাকরির পর থেকেই সাধ পুত্রবধূ নিয়ে সুখ পাওয়ার। তখন এক মুন্সেফের কতই বা বেতন। সে বেতনে সাহস করেনি যশোদা বিয়ে করতে। মাকে বুঝিয়েছে বছর পাঁচেক চাকরি ক'রে তারপর বিয়ে করবে। মা ধৈর্য ধ'রে একবছর থাকার পর এমন ভাবে যে হঠাৎ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে কে ভেবেছিল। যশোদা এখন একা, আত্মীয়হীন বন্ধুবিহীন জীবন। মাথার ওপর শুধু অভিভাবক জেলাজজ ও সাবজজ। সকাল হয় ভীতি নিয়ে। মামলার নথি, হাইকোর্টের নজির, নানা আইনের ধারার তর্জমা। এরই মধ্যে রাত আসে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যশোদা ঘুমিয়ে যেন কয়েক ঘণ্টার শান্তি পায়। মা মারা যাবার পর বিয়ের কথা আর ভাবতেই পারে না। তার কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতেও আসে না। সে তো বিচারক—সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক প্রাণী। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কোন সুযোগ নেই। কারণ কে কবে কোন মামলায় জড়িয়ে পড়বে আর তার বিচারের নথি হয়তো তারই এজলাসে আসবে। হয়তো বা কেউ হাইকোর্টকে জানাবে মুন্সেফবাবুর অমুক মানুষের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। তার মাধ্যমেই মুন্সেফ ঘুষ নেন। রায় যার বিরুদ্ধে যাবে সে-ই পাঠাবে বেনামী চিঠি। তাই কাজ নেই কোন বন্ধুত্বে এই ভেবেই যশোদা কাটিয়েছে দু'বছর জামতারা কোর্টে। তারপর বদলি হয়ে এসেছে দু'মকা শহরে।

. যশোদানন্দন দুমকায় এসে প্রথম ছ'মাস কাটিয়েছে আগের মতোই। কাজ আর কাজ, কাজের মাঝে আইন পড়া। তাকে যারা দেখতো তারা ভাবতো এ এক অত্যাশ্চর্য মানুষ যার জীবনে কোন প্রেম কোনদিন হয় তো আসবে না। সে নিজেও তার মনের এই দিকটার কোন অনুভূতি বোধ করেনি। পথে চলতে গিয়ে কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকাবারও না ছিল আকর্ষণ না কোন নারীসঙ্গের কামনা। কিন্তু সুপ্ত একটা মন যে ছিল তা যশোদা উপলব্ধি করল হঠাৎ একদিন। তার কোয়ার্টার থেকে কোর্ট ছিল পনরো-বিশ মিনিটের পথ। ছ'মাস যাতায়াত করেছে সে পথ দিয়ে। কিন্তু পথের পাশে কাউকে চোখে পড়েনি। তারপর একদিন এমন একটা

ঘটনা ঘটল যা যশোদানন্দনের জীবনটাকেই বদলে দিল। কল্পনাও যা করতে পারেনি সে, তাই ঘটলো। কোয়ার্টার ছাড়িয়ে যখন সে একশ গজ মাত্র এসেছে চোখ গেল একটা একতলা বাড়ির সামনের গেটে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ যুবতী। যে যশোদা এতকাল মুখ তুলে তাকায়নি কোন মেয়ের দিকে, সে কিনা অপলক নয়নে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। কতক্ষণ তাকিয়েছিল খেয়াল নেই। যখন সম্বিত ফিরে পেল তখন নিজেরই একটা লজ্জা এল। আশে-পাশের মানুষ তাকে দেখছে। একজন মুন্সেফ তাকিয়ে আছে এক সুন্দরী যুবতীর দিকে। তাড়াতাড়ি কোর্টে পৌঁছে কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু আজ এক অন্য যশোদানন্দনকে দেখলো উকিল, পেশকার ও অন্যান্য সকলে। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে যশোদা। এক দেড় ঘণ্টা কোনক্রমে এজলাসে কাটিয়ে সে চলে গেল চেম্বারে। আর সেদিন সে বসবে না। জানালো শরীর খুব খারাপ। তাতেও শান্তি নেই। সকলেই ছুটে আসে সাহায্যের হাত বাড়াতে। যশোদা কারো সাহায্য নিল না। সময়ের আগেই কোয়ার্টারে ফিরতে গিয়ে আবার দেখা সেই যুবতীকে। এবার কিন্তু একবার মুহূর্তের জন্য দেখে পথ চলতে লাগল। কিন্তু কি এক আকর্ষণে মুখ ঘোরাতেই দেখলো গেটে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনটা দুর্বল হ'তে শুরু করেছে যশোদানন্দনের। তাকে প্রশ্রয় দেবে না ঠিক করে সে চলে গেল কোয়ার্টারে। কিন্তু পরদিন। তারপর দিন এবং পরে প্রতিদিন সে সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকে একই জায়গায়। যশোদা চেষ্টা করেও চোখকে আটকে রাখতে পারে না। দৃষ্টি যায় তার দিকে। চোখ ফেরাতে পারে না। আস্তে আস্তে তা সহজ হয়ে যায়। একদিন সে যুবতী নিজের থেকেই কথা বলে। এই ভাবে কয়েকদিন চলার পর একজন অন্যজনের সান্নিধ্যে আসে সন্ধ্যার পর। দুমকা শহরের দক্ষিণে জঙ্গলে তারা ঠিক সময়ে আসে। গল্প করে একঘণ্টা দুঘণ্টা। কখনও বা তারও বেশি। এভাবে এক সময় যশোদার মনে হয় তারা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

যশোদানন্দন প্রথম জানতে পারেনি তার প্রেয়সী সুলোচনা মহুল পাহাড়ী হাসপাতালের নার্স। কিন্তু জানলো একদিন। তখন একটা বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু প্রেমে সেটা কোন বাধা হয় না। যশোদা ভাবে সুলোচনাকে বিয়ে ক'রে তাকে সংসারী করবে। এক মুন্সেফের স্ত্রীর তো কোন প্রয়োজন নেই নার্সের চাকরি করার। সুলোচনা কিন্তু তা ভাবে না। এ নিয়ে কোন কথা তাদের মধ্যে হয় না। যশোদা ধরেই নেয় যে বিয়ের পর সুলোচনা নিশ্চয় আর নার্সের কাজ করবে না। কারণ তার কোন প্রয়োজন নেই এবং প্রয়োজন সে হতেই দেবে না।

মানুষ কি ভাবে হঠাৎ পরিচিত হয়, আলাপ হয়। আলাপ থেকে প্রেম হয়। প্রেম আবার এমন এক জায়গায় নিয়ে যায় সেখান থেকে ফেরা যায় না। কোন কিছুই তখন বাধা হয় না। ভাবতে অবাক লাগে। একমাসের বেশি সেই রাস্তা ধরে কোর্ট যাতায়াত করেছে। কিন্তু আলাপ করতে প্রথম এগিয়ে এসেছিল সুলোচনা। গেট থেকে রাস্তায় এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল যশোদার সামনে। খানিকটা ইতঃস্তত করে বলেছিল—আপনি প্রতিদিন একই সময়ে আমাদের গেটের সামনে দিয়ে যান। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। যশোদা অবাক যেমন হয়েছিল আনন্দও পেয়েছিল। কিছুটা নার্ভাস গলায় বলেছিল আপনিও তো একই সময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গেটে। কার জন্য? সুলোচনা জবাব দিয়েছিল মুচকি হেসে। ধরা পড়ে গিয়েছিল দুজন একে অপরের কাছে। একদিন যশোদা বলল আপনার সঙ্গে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে কথা বলা কঠিন। ইচ্ছে করে নিরালায় কথা বলতে। আমি তো মুন্সেফ। আমার অনেক বাধা। সুলোচনা প্রস্তাব দিয়েছিল এবার থেকে রাস্তায় দেখা না ক'রে কঙ্কনা নদীর ধারে থাকবে সন্ধ্যার পর অথবা ভোরে। যশোদা রাজি হয়েছিল। সেইমত দেখা হ'ত দুজনের।

ঘণ্টাখানেক তারা নানা কথায় এত মগ্ন থাকতো যে সুলোচনার সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি তার মনটা ছাড়া।

যশোদা ও সুলোচনার গোপন মেলামেশা বেশি দিন গোপন থাকেনি। মুন্সেফকে ছোট শহরে চিনতে কারো বাকি থাকে না। এরকম এক মানুষকে শহরেরই মেয়ে সুলোচনা প্রেমিক করেছে এটা খুব মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়েছে অনেকের কাছে। সুলোচনাকে যারা ছোট থেকে দেখেছে তারা খুব অবাক হয়েছে। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাস করে সুলোচনা নার্সের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। খ্রীস্টান হওয়ার সুবাদে প্রথম মন্থলপাহাড়ী ও পরে দুমকায় চাকরি করে। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ যশোদা সুলোচনার মধ্যে আর কিছু খুঁজতে চায়নি। সুলোচনা কিছু বলতে গেলে যশোদা কোন আগ্রহ দেখায়নি। নানা লোকের আলোচনা তাদের নিয়ে সেটা যখন সে জানতে পেরেছে সুলোচনা খ্রীস্টান এবং নার্সের কাজ করে তখন আর পেছনে ফিরতে পারেনি। সুলোচনাও বিয়ের তাগিদ দিচ্ছিল। এই রকম একটা অবস্থায় সুলোচনা সম্বন্ধে সব কিছু জানার পর তাকে বিয়ে করেছে যশোদানন্দন।

বিয়ের পর এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিয়ে গোপনে। কিন্তু সংবাদ গোপন থাকেনি। সকলের মুখ যেন কৌতূহলে ভরা। যশোদা ভাবে যে সে বিচারক ব'লে কি তার নিজস্ব কোন জীবন থাকতে পারে না। সে তো অন্যায় কিছু করেনি। এক যুবক তো আর এক যুবতীকে ভালবাসতে পারে, তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারে। এতে দোষ কোথায়? স্ত্রী যদি নার্স হয় সেটা তো কোন দোষের নয়। স্বজাতি ও স্বধর্মের মানুষকেই যে বিয়ে করতে হবে তার তো কোন মানে নেই। কিন্তু প্রশ্নহীন মানুষের চোখের চাহনি বিব্রত করে তোলে যশোদানন্দনকে। অন্য প্রশ্নও মনে জাগে। বিচারকের বোধ হয় সব স্বাধীনতা নেই। বিশেষত আত্মীয়-পরিজনহীন এক বিচারকের। আজ যশোদার বাবা মা বেঁচে থাকলে তাদের কাছে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসার কোন বাধা ছিল না কারো, সে বাধা আছে সরাসরি এক বিচারকের কাছে আসতে। কোন সুন্দরীকে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম হলে এবং তার সঙ্গে প্রেম গভীর হ'লে কি কারো পক্ষে সম্ভব জিজ্ঞাসা করা সে কি জাত, কি তার পেশা। বরং ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে একটাই প্রশ্ন জাগে তাকে ছাড়া কি বেঁচে থাকা সম্ভব। সব সময় কি মানুষ মনে রাখতে পারে যে আমি বিচারক। সব কিছু সমস্যার সমাধান মনে হয় একটাই। সুলোচনাকে নিয়ে অন্য কোন শহরে বসবাস করলে এসব প্রশ্ন আসবে না।

যশোদানন্দন মানসিক স্বস্তি পায়। চেষ্টা করতে হবে এখন থেকেই বদলির। তাতে দুদিক থেকে উপকার হবে। অন্য জায়গায় যেমন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। তেমনি সুলোচনাকেও চাকরি ছাড়তে হবে। সব সমস্যার সমাধান তাতেই। সুলোচনা বিয়ের পর চাকরিতে যায় নিয়মিত। সকলেই দেখে। এটাও লজ্জা হ'য়ে দাঁড়ায় যশোদার কাছে। এ লজ্জা থেকেও মুক্তি দরকার। সব কথাই মনের মধ্যে রেখে যশোদা বদলির চেষ্টা করে। সেখানেও অনেক অসুবিধা। তার সম্বন্ধে কনফিডেন্সিয়াল এক রিপোর্ট আছে জেলা জজের। তা সত্ত্বেও বছর দুয়েকের মধ্যে যশোদানন্দের বদলির আদেশ আসে। তাও জেলাজজের রিপোর্টের ভিত্তিতে। মনে মনে সুখী হয় যা চেয়েছে তাই পাওয়ায়। এবার সুলোচনার পরীক্ষা। সে কি তার চাকরিতে ইস্তফা দেবে? ইস্তফায় প্রমাণ হবে প্রকৃত প্রেম। না দিলে প্রমাণ হবে প্রেম মিথ্যা।

বদলির আদেশ পেয়ে আনন্দ ও আশা নিয়ে যশোদা কোয়ার্টারে ফিরে দেখে সুলোচনা ফেরেনি তখনো হাসপাতাল থেকে। মনে পড়ে আজ তার ডিউটি রাত আটটা পর্যন্ত। স্ত্রীর

জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আজ এক চরম পরীক্ষার দিন। বদলির কথা সে জানাবে সুলোচনাকে। এতদিন মনের কথা তো বলা হয়নি। ইচ্ছে করেই বলেনি। পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর বলাটা সহজ হবে। সমস্যার সমাধানও হ'তে পারে। তাছাড়া স্ত্রী নার্স বলে স্বামী মানসিক কোন অশান্তিতে আছে একথা বললে সুলোচনা সেটাকে অন্যভাবে নিতে পারে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত ন'টা বেজে গেল। সুলোচনা এসেই বলল—একটা রোগীর অপারেশনের পর নানা ঝামেলায় দেরি হ'য়ে গেল।' যশোদা হাসিমুখে তাকালো, কোন জবাব না দিয়েই.। সুলোচনা যাতে বুঝতে পারে স্বামী তার জন্য মোটেই ক্ষুন্ন নয়। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে শুয়ে পড়ে দুজনে। বদলির আদেশের কথা বলা হয় না। এই কথার সঙ্গে আরো তো অনেক কথা আছে। সারা রাত্রির ঘুম হয় তো নষ্ট হবে দুজনেরই। সুলোচনা ঘুমিয়েছে অন্যান্য রাতের মতোই। যশোদাও ঘুমিয়েছে। বদলি ও সুলোচনাকে শুধু গৃহিণী হিসেবে পাবার উন্মাদনায়। খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে যশোদার। বিছানায় বসে সুলোচনার মুখের দিকে তাকিয়ে এক পরম তৃপ্তি। সরলতায় মুখটা দেখে মায়া হচ্ছে। বিশ্বাস যেন আপনা আপনি আসছে সুলোচনা তার স্বামীর জন্য সব কিছু করতে পারে, সব ত্যাগ করতে পারে। অনেকক্ষণ এভাবে দেখে এক সময় বিছানা ছেড়ে যশোদা উঠেছে। আজ নিজে স্টোভ জ্বেলে চা করেছে দুজনের। দুকাপ ভর্তি চা নিয়ে সুলোচনাকে ডেকেছে। ঘুম জড়ানো চোখে সুলোচনার বিস্ময়। ভালও লাগছে। তার কাজ আজ স্বামী করেছে—। যশোদা সুলোচনার মনের আনন্দ-মুখর অবস্থায় বলেছে। কাল আমার বদলির আদেশ এসেছে। এবার তুমি ও আমি এক নতুন জায়গায় যাব। সারাদিন কাজের পর তুমি হবে আমার সব। তোমার কোন চাকরি থাকবে না। তুমি হবে শুধু মুন্সেফ গিন্নি। ভাবতেই আমার যে কি ভাল লাগছে তোমায় বোঝাতে পারব না। একের পর এক বদলি নিয়ে যেখানেই যাব, কোন মনোকষ্ট থাকবে না। কোন মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না কৌতূহল নিয়ে।

সুলোচনা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে যশোদার দিকে। বুঝতে পারছে না স্বামীর কেন এত আনন্দ উচ্ছ্বাস। স্বামীর বদলির আদেশের সঙ্গে তার এত আনন্দের কি আছে। স্বামী কি জানে না যে আমার পক্ষে কোন কিছুই সম্ভব নয় যতদিন মা বেঁচে আছে। আমি তো মাকে ছেড়ে কোনদিন দুমকা ছেড়ে যেতে পারব না। স্বামী জেনেও কেন বোঝে না। সুলোচনা বলে—'নতুন জায়গায় ভাল একটা কোয়ার্টার পাও তারপর আমি যাব। যশোদা জানায় কোয়ার্টার তো বাঁধা আছে। মুন্সির বদলি হয়ে ফাঁকা হয় সেখানেই গিয়েই থাকা যায়। তবে একটা কথা ঠিক। জয়েন ক'রে থাকার ব্যবস্থা ক'রে মাসখানেক পর গেলেই ভাল। সুলোচনা মনে মনে খুশি হয় আপাতত যশোদাকে দুঃখ দেওয়া হ'ল না। সুলোচনা বলল তোমার সঙ্গে যখন জীবনটাই বেঁধেছি সে বাঁধন তো সহজে কাটা যাবে না। আমাদের দুজনের ভাগ্য তো এখন একসূত্রে বাঁধা। যশোদা বলে—একটা সমস্যা তোমার আছে। মাকে ছেড়ে যাওয়া অসহায় অবস্থায় এই বাড়িতে। কিন্তু তুমি যেন কোনদিন ভেবো না যে তোমাকে মা ত্যাগ ক'রে যেতে বলব আমার সঙ্গে। তোমার মা তো আমারও মা। কাজেই তিনি আমাদের কাছেই থাকবেন। সুলোচনা কিছু আর বলল না যশোদাকে। বলা যায় না বলেই হয়তো। তবে তার খুব ভাল লাগল স্বামীর কথাটা। তাঁর মাকে যে স্বামী নিজের মায়ের মর্যাদা দিয়েছে এটা কম সুখের নয়, অন্তত মেয়ের কাছে। কিন্তু মনে মনে তো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না সে। কারণ কতদিন যশোদাকে স্ত্রীর সদাসঙ্গ ছেড়ে থাকতে হবে সেটা তো বলা যায় না। সুলোচনা তার নিজের মাকে তো ভালই চেনে। এমনি মা অনেক উদার। তা নাহলে খ্রীশ্চিয়ান

মেয়েকে বিয়েতে মতই দিত না। কিন্তু উদারতারও তো একটা সীমা আছে। যশোদা যা ভাবছে মা যদি তাতে রাজি না হয়। তখন কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে। এখন সে সব চিন্তা না করাই ভাল এই ভেবে মনের ভাবটা স্বামীর কাছে গোপন রেখেই চলে।

সাতদিনের মধ্যে যশোদাকে চার্জ দিয়ে চলে যেতে হ'ল। নতুন জায়গায় যোগও দিতে হ'ল। সেখানে কাজের চাপ এত বেশি যে প্রায় একমাস তা সামলাতেই কেটে গেল। চিঠি দেওয়া ছাড়া সুলোচনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ সম্ভব হ'ল না। যশোদা সপ্তাহে তিন বা চারটে চিঠি লিখলেও সপ্তাহে একটা চিঠির উত্তর সুলোচনা দিতে পারে না। সুলোচনার চিঠি পেতে দশ কি বারোদিন অপেক্ষা করতে হয়। যশোদা ভাবে, নার্সের কাজ, হয়তো সময় পায় না। সেও তাই লেখে তার চিঠিতে। যশোদার মনে কোন অশান্তি হয় না। বিচারের কাজে কোন অসুবিধাও হয় না। যশোদার মতো এত সুবিচারক কোর্টের উকিলরা খুব কম দেখেছে। কিন্তু তাদের একটা কৌতূহল থাকেই। মুন্সিফ কি বিবাহিত? যখন জানে বিবাহিত তখন কৌতূহল স্ত্রী কেন থাকে না স্বামীর কাছে? নানা গুজব রটে। কেউ ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই, কেউ ভাবে স্ত্রী বোধ হয় অন্য পুরুষে আসক্ত। কিন্তু অবাক হয় এই ভেবে যে মুন্সিফবাবু তাহলে তো এতো খুশি থাকতে পারতেন না। সকলের মধ্যে জল্পনা কল্পনা যশোদানন্দন মুন্সিফকে নিয়ে। এই ভাবেই কেটেছে তিন বছর। মুন্সিফবাবুর স্ত্রীকে কেউ দেখেনি। বিচারক হিসেবে যশোদা একাই থেকেছে। এক সুবিচারক এক অমায়িক মানুষ। তিন বছর পর যশোদা আবার বদলি হয়েছে। ভুলে গেছে তাকে সকলেই। মনে রাখার তাগিদ থাকে না কারো। কারণও থাকে না। যশোদা যোগ দিয়েছে গিরিডিতে। বছর তিনেকের মধ্যে প্রমোশন হবে। বাইরের চেহারায় বা ব্যবহারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই নানা জনের। মাসে একবার, কোন সময়ে দেড় দুমাসে একবার দুমকা যায়। অভিমানেই হয়ত বা দু-এক দিনের বেশী থাকে না সুলোচনার কাছে। তাকে পায়ও না অনেক সময়। দুমকা আসার ইচ্ছা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মনের একটা কষ্ট আছে। যা প্রকাশ করতে চায় না। ভাবে সুলোচনা যদি মায়ের কাছেই থাকবে চিরদিন তাহলে প্রেম বা বিয়ের কী প্রয়োজন ছিল। সুলোচনার মায়ের বয়স কবে যে ছাড়িয়ে গেছে সত্তর তার কোন হিসেব রাখে না যশোদা। সুলোচনা যে তার মনের খবর রাখে না, তার নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কোন করুণা নেই মনে স্ত্রীর তা অহরহ জ্বালা দেয়। বহু মানুষের মধ্যে থেকেও একাকিত্বের জীবন। কিন্তু সবই তো সে পেতে পারত। এক সুখী পরিবার। কেন যশোদা হতে পারল না সুখী ও পরিতৃপ্ত স্বামী? কেন পারল না পেতে পিতৃত্বের গর্ব? সুলোচনার মা যদি যশোদার জীবন কালে মারা না যায় তাহলে? সে কোনদিনই আসবে না স্বামীর কাছে। কেন? অসুস্থ মার চিকিৎসা হয় সে দুমকায় নার্স বলে। আর মা তার জামাই-এর আশ্রয়ে থাকতে লজ্জা পায় সমাজের কাছে ব'লে? যশোদার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল। আর কবে সংসার হবে? মাঝে মাঝে মনে হয় এই বিয়ে বিচ্ছেদ হওয়া ভাল। কিন্তু যশোদা একজন বিচারক হয়ে কোন আইনের আশ্রয় নিতে পারে না। বিচারকের বিচার পাবার বাধা। নার্সের চাকরি সুলোচনা ছাড়বে না। মাকে একা দুমকায় কার কাছে রেখে যাবে। বিয়ের সময় তার মায়ের বয়স ছিল পঞ্চান্ন। শারীরিক অসুস্থতাও ছিল। সুলোচনার মনে হ'ত মা আর ক'দিনই বা বাঁচবে? যদি দু'তিন বছরের মধ্যে মা-মারা যায় তখন চাকরি সম্বন্ধে ভাবা যাবে। সে নার্সের কাজ করায় মায়ের চিকিৎসার জন্য খরচ কম। অন্য নানা সুবিধাও আছে। মা পুরানো দিনের মানুষ। জামাই-এর কোয়ার্টারে বাস করা, সব কিছুতেই জামাই-এর উপর নির্ভর করা কোনমতেই

সম্ভব নয়। একথা স্পষ্ট জানিয়েছে সুলোচনাকে অনেকবার। এইভাবেই কেটেছে দশ বছর। এমন একটা সময় এসেছে তার মা মাসের পর মাস শয্যাশায়ী। অসুস্থতা নিয়ে পঙ্গু। কিন্তু মৃত্যু আসেনি। অসুস্থতা বাড়ার কারণে সুলোচনার দায়িত্বও বেড়েছে মাকে দেখার। মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের কথা মনে হলেও তা পালন করতে পারে নি। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মনের দূরত্ব বেড়েছে।

যশোদা দিনের দিন মানসিক শক্তি হারিয়েছে। সুলোচনার প্রতি মনকে বিরূপ হ'তে বাধা দিতে পারেনি। অনুশোচনা মাঝে মাঝে আসে কেন সুলোচনা তার জীবনে এসেছিল। এর থেকে সারা জীবন অবিবাহিত থাকা ভাল ছিল। কষ্ট হয় যখন অন্য কোন বিচারককে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখী থাকতে দেখে। কেন এমন হ'ল তার জীবন। আদালতে যশোদা আগের মতো কারো সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে না। কোন মামলায় আগের মত মনযোগ, দিতে পারে না। বক্তৃতা শুনতে অধৈর্য হয়ে পড়ে বার বার। কারো কাছে প্রকাশ করতে পারে না মনের কথা। কখনো মনে হয় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবে নিরুদ্দেশে। কোন এক নির্জন জায়গায় কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা। সেখানে কেউ জানবে না সে একজন বিচারক। ভাবলে অবাক লাগে একসময় মুন্সেফের চাকরি হয়েছে শুনে কত আনন্দ হয়েছিল। কত কল্পনা ছিল। একদিন হাইকোর্টের বিচারক হবে। সেদিন তো ভাবেনি এক বিচারক কত অসহায়। অন্য যে কোন পেশায় বা ব্যবসায় সে দুমকায় সারাজিবন বাস করতে পারতো। অন্য যে কোন মানুষের মতো তারও একটা সংসার হ'ত। যুক্তিবাদী যশোদা যুক্তিহীন চিন্তা করে ফেলে। মা যখন চেয়েছিল তার বউ দেখে যাবে তখন বিয়ে করলে এরকমটা হ'ত না। তবে কি মায়ের অভিশাপ লেগেছে। মায়ের আত্মা কি অসুখী এক খ্রীস্টান মেয়েকে বিয়ে করায়।

যশোদা বদলি হ'য়ে এসেছে—হাজারিবাগ জেলা কোর্টে কয়েক মাসে আগে। এ এক অন্য মানুষ যেন। কাজ করতে হবে বলে কাজ করা। উকিল পেশকার কারো সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করতে পারে না। তার ওপর সকলেই বিরক্ত। কিন্তু কেউ তা প্রকাশ করে না। হঠাৎ আদালতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল যশোদা। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারেনি। পেশকার কি একটা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করে। যশোদাকে সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার আসে। পরীক্ষায় জানা যায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। জ্ঞানহীন অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। চিকিৎসা চলতে থাকে। সকলেই ভাবে তার আত্মীয়-পরিবারকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কেউ জানে না ঠিকানা। যশোদার কোয়ার্টারে যায় এক সহকর্মী। অনেক কষ্টে একটা চিঠি পায়। দুমকার ঠিকানা। সুলোচনার চিঠি। তারিখ অস্পষ্ট। কিন্তু দুমকার পোস্ট অফিসের সিল। দুমকা কোর্টে সংবাদ দেওয়া হয়। চারদিন পর এক মহিলা এসে পরিচয় দেয় তার নাম সুলোচনা। সকলেই জানতে পারে সে যশোদার স্ত্রী। সাতদিন অজ্ঞান থাকার পর যশোদার জ্ঞান ফিরল ধীরে ধীরে। সুলোচনার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার চোখ বন্ধ করল। সারাদিনটা সুলোচনা থাকে হাসপাতালে। রাত্তিরে কোয়ার্টারে যায়। জ্ঞান ফেরার কয়েকঘণ্টা পর রাত্রি তখন দুটো। লোক এল হাসপাতাল থেকে। সুলোচনাকে তখনই যেতে হবে। জরুরী। সুলোচনা হাসপাতালে পৌঁছেই শুনল যশোদা মারা গেছে দ্বিতীয় হার্ট অ্যার্টাকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সুলোচনা।

জ্ঞান যখন ফিরল সুলোচনা তখন কোয়ার্টারে। মৃতদেহ সৎকার হ'য়ে গেছে। তার একদিন পর সুলোচনা হাজারীবাগ থেকে বিদায় নিয়েছে। যশোদার যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছে। কিন্তু যশোদার লেখা ডায়েরি নিয়ে যেতে পারেনি। ডায়েরিটা পেয়েছিল জানকীপ্রসাদ।

যশোদার সহকর্মী এক বিচারক। যশোদা লিখে গেছে তার জীবন কাহিনী। তার জীবনের কথা জেনেছে অনেকেই সেই ডায়েরি থেকে। যশোদার মৃত্যুর কয়েক বছর পর আমি গিয়েছি হাজারীবাগে। রঘুনন্দন নামে এক উকিলের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হলে আমি জানতে পারি যশোদার সেই ডায়েরি আর তার জীবনের কথা। মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। এক বিচারকের অসহায় জীবন ও মন বেদনা জেনে কষ্ট পাই শুধু একটা কথাই ভাবি। সুলোচনা তো সেই আসতে পেরেছিল যশোদার কাছে। আগে কেন পারেনি। অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ফেলে কয়েকদিনের জন্য তো এসেছে। সুলোচনার কি উচিত ছিল না মাকে জোর করে নিয়ে আসা। মা যদি সত্যি মেয়েকে ভালবাসে তাহলে মেয়ের সুখের জন্য বহু পুরনো মানসিকতা ঝেড়ে ফেলা এমন কিছুই কঠিন ছিল না। সবাই ঠিক ঠিক চিন্তা না করলে দুর্ভোগ তো কারো কারো। এক বিচারক বহু মানুষকে সুবিচার দিয়েও নিজে বিচার চাইতে পারে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিকূলতায়। এটা এক নির্মম সত্য। যশোদার জীবন কাহিনী জানলে মনে আসে বার বার সেই কথা। পৃথিবীতে কত মানুষই আছে যারা বিচার পায় না।

প্রায়শ্চিত্ত

অনির্বাণের আজ সাজা হ'ল। দশ বছর জেল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাকে এভাবে বাড়ির কেউ কখনও দেখে নি। কোন মামলার রায় হলে প্রথম প্রথম মানসিক এক চাপ বোধ করতাম। কিন্তু প্রায় বিশ বছর সে রকম কোনদিন হয়নি। অপারেশনের পর বা চিকিৎসায় কোন রোগী মারা গেলে যেমন ডাক্তারের কিছু হয় না। অন্য রোগীর জন্য চিন্তা থাকে। আমাদের পরে শুরু হওয়া মামলার জন্য চিন্তা থাকে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললাম অনির্বাণের কথা। ওরা জানে না আইন পেশায় সার্থকতাও দুঃখ বয়ে আনে। পিতৃহন্তা পতিহন্তাকে যেমন ক্ষমা করতে পারে না পুত্র বা স্ত্রী, তেমনি যার সাহায্য নিয়ে সে মুক্তি পেল তাকে বোধ হয় বেশি ঘৃণা করে। তারা ভাবে শুধুমাত্র অর্থের লোভে খুনীকে বাঁচানো আমাদের পেশা। শুধু ঘৃণাই করে না হয়তো প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে। অথবা অন্য কিছু। আমি অনির্বাণের কথা বলতে শুরু করলাম। মনটা যদি হাল্কা হয়।

একদিন এক বাইশ-চব্বিশ বছরের উগ্র যুবক আমার কাছে এসে বলল—আমার বাবাকে যে খুন করেছে তাকে আপনি অর্থের জন্য মুক্ত করেছেন চরম শাস্তি ফাঁসির থেকে। সে যে প্রকৃত খুনী তা আপনি ভালই জানতেন। আপনার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতে হবে যদিও সেটাকে প্রায়শ্চিত্ত বললে কম কম বলা হয়। আমার বিধবা মায়ের চোখের জল ও আমার দুর্দশা আরো কিছু দাবি করে। আমি হতবাক। সে আবার বলল আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম অনির্বাণ। বাবার নাম স্বর্গীয় অরিন্দম। বাবাকে নিশ্চয় আপনার মনে নেই। না থাকারই কথা। অনির্বাণের দিকে হতচকিত হয়ে তাকালাম। এ অভিযোগ কেউ করে নি এতকাল। কারো মনে যে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন উঠতে পারে তা ভাবিনি কোনদিন। আমি বললাম, কী ভাবে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? সে বলল—বিনা অর্থে আমার বিরুদ্ধে যে খুনের মিথ্যা মামলা হয়েছে তা আপনাকে করতে হবে। অর্থ নিয়ে প্রকৃত দোষীকে আপনি

মুক্তি পেতে সাহায্য করেছেন। এবার সত্যিকারের নির্দোষকে সুবিচার দিতে হবে। আমি তাতে রাজি হ'লাম। তাকে যথাসাধ্য আইনি সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তার আগে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা প্রশ্ন বিগত তিরিশ বছর পেশার জীবনে তো অনেক খুনের মামলা করেছি। মনে তো থাকে না সে সব মামলা। তাই স্মৃতি হাতড়ে লাভ নেই। বললাম—তোমার বাবাকে খুন করার মামলা কখন হয়েছিল। কেই বা অভিযুক্ত ছিল তা তো মনে করতে পারছি না। তুমি তার কোন কাগজে দেখাতে পারবে? সে আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে ছিল। অনেক পুরনো সেটা। মামলার রায়। পড়তে পড়তে মনে পড়ল সব কিছু। কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না। কিছুটা যখন পড়েছি তখন অনির্বাণ বলতে শুরু করল—

'আপনাকে আমি চিনি ছেলেবেলা থেকে। মায়ের হাত ধরে আসতাম কোর্টে। তখন বিচার চলছিল। মাত্র দুমাস আগে যে মাকে দেখেছি রঙিন শাড়ি পড়ে হাসি গল্প করতে। সেই মা সাদা থানের ধুতি পড়ে বিষণ্ণ মুখ নিয়ে প্রতিদিন আসতো সুবিচারের আশায়। ঘৃণাভরে তাকাতো আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে থাকা অমল, কিঙ্কর, মধু, বিমান সাদেকের দিকে। দেখেই মুখটা ফিরিয়ে নিত। আমার তখন কতই বা বয়স। এগারো কি বারো। কিছুই বুঝি না যা দেখি বা শুনি। মাও কিছুই বুঝতো ন। শুধু মনে আছে—মা বলত দেখিস খুনীদের সাজা হবেই। কিন্তু যেদিন রায় বেরুল, খালাস হওয়ার আনন্দে অমলদের দল নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। মায়ের চোখে জল। মা তারপর থেকে প্রায় বলতো—আপনার জন্যই অপরাধীরা শাস্তি পেল না। আপনার নাম মায়ের মুখ থেকেই শুনে শুনে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই আপনাকে শুধু ঘৃণা করতেই ইচ্ছা হয়েছে। আপনি জানতেন অমলরা সত্যিকারের দোষী এবং আপনার জন্যই শাস্তি পেল না। আপনি বিজয়ের আনন্দে ও গর্বে বিভোর। আপনাকে যে ঘৃণা করতে পারে কেউ তা কোনদিন ভাবেননি। কিন্তু আমি ঘৃণা করি বলেই প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি—দয়া বা করুণা করে সাহায্য করার অনুরোধ করছি না। এক নিঃশ্বাসে কথা বলে গেল অনির্বাণ। আমার মনে রাগ হলেও প্রকাশ করতে পারছি না। অনির্বাণের যুক্তি, বুঝতে পারছি, ঠিক নয়। কিন্তু তার মনের ক্ষত স্থানটা কে তো অবহেলা করতে পারছি না। তার কথার কোন জবাব না দিয়ে মন দিলাম আদালতের সেই রায় এ। পড়তে পড়তে জানলাম খুন হওয়া সেই অরিন্দম যাকে আমি চিনতাম অনেক দিন আগে থেকে। অনির্বাণ যে তারই ছেলে এটা জানা ছিল না। মনে ছিল না আমার চেনা মেয়ে অতসী-অরিন্দমের কোন ছেলে ছিল একে একে কত কথা মনে আসতে লাগল। শুনেছিলাম অতসী ও অরিন্দমের প্রেম, পরে পরিণয় এক সময়ে। স্কুল মাস্টার অবনীমোহন ভট্টাচার্যের মেয়ে অতসী। ছোট্ট মফঃস্বল শহরে অরিন্দম দাস অতসীকে সাইকেলের রডে বসিয়ে নিঃসংকোচে ঘোরাফেরা করত। এ নিয়ে রসালো আলোচনা হ'ত এখানে সেখানে। তারপর তাদের বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম। তারপর অতসীর কোন খবর রাখিনি। অতসীকে চোখে দেখিনি কখন পেশায় আসার কয়েক বছর পর অরিন্দমের নানা কুকীর্তি কানে আসতো। সিনেমা হলে অপারেটর না কি একটা কাজ করতো। কিন্তু মালিকের স্বার্থে বিভিন্ন অফিসারের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ রাখতে হত। এমন কি সেই সব অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য অবৈধ কাজকর্মও করতে হ'ত সিনেমা লাইসেন্স বা হলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সামাল দিতে। বিয়ের পর অতসীর প্রতি তার মোহ কেটে গিয়েছিল। থানায় ছিল তার অবাধ প্রবেশ, সেটা উনিশশো সত্তর একাত্তরে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। নকশাল আন্দোলন তখন চলেছে জোর কদমে। শ্রেণী সংগ্রাম। বন্দুকের নল, পুলিশের দালাল এসব কথা তখন লোকের কানে বাজতো সব সময়। এই রকম এক সময়ে অরিন্দম খুন হল যখন

সে রীতা মাল নামে এক মেয়ের সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে একসঙ্গে ছিল। সম্ভবতঃ সিনেমা থেকে ফিরছিল। রীতার চোখের সামনে সাত আটজন ছেলে ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল অরিন্দমের দেহটা। মৃত্যু এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর খুনের মামলা শুরু হয়। তদন্ত কি হয়েছিল পুলিশ জানে। সত্য সাধারণত তদন্তে আসতে দেখেছি খুব কম। সত্য হয়ত ভয় পায় আদালতে আসতে। সেই সত্য যা রচনা করে পুলিশ তা অনেক সময় আদৌ ঘটে না। ঘটে যা তাদের ভাষায়, তা সব সত্য নয়। তা প্রমাণিত হয়েছিল অরিন্দম খুনের মামলায়। তার সম্বন্ধে অনেক কথাই অজানা অনির্বাণের। হয়তো অতসীর পক্ষে ছেলেকে বলা সম্ভব হয়নি। শহর ছেড়ে ছেলেবেলায় অতসী ছেলেকে নিয়ে অরিন্দমের গ্রামে চলে গিয়েছিল। অনির্বাণ জানেনি তার বাবা অরিন্দম কি ছিল, পুলিশের দালাল ছিল, নকশালরা কেন তাকে খুন করেছিল। অতসী জানত তার স্বামী দুশ্চরিত্র, নারী সরবরাহ করা প্রয়োজনমতো কোন কোন অফিসারকে। কিন্তু পুলিশকে নকশালদের খবরাখবর দেওয়ার কাজটা তার জানা ছিল না। অতসী যেটা জানতো তা ছেলেকে বলা যায় না বলেই বলেনি। ছেলে যাতে তা জানতে না পারে তার জন্য দূরে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল অনির্বাণকে। পতি যেহেতু যে কোন স্ত্রীর কাছে তখন ছিল দেবতা। আমার স্বামীর চরিত্র যাই হোক তার জন্য তাকে খুন করতে হবে? উকিল হলেই কি শুধু অর্থের জন্য সব খুনীদের প্রশ্রয় দিতে হবে? অতসী সেটাই চিন্তা করত। তা নাহলে অনির্বাণ যুবক হ'য়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলত না। যার কারণে তার মা বিধবা হয়েছে এবং যার সাহায্য পেয়ে খুনী শাস্তি পায়নি উভয়েই সমদোষী অনির্বাণ ও তার মায়ের কাছে। তারা কেউ জানতো না—সত্তর একাত্তরের দশকে যারা নকশাল আন্দোলন করত তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বন্ধু বা বিশেষ কাছের মানুষের ভাইপো, ভাগ্নে অথবা ছেলে। কেউ কেউ আমার নিজের কোন আত্মীয়কে তাদের দলে 'নিয়ে আমার মতো' অনেকের কাছে আইনি সাহায্য পেত। অর্থের কোন প্রশ্নই থাকতো না। অতসী ও অনির্বাণের তা জানার কথা নয় যে অমল, কিঙ্করেরা ও কোন পারিশ্রমিক দেয়নি আমাকে। কিন্তু ওদের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তনের চেষ্টা বাতুলতা। ভেবেছি, থাক, ওরা ওদের উকিলের সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে। অনির্বাণ সন্তুষ্ট থাক রীতা তার মাসি জেনে। আমার যা মনে পড়ল তা ওকে বলে কোন লাভ নেই। রীতা খুনের ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল সে। সাক্ষ্য দেবার সময় নিজেকে সতী-সাবিত্রী প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল তার। ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল অমল নাকি তাকে অবৈধ সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখান পায়। অরিন্দম তার জামাইবাবু। তার পদবী যে মাল তা অস্বীকার করেছিল।

নিজেকে রীতা দাস পরিচয় দিয়েছিল। তাকে জেরা করতেই তা মিথ্যা প্রমাণ হয়। সে অতসীকে কাকার মেয়ে বলে যখন নিজে তার বোন সাজে তখন তার খেয়াল ছিল না অতসীর আগে ছিল ভট্টাচার্য পদবী। আর একটা রহস্য থেকে গিয়েছিল। পুলিশ আধঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং মৃতদেহ দেখে ও রক্তমাখা মাটি সংগ্রহ করে। রীতা বলেছিল সে তখন উপস্থিত ছিল। থানার বড়বাবু মৃতদেহ ও রীতাকে ঘটনাস্থলেই দেখতে পান। তবুও তিনি থানায় ফিরে এসে নিজে প্রথম এত্তেলা বা এফ আই. আর দায়ের করেন এবং রীতার জবানবন্দি নেওয়া হয় দুদিন পর থানায়। প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছিল কেন রীতা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলেই অভিযোগ আনেনি। কোন কথা সে বলেনি তখন। তাহলে থানার বড়বাবু অভিযুক্তদের নাম পেলেন কার কাছে। সব থেকে বড় কথা অমলদেরকে আরো কিছু মামলায় বড়বাবু জড়িত করেছিলেন নকশাল হিসেবে এবং অফিস, স্কুল লাইব্রেরী

পোড়ানো ইত্যাদি অভিযোগে। বড়বাবুর স্মরণ ছিল না অভিযুক্ত মধু বিমল ও সাদেক ঘটনার দিন অন্য মামলায় জেলে ছিল। সেই আন্দোলনের সময় পুলিশের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাদের নাম নকশাল হিসেবে চিহ্নিত তাদের নানা পুরনো মামলায় আটকে রাখা আন্দোলন যাতে দমন হয়। তদন্ত ছিল গৌণ। তদন্ত ঠিক হতোও না। স্বাভাবিক কারণেই সে মামলা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। আমার যা কৃতিত্ব তা জেরার মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করা। তদন্তের ত্রুটি ও সাক্ষীদের পরস্পর বিরোধী জবানবন্দিকে অবিশ্বাসের হেতু ও বুনিয়াদ করা। আমাকে দোষী করার মতো কোন অপরাধ তো আমি করিনি। কোন অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে গেলে প্রমাণ পরীক্ষার একটা দায়িত্ব থাকে। সে পরীক্ষায় সহায়তা করা আমার পেশার দায়িত্ব। একথা অনির্বাণকে বোঝান যায় না। সেটা সম্ভব যদি বিনা পারিশ্রমিকে অনির্বাণের জন্য কর্তব্য পালন করে তার উপলব্ধি আনা যায়। তারই চেষ্টা করেছিলাম যথাসাধ্য। তার ফল যা হয়েছিল সেটা অন্তত আমার কাছে সুখের ছিল না। অনির্বাণ বলেছিল যে তাকে নিয়ে অতসী বসুধা গ্রামে এসে পাকাপাকি ভাবে বাস করতে শুরু করে। কিছু জমিজমা ভরসা আর কিছুটা কারো কারো সাহায্য। ছেলেকে অতি কষ্টে মানুষ করেছে। স্কুলে ফ্রিতে পড়া ও ফল ভাল করার কারণে অনির্বাণের কাছাকাছি কলেজে ভর্তি হতে অসুবিধা হয়নি। দু'চারটে ছেলে পড়িয়ে কিছু আয় তখন। অরিন্দমের তিন ভাই ও অরিন্দমের এজমালি সম্পত্তি। নিজের হালে যতদিন চাষ হয়েছে কোন কিছু অসুবিধা হয় নি। কিন্তু অরিন্দমের ভাইপোরা লেখাপড়া শেখেনি। পড়েছে ক্লাস সেভেন বা এইট পর্যন্ত কিন্তু যত কিছু যন্ত্রণার শুরু অনির্বাণ কলেজে পড়ার সময় থেকে। তার জেঠতুতো খুড়তুতো ভায়েরা অবলম্বন হিসেবে রাজনীতি শুরু করে। গ্রামাঞ্চলে তখন বর্গা রেকর্ড করার রাজনীতি। নিজেদের সম্পত্তিতে বর্গাদার যাতে কেউ হতে না পারে তার জন্য মিটিং মিছিল করে পার্টিকে সন্তুষ্ট করা আর অরিন্দমের জমিতে নতুন কাউকে বর্গাদারের রেকর্ড করা। এটাই তাদের প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। এর ওপর অতসী যাতে জমির ফসলের কোন ভাগ না পায় তার জন্য বর্গাদারকে উস্কানী দেওয়া তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। পার্টির তরফ থেকে প্রথম চেষ্টা ছিল অনির্বাণকে দলে আনা। সেটা ব্যর্থ হ'লে পার্টির মদত পায় সেই ভায়েরা। পশ্চিমবাংলায় জমিদারী প্রথা লুপ্ত হ'লেও অত্যাচার ও অনাচারের খুদে বহু জমিদারের জন্ম হয় তখন। তারা প্রশ্রয় পায় একটা মাত্র দিনের জন্য। শহরে কোন জনসভা হ'লে হাজার হাজার মানুষের মিছিল করে সমাবেশ করানোর গুরুদায়িত্ব নেয় তারা। রাজধানীর নেতা খুশি, শহরের কমিটি খুশি। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি, পঞ্চায়েতে চাকরি, ঠিকাদারের কাছে কাজ, এসব করে কাঁচা পয়সা আসে। জোর করে একটা ছেলের সঙ্গে মেয়ের মন্দিরে বিয়ে দেওয়া বা না দেওয়ার মধ্যে, বর্গাদার রেকর্ড না করতে দেওয়ার মধ্যে আয় উপার্জনের সংস্থান। অত্যাচারিত জমির মালিক জলের দামে তাদেরই কাউকে জমি বিক্রি করে শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেখানে অন্তত জমি নিয়ে কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই। এইভাবে এ গ্রাম সে গ্রামের কিছু করিৎকর্মা যুবক খুদে জমিদার হয়, পাকাবাড়ি তৈরি করে, মোটর সাইকেল কেনে। কাঁধে শুধু একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে যাত্রা শুরু করে বেশি বছর লাগে না খুদে জমিদার হ'তে। ওপর তলার পার্টি তা দেখেও দেখে না। এই রকমই এক খুদে জমিদার হয়েছিল অনির্বাণের কাকার ছেলে শৈলেন। থানা পুলিশ তার কথা শোনে। কোন মামলায় কাকে আসামী করতে হবে সেখানেও শৈলেনদের মতো ছেলেদের হাত। বৃটিশ যুগ থেকে পুলিশ চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য শাসক তোষণ। কিছু ব্যতিক্রম আছে। অনির্বাণের দুর্ভাগ্য হয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। অরিন্দম ছিল নকশালদলের

শিকার, অনির্বাণ কোন না কোন দক্ষিণ বা বামপন্থীর। পুলিশ ছিল অরিন্দমের ঘাতকের পক্ষে এবং শাসকশ্রেণীর স্নেহছায়ায়। অনির্বাণের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। প্রকৃত ঘাতককে পর্দার আড়ালে রেখে অনির্বাণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করেছিল। শাসকশ্রেণীকে তুষ্ট রাখার হাতিয়ার ছিল তা। এ বিষয়ের পুলিশের একটা বড় সুবিধা ছিল। গ্রামের মানুষ খুদে জমিদারের ভয়ে সত্য বলার সাহস তো রাখতোই না, উল্টো মিথ্যা বলতে দ্বিধা করত না।

একদিন শৈলেন অতসীকে খুব শাসালো—গ্রাম ছেড়ে অনির্বাণকে নিয়ে চলে যেতে হবে। অতসী প্রতিবাদ করতে গেলে শৈলেন তাকে মারতে যায়। কিন্তু তার সঙ্গের ছেলেরা শৈলেনকে ধরে ফেলে। অনির্বাণ সেই সময় বাড়ি আসে। শৈলেনকে বলে—দাদা, তুমি শেষ পর্যন্ত মাকে মারতে সাহস পেলে? শৈলেন মুখে কোন জবাব না দিয়ে অনির্বাণকে ধরে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অতসী ছুটে আসে ছেলেকে বাঁচাতে। শৈলেন তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। অতসীর মাথা ফেটে যায় ঘরের দরজার চৌকাঠে পড়ে। রক্ত ঝরতে থাকে। রক্তের বন্যা দেখে শৈলেনরা পালায়। থানায় গিয়ে ডায়েরি করে নিজেদের মনোমত। অতসীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকদিন পর তার মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু ডাক্তারীমতে দুর্ঘটনা-জনিত যে দুর্ঘটনার কথা শৈলেন থানায় জানিয়েছিল। কোন মামলার অবকাশ ছিল না। আদালতের প্রমাণ প্রয়োজন। সে প্রমাণ আনবার শক্তি ও সামর্থ্য অনির্বাণের ছিল না। সে এখন পৃথিবীতে একা।

কয়েকমাস পর অনির্বাণের প্রতিবেশী প্রভার অস্বাভাবিক মৃত্যু হ'ল। মামলা হ'ল আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার। অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হতে হল অনিবার্ণকে। অভিযোগ অনির্বাণ প্রভার সঙ্গে প্রেমের নাটক করেছে। তার সঙ্গে দেহগত সম্পর্ক করেছে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তারপর সে যখন বিয়ে করতে অস্বীকার করে প্রভা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনির্বাণের লেখা দুলাইনের একটা চিঠি আর প্রভার সুইসাডাল নোট প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল পুলিশ। কয়েকজন চাক্ষুষ সাক্ষীর জবানবন্দিতে ছিল তারা নাকি আত্মহত্যার দুঘণ্টা আগে প্রভা ও অনির্বাণের মধ্যে ঝগড়া দেখেছে বিয়ে করতে অস্বীকার করার পরপর? অনির্বাণ নাকি বলেছিল—প্রভা ইচ্ছা করলে বিষ খেয়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। ডাক্তার মত দিয়েছিল আত্মহত্যা মৃত্যুর কারণ। অনির্বাণের কাছে জানতে চেয়েছিলাম প্রকৃত সত্যটা কী? অনির্বাণ বলেছিল—বিশ্বাস করুন আমি নির্দোষ। সব প্রমাণ সাজানো। প্রভা আমাকে ভালবাসতো এটা ঠিক। মা ছেলেবেলায় কথা দিয়েছিল প্রভার মা বিভাবতীকে। প্রভার তখন বয়স সাত কি আট। প্রভার বাবা খুব সাহায্য করেছিল মাকে। নিয়ে আমার মতো এগারো বারো বছরের ছেলেকে নিয়ে সদ্য বিধবা আমার মা সে সময় ছিল বড়ই অসহায়। ভাসুর দেওররা অত সহজে মাকে গ্রামে আশ্রয় দিত না। প্রভার বাবা গ্রামের একজন মাথা ছিলেন। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি ও প্রভা শুনে আসছি আমাদের বিয়ের কথা। দুজনের মনেই একটা আসক্তি ছিল সেটা প্রেমেও পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা শেষ করে একটা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত বিয়েটা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। গ্রামে প্রভার সঙ্গে মেলামেশা করার অনেক অসুবিধা। চিঠিপত্র দু'একটা আদান-প্রদান ছাড়া প্রেমের আর কোন প্রকাশ ছিল না। বিয়ে সম্ভব নয় লিখেছিলাম এটা ঠিক। কিন্তু চিরকালে সম্ভব নয় লিখিনি। তখনকার পরিস্থিতিতে সম্ভব নয় এই অর্থে চিঠি লিখেছিলাম। সত্যি বলতে কি প্রভা আদৌ আত্মহত্যা করেনি। শৈলেনের কু নজর ছিল বরাবর। সেও জানতো আমার মায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। শৈলেন প্রায়ই প্রভাকে উত্যক্ত করতো। একদিন সন্ধ্যায় শৈলেন প্রভার

কুঁড়েঘরে আসে। বিধবা মা তখন মন্দিরে আরতি দেখতে গেছে। সেই সুযোগ নিয়ে শৈলেন বলাৎকার করে প্রভার ওপর। আশেপাশের কয়েকজন শৈলেনকে কুঁড়েতে ঢুকতে দেখেছিল। কিছুক্ষণ পর তারা প্রভার চিৎকার শুনেছিল এবং শৈলেন বেরিয়ে যাবার পর কুঁড়েঘরটা আগুনে পুড়তে দেখেছিল। তারা সে আগুন নেভাতে জল ঢেলেছিল। কিন্তু প্রভার প্রাণ বাঁচাতে পারে নি। দগ্ধ মৃতদেহ বের করেছে। শৈলেন থানায় গিয়ে আত্মহত্যার গল্প তৈরি করে। পুলিশ গ্রামে এসে তদন্ত করেছিল। দু'এক জন প্রকৃত সত্য বলেছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের জবানবন্দি লেখেনি। শৈলেনের করায়ত্তের কিছু লোকের মিথ্যা জবানবন্দি লিখেছিল। কেরোসিন তেল আর দেশলাই বাক্স ও কাঠি উদ্ধারের মিথ্যা কাগজ তৈরি করে। মামলা আত্মহত্যার সাজিয়ে শৈলেনকে বাঁচিয়ে আমাকে অভিযুক্ত করেছে। দারোগা তিরিশ দিনের মাথায় তদন্ত শেষ করেছে। পুরস্কারও পেয়েছে দারোগা। বিহার সীমান্তে থানায় বদলির আদেশ পেয়েছে যেখানে অবাধে অর্থ আয় করা সম্ভব হয়েছে।

আমি ধৈর্যধরে শুনেছি অনির্বাণের কথা। বিশ্বাসও করেছি। আটের দশকে শৈলেনের থেকেও হিংস্র পশুকে দেখেছি। শুধুমাত্র ধর্মের বিরোধে পাঁচভাই ও তাদের চার বন্ধুকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে দেখেছি। মাটির ঘর। খড়ের চাল। তার মধ্যে ছিল তারা। বাইরে থেকে শেকল টেনে আগুন দিয়েছে তারা খড়ের চালে। তারপর দরজা খুলেছে এক জন করে বের হওয়া প্রত্যেককে খুন করেছে ধারাল অস্ত্র দিয়ে। অভিযুক্তরা কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় ছিল না। পুলিশ যথাযথ তদন্ত করেছে। তবে অর্থের বিনিময়ে কাউকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। পুলিশের দাবি না মেটাতে পারায় কিছু নিরীহ নির্দোষ অভিযুক্ত হয়েছে। আবার শৈলেনের মতো অনেককে দেখেছি শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তিতে অপরাধী হলেও গায়ে কোন আঁচড় লাগেনি। তাই অনির্বাণকে আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু প্রমাণ যাঁরা আনেন বা আনেন না তাঁদের ওপর নির্ভর করেই অপরাধের বিচার হয়। অনির্বাণেরও বিচার হয়েছিল। কিন্তু এত অসহায় নিজেকে মনে হয় নি যখন প্রথম এই পেশায় আসি। সত্য ও মিথ্যা চিরকালই মিলে মিশে একাকার হয়ে আসে আদালতে। আমরা চেষ্টা করি সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে বিচার করার। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবে যখন মামলার সৌধ নির্মাণ হয় সেই মামলায় নিজেকে খুব অসহায় লাগে। আপাতদৃষ্টিতে কোন পুলিশকেই অবিশ্বাস করার হেতু নেই। কিন্তু তাদের ওপর আমাদের সে বিশ্বাস তার যদি কেউ কেউ অমর্যাদা করে, সত্যের কণ্ঠ রোধ করে মিথ্যার বেসাতি করে, আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। যে সাক্ষী সত্য কথা বলে তার চেয়েও ভয় করি শপথ নিয়ে যে সাক্ষী ভাল মিথ্যা বলতে পারে।

অনির্বাণের বিচারে সফল হতে পারিনি। বিনা পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করেছি অক্লান্ত। তার মনে যেন না হয় নতুন করে যে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি যা করিনি অমলদের ক্ষেত্রে। কিন্তু পরাভূত সৈনিক আমি। ঘটনার দিনের তারিখ দিয়ে সে জবানবন্দি লেখা হয় সাক্ষীর তার মূল্য এই বিচার ব্যবস্থায় অনেক বেশি। প্রমাণ করা কঠিন তারিখটা আদৌ ঠিক নয়। একমাস পরও জবানবন্দি লিখে আগের তারিখ দেওয়ার সুযোগ আছে। সাদা কাগজে লেখা হয়। বদলানো কোন কঠিন কাজ নয়। মিথ্যা লিখলেও অবিশ্বাস করার সুযোগ নেই। পুলিশ ইচ্ছা করে যে প্রমাণ আনেনি তা আনা বিচারকালে সম্ভব হয় না কোন ক্ষেত্রেই। আনা গেলেও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। অনির্বাণের মামলায় এটা আমার চরম উপলব্ধি।

অনির্বাণের সাজা হ'ল। তাকে কাঠগড়া থেকে যখন নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, আমার দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তার চোখের ভাষা আমি পড়তে চেষ্টা করলাম। সে যেন

বলছে—আমি বিশ্বাস করি না আপনি কর্তব্য করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পেয়েও আপনি করলেন না। তার দৃষ্টিতে যেন ঘৃণা আমার প্রতি। সে যেন বিশ্বাস করে না অমলদের মতো তার পিতৃহন্তা আমার সাহায্য পায় আর তার মতো নির্দোষকে সাহায্য করতে পারি না।

কোর্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিধবা। স্বপ্ন যেন অতসী। কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মুহূর্তের জন্য ভুলে যাই আমার পেশাকে। আমার মধ্যে যে মানুষ আছে সে কাঁদছে। এই বিধবা স্বামীর খুনের মামলায় এসেছে বিচার পাবার কত আশা নিয়ে। তারপর আশা হত হয়েছে। বেশ কয়েকবছর পর আবার এসেছে নতুন করে আশা নিয়ে। কিন্তু কি দিতে পারলাম! এটা কি আমার প্রায়শ্চিত্তেও ব্যর্থতা?

কোশল্লা হেমরম

কোন বিচারক রায় দেবার সময় মুক্তির আদেশ দিয়ে কোন মানবিক পদক্ষেপ নেবার যখন অনুরোধ করেন তখন বিচিত্র এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। কোশল্লা হেমরম মামলায়। কোশল্লা থানায় অভিযোগ করেছিল তার প্রেমিক মণীন্দ্র টুডুর নামে। কোশল্লা বলেছিল মণীন্দ্র ও তার মধ্যে তিন বছর ভাবভালবাসা ছিল। মণীন্দ্র চাকরি করতো কল্যাণীতে। কথাছিল কোশল্লা মাধ্যমিক পাস করলে তাদের বিয়ে হবে। সাওতাল সমাজ প্রেম ভালবাসার ব্যাপারটা জানতো। কেউ কোন বাধা তো দেয়ইনি বরং সকলেই মনে মনে চেয়েছিল ওদের বিয়ে হোক, সুখী হোক। কোশল্লার বয়স, প্রেম শুরু হওয়ার সময় ষোল সতেরো হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার সময় বয়স হয়েছিল উনিশ। কোশল্লা ও মণীন্দ্র পরীক্ষার পর বিয়ে রেজিস্ট্রি করবে চাকরিস্থল কল্যাণীতে এই ইচ্ছা নিয়ে একদিন চলে যায় গ্রাম থেকে। কোশল্লার বাবা ও মায়ের তাতে কোন আপত্তি ছিল না। শহরে দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতে থাকে স্বেচ্ছায়।

প্রায় পনেরো-ষোলদিন পর গ্রাম থেকে কয়েকজন শহরে যায়। তাদের দুজনকে বলে গ্রামে যেতে। সামাজিক বিয়ে দেবে। তাদেরকে সরল মনে বিশ্বাস ক'রে মণীন্দ্র ও কোশল্লা গ্রামে ফিরে আসে। তারপর গ্রামের লোকের প্ররোচনায় মণীন্দ্র শহরে চাকরির জায়গায় চলে যায়। কোশল্লার আর বিয়ে হয় না। একমাস পরে থানায় কোশল্লা মামলা দায়ের করে। তদন্তের পর সে বিচারের জন্য আসে।

সাবালিকা কেউ স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের সাথে সহবাস করলে এবং বিয়ের ইচ্ছা থাকলে ভবিষ্যতে কোন কারণে বিয়ে না হ'লে আইনত কোন অপরাধ হয় না। বিচারক সেই পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য নেবার আগেই অপরাধীকে মুক্তি দিতেই আইনত বাধ্য। কিন্তু মানবিক তাগিদে সেই বিচারক আমাকে অনুরোধ করলেন মণীন্দ্র ও কোশল্লার যাতে বিয়ে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করতে। অভিযুক্তকেও বললেন একই কথা। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিয়ে না করা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে মামলা হয়েছে। আবার তাদের বিয়ে দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। স্ত্রী তখন কাঠগড়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কিন্তু এবারকার ঘটনা একটু

আলাদা। কোশল্লার অভিযোগে মণীন্দ্র ও তার কয়েকজন আত্মীয় হাজতবাস করেছে। হয়রান ও খরচান্ত হয়ে আইনের কূটতর্কের ফলে মুক্তি পেয়েছে। এই অবস্থায় রাজি করানো বিয়েতে খুবই কঠিন। তবুও চেষ্টা করতে হবে। তাই আমি বললাম—তোমরা মুক্তি পেয়েছো ঠিক। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন হ'লে তোমাদের খরচ যেমন হাজার হাজার টাকা তেমনি বেশ কিছু বছর ভোগান্তি হবে। তার থেকে একদিন দু'পক্ষই আলোচনায় বসি। তোমাদের গ্রামের যারা মোড়ল তাদেরকেও ডাকতে হবে। আমার কথায় তারা রাজি হ'ল। আমি নির্ধারিত দিনে অন্য এক গ্রামের সাঁওতাল দু'চার জন মোড়লকেও আসতে বললাম।

এক ছুটির দিন বসলাম আলোচনায়। মেয়ে পক্ষের মাত্র একজন এসেছে। সেও কোন কথা বলে না। শুধু শুনে যায়। ঠিক শোনে বা বোঝে কিনা বলা যায় না। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে থাকে। মণীন্দ্রও আসেনি। তার এক কাকা এসেছে। কিন্তু তার গ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের ছয় সাতজন এসেছে। তবুও আলোচনা অর্থহীন জেনেও শুরু করলাম। কিছুটা তো এগুনো যাক। প্রশ্ন একটাই মণীন্দ্র ও কোশল্লার এখন বিয়ে হ'তে বাধা কোথায়? সাঁওতাল সমাজ এ নিয়ে কি চিন্তা করে সেটা জানার আগ্রহ বা কৌতূহল আমার প্রথম থেকেই। অন্য গ্রামের এক মোড়ল বুধন সর্দারকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের সমাজে ভালবাসা ক'রে বিয়ে হয়? বুধন বলল—ভালবাসা থাকলেও মেয়ের বাবাকে প্রস্তাব দিতে হবে ছেলের বাপকে। প্রস্তাব দেবার আগে সমাজের মাথা মানঝি হারামকে জানাতে হবে। ঠিক হবে কতগুলো হাঁড়িয়া অর্থাৎ মদের হাঁড়ি দিতে হবে মেয়ের বাপকে। ছেলের বাপ বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিলে তাকেও একদিন গ্রামের সকলকে হাঁড়িয়া খাওয়াতে হবে। কারো দারিদ্র্য থাকলে মোড়লরা মত দিতে পারে যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সেই খাওয়াবে। অবাক লাগছিল আমার এসব কথা শুনে। এটাও জানালাম সব ক্ষেত্রে এরকম নিয়ম নেই। সেদিনের বৈঠক শেষ হ'ল। মণীন্দ্র-কৌশল্লার গ্রামের মোড়লরা আমাকে অনুরোধ করল তাদের গ্রামে যেতে বান্দনা পরবে। অনুরোধ আমাকে রাখতেই হয়েছিল তাদের আন্তরিক নিমন্ত্রণের জন্যও মণীন্দ্র ও কৌশল্লার বিয়ের চেষ্টার জন্যেও।

বড়ডিহা মাঝি পাড়া যদিও পশ্চিমবাংলায় কিন্তু বিহারের সাঁওতাল পরগণা এলাকা শুরু হচ্ছে পঞ্চাশ হাত দূরে। সেখানকার আচার ব্যবহার, বসবাসের ঘর সবই বিহারের ধাঁচে। মাঝিপাড়ার কুঁড়ে ঘরগুলোর এক বৈশিষ্ট্য আছে। মাটির দেওয়াল—খড়ের চালা। কিন্তু এক অপরূপ সৌন্দর্য আছে। কত কারুকাজ মাটির দেওয়ালের গায়ে। বাইরের দিকটা একরকম। মাটি থেকে তিন চার হাত উঁচু দেওয়ালের অংশে প্রলেপ দেওয়া রঙিন মাটি। তার ওপরটা হলুদ সাধারণ মাটি দিয়ে এক অসাধারণ রূপ দিয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝে। কুঁড়ের সামনে ছোট্ট উঠোন। উঠোনে দু'চার রকম ফুল যেমন আছে তেমনি সবজি। এই রকম একটা কুঁড়েঘরের সামনে উঠোনে আমাকে বসতে দিয়েছিল। বান্দনা উপলক্ষে সাঁওতাল মেয়েরা পাশাপাশি হাত ধরে নাচবে পুরুষদের মাদলের সঙ্গে। মাঝে মাঝে মেয়ে পুরুষ সকলেই হাঁড়িয়া খাবে। মিটিং হাঁসদা আমাকে আপ্যায়ন করার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করল। রাণী বহাল থেকে মিষ্টি এনেছে। ওদের জলখাবার মুড়ি শহরের বাবু যদি খেতে না চায় এই ভেবে। তারপর আমাকে নিয়ে গেছে একটা বিরাট বটগাছতলায়। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে নাচ গান করে চলেছে। বেশ লাগছে ওদের মধ্যে থেকে। কয়েকজন যুবক সাঁওতাল নেশার ঘোরে আমার কাছে এসে পীড়াপীড়ি করছে হাড়িয়া খাবার জন্য। কয়েকজন বৃদ্ধ তাদের নিষেধ করছে। দুজোড়া সাঁওতাল যুবক যুবতী আমার হাত ধ'রে টেনে তাদের

সঙ্গে নাচবার জন্য নিয়ে গেল। বৃদ্ধরা চুপ থেকে তাদের সমর্থন করল। সকলে আনন্দ পাবে চিন্তা করে তাদের সঙ্গে নাচতে শুরু করলাম। কোন দুশ্চিন্তা নেই, শহরের কোন চেনা মানুষ তা দেখছে না আমাকে এই অবস্থায়।

সাঁওতালদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা মাতাল হয় না অনেকটা হাড়িয়া খাওয়ার পরও। কেউ কেউ আবার মাতাল হ'য়ে শুয়ে পড়ে। সাঁওতাল মেয়েছেলে বান্দনা পরবে হৈ হুল্লোর করতে করতে মত্ত অবস্থায় জড়াজড়ি করে নাচেও। দেখলে মনে হবে যেন আদিম যুগের পুরুষ ও নারী গভীর প্রেম উন্মাদনায় নির্লজ্জ। সকলের সামনেই যেন যৌন খেলায় মত্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশও যেন তাদের সহায়। শহর থেকে বেশ দূরে উঁচু পাহাড়ের নীচে সেই মাঝি পাড়া বান্দনা পরবের সময় মনে হয় শহরের সভ্যতা এখনো সেখানে পৌঁছয়নি। আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে একবার কোন একটা পরবের সময় গিয়েছিলাম। তখন সাঁওতাল সমাজে শহুরে সভ্যতার ও টেলিভিসনের কোন প্রভাব পড়েনি। হিন্দি সিনেমা ছিল অজানা। সাঁওতাল মেয়েরা ধানকলে কি পাথরে খাদানে কাজ করতে যেতো না। পুরুষরা মাঠে চাষ করতো, মেয়েরা জঙ্গল থেকে কাঠ আনতো, ঘাস তুলে বিক্রি করতো গ্রামের জোতদারদের গরুর খাবার জন্য। সকলের মুখে ছিল সরলতা। মিথ্যা বলতো না কেউ। মনে ছিল না কোন প্যাঁচ। তাদের জন্য সরকার এক আইন করেছিল। সাঁওতালদের সম্পত্তি বিক্রি করতে সরকারের নিযুক্ত এক অফিসারের অনুমতি নিতে হ'ত। তাদের কাছে কোন রাজনৈতিক দল ভোট চাইতে গেলে তারা মুখের সামনে বলে দিত মনের কথা। তখনকার সময় যে সাঁওতাল সমাজ দেখেছি তা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু বান্দনা পরব তখন যা জানতাম সামান্য দেখে আর কিছুটা শুনে, সেদিনও দেখলাম কোন পরিবর্তন হয়নি। পৌষ সংক্রান্তির সময় পাঁচদিন ধরে সেই পরব আজও আছে। এই পাঁচটা দিন সাঁওতাল মেয়েপুরুষ ভুলে যায় তাদের অন্য জীবন সভ্যতা যা দিয়েছে। তারা ফিরে যায় তাদের পুরনো প্রথা আচার বিধি ও জীবন যাত্রায়। সেদিন একথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল। সারাদিন তাদের মধ্যে কাটিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দ পেলাম। তারা আমাকে তাদেরই একজন ব'লে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে। বারবার অনুরোধ করেছে সময় সুযোগ পেলেই যেন তাদের গ্রামে আসি। আমিও অনুরোধ করেছি মণীন্দ্র ও কোশল্লার বিয়ে দিতে সাহায্য করতে হবে। কারণ এক সুবিচারককে আমি কথা দিয়েছি। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি বিদায় নিয়েছি। পনেরদিন পর যে রবিবার সেদিন সকলকে আসতে বলেছি আমার কাছে।

একদিনের সেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলো আমার নিজের জীবনেও হয়তো প্রয়োজন ছিল। বিগত চল্লিশ বছর আইন পেশায় থেকে শেষ পাঁচ-সাত-বছর এক হতাশায় ভুগছি। আইন আদালতকে জানা শুরু হ'য়েছে সেই চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকে। ছাত্রাবস্থায়। কারণ আমার জন্ম এমন এক পরিবারে যেখানে দুজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীকে পেয়েছি যাঁরা আমার কাছে আদর্শ। এই পেশায় যখন এসেছি প্রায় চল্লিশ. বছর আগে তখন তা ছিল বিচার ব্যবস্থার স্বর্ণযুগ। চারপাশে আদর্শ বিচারক ও আইনজীবী। তাঁদের না দেখলে হয়তো এই পেশায় থাকতাম না। স্বাধীনতার পর পর সমাজের চিত্রটা কলুষতাহীন ছিল প্রায় পনের বছর। মূল্যবোধ ছিল, শিক্ষা ছিল, সবার ওপর চরিত্র ছিল। মানুষের সামনে ছিল আদর্শ। ন্যায় ও নীতি ছিল পালন করার দায়বদ্ধতা। সৎ হ'য়ে জীবন কাটানো ছিল প্রায় সকলের কামনা বাসনা। কারণ সৎ জীবন যাপন কোন অসাধ্যসাধন ছিল না। জীবিকার প্রয়োজনে অর্থের ভূমিকা ছিল না এতটা প্রবল। জ্ঞানের প্রতিযোগিতা করতে কোন বাধা ছিল না। প্রতিদিন জ্ঞানার্জন করার

নিষ্ঠা ছিল। কারণ সংসার নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ব্যয় ছিল উপার্জনের থেকে বহু কম। জীবন ধারণের কোন গ্লানি ছিল না। কিন্তু অবক্ষয় যে শুরু হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারিনি বহু বছর। এক টাকায় যা ষোলটা কিনতে পারা যেত তার একটা কিনতে যখন এক টাকা বা দুই, তিন পাঁচ টাকা খরচ করতে বাধ্য হতে হ'ল তখনই পেছন ফিরে তাকাতে গেলাম। যত পেছনে তাকাই ততই হতাশা বাড়ে। মূল্যায়ন করতে যাই। কী কী করা উচিত ছিল। কী না করা। সেটা করতে গিয়ে হতাশা বাড়তে থাকে মনের মধ্যে। কিন্তু মানুষ জন্তুর থেকে সভ্য। তাই হতাশা কারোকে দেখানো চলে না। বাইরের মুখোশ রাখতে হয় সুখী পুরুষের। কারণ সকলের হাতেই আছে নুন আমার রক্তাক্ত জখমে তা দেবার জন্য। সমাজটা আজ পৌঁছেছে সেখানেই। কে তার জন্য দায়ী। কেন এমন হ'ল এসব ভাবতে গিয়েও হতাশা। এই হতাশার মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপা হয়ে এসেছে মণীন্দ্রের মামলা, এক বিচারককে পেয়েছি। সাঁওতাল সমাজে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। সেটা একদিনের বা বারো ঘণ্টার। তবুও তার মূল্য আমার কাছে অনেক। সেই সময়টা শুধু হতাশা থেকে মুক্তিই নয়। জীবনকে নতুনভাবে দেখার প্রেরণা। মানুষের কল্যাণের বাসনা। সে সেভাবেই বাঁচুক, আমি অন্যভাবে বাঁচব তার কামনা। সেদিনের সদ্য পরিচিত বুধন টুডু, মঙ্গল হাঁসদা, রাজু কিস্কু, মন হেমরম ও আরো কিছু মানুষ আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়েছিল। আমার নেমতন্ন পাকা হ'য়ে গেল সিকদার পরব, দাঁসাই পরব, মারাং বুরুর পুজোয়।

তারপর বড়ডিহা মাঝিপাড়া গিয়েছি নানা পরবে। তাদের জীবন তাদের ধর্ম, অনুষ্ঠান, চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সেই গাঁয়ের বাঁধা পুরোহিতকে তারা বলে নাইকি হারাম। তার কাজ সব পরবেই। সব বিয়েতে পুরোহিত সে। সাধারণত বিয়ে হয় ঘটকের মাধ্যমে। এমন কি ভালবাসার বিয়েতেও ঘটক থাকবেই। পুরুষ ঘটককে ওরা বলে রাইবার হারাম। মেয়ে ঘটককে বুঢ়ী হারাম। বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে দিন ধার্য হয়। নেমন্তনের ভার যার ওপর পড়ে তাকে ওরা বলে গুডিথ হারাম। সমাজের সে বিয়ের প্রচারকও। প্রচার এবং নেমতন্ন তাকে করতে হয় প্রতি ঘরে গিয়ে। পাত্র বিয়ে করতে যাবার আগে মানঝি থানে পুজো দিয়ে যাবে। বিয়ে করে বৌ এনে প্রথম যাবে মানঝি থানে। পুজো দিয়ে তারপর যেতে পাবে নিজের বাড়িতে। ভোজে নিমন্ত্রিতদের ভাত, ডাল সব্জি ছাড়াও শুয়োরের মাংস ও হাঁড়িয়া খাবার ব্যবস্থা। মণীন্দ্র ও কোশল্লা এক গর্হিত কাজ করেছে মানঝি হারামের মতে। তারা সামাজিকভাবে বিয়ে না করে শহরে গেছে রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করতে এবং স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করেছে পনের-ষোল দিন। এটা সাঁওতাল সমাজকে অপমান। মানঝি হারামকে উপেক্ষা। নাইকি হারাম, গডিস হারাম ও রাইবার হারামকে অবজ্ঞা। মণীন্দ্র ও কোশল্লাকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। ওদের এখন বিয়ে হ'লে দুজনকেই সমাজে পতিত হ'য়ে থাকতে হবে। সাঁওতালদের প্রকৃতি হ'ল একবার কিছু সিদ্ধান্ত নিলে তার থেকে সহজে পিছু হটবে না। আমারও মনে একটা জেদ চাপলো ওদের মত বদলাতে হবে। এমনিতে ওরা অনেক সরল। যাকে ভালবাসবে বা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করবে তার জন্য প্রাণ দিয়ে দেবে। প্রথম তিনমাস এমনি কেটেছে। দু-একবার এসেছেও আমার অনুরোধে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। আমিও খুব একটা আগ্রহও দেখাইনি বাইরে। ওদের প্রকৃতি জেনে। কিন্তু উদ্দেশ্যকে ছাড়িনি। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার, ওদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করার চেষ্টা করে গেছি। অন্তরঙ্গতাই একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে সফল হতে পারি। ওদের দু-একটা বিয়েতেও যেমন গেছি, তেমনি অন্যান্য উৎসব বা পরবেও নিমন্ত্রিত হয়ে তা রক্ষা করেছি।

সিন্দরা পরবের পুজোয় একবার গেলাম। আশেপাশের সব মাঝি গ্রামের লোকেরা একটা দিন ঠিক করে জঙ্গলে শিকার করতে যাবার। সেই দিন পুজো দিয়ে পুরুষরা দল করে যায় জঙ্গলে। যাবার সময় তাদের স্ত্রীরা হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিন্দুর মুছে দেয়। তাদের স্বামীরা যেদিন ফেরে তাদের পায়ে জল দিয়ে ধুয়ে আবার সিঁথিতে সিন্দুর নেয়, নতুন শাঁখা পরে। কি বিচিত্র প্রথা। একবার শঙ্কর মাড্ডি এসে বলল—আমার নাতি হয়েছে গতরাত্রে। নিমদা বা নামকরণ হবে তিন-দিন পর। তু আয়। রবিবার ছিল। নাইকি হারাম পুজো করল। দাইবুড়ি মার হাতে বাচ্চা হয়েছে তার দায়িত্ব ভোজে নেমন্তন্ন করার। আতপ চালের গুঁড়ো আর নিমপাতা দিয়ে রান্না। মহানন্দে তাই খাচ্ছে আর বাচ্চাকে আশীর্বাদ করছে। হাড়িয়া তো আছেই।

দাঁসাই পরব শুরু হয় দুর্গাপূজার পনেরো দিন আগে থেকে বিসর্জনের পর পর্যন্ত। ছেলেরা নাচ করে চাল—ধান নেয় আর সেই দিন হয় সকলের বনভোজন। ওরা পুজো করে মারাং বড়ুর। তার কোন মূর্তি নেই। গোল একটা পাথর থাকে মানঝি থানে। যে কোন পরব বা বিয়েতে সেখনে পুজো করে নাইকি হারাম। বান্দনা পরবের আর একটা বৈশিষ্ট্য পুজোপাঠের পর প্রসাদ দেওয়া হয় সকলকে। সে প্রসাদ বাচ্চা মুরগী বলি দেওয়ার পর সেই মাংস খিচুরিতে মিশিয়ে ভোগ দেওয়ার পরব। তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উদ্দেশে পুজো দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধকে ওরা বলে ভাড়ান। শুয়োর, ভেঁড়া ও ছাগল বলি দেওয়া হয়। তারপর লোক খাওয়ানো। নাইকি হারাম আছে সবেতেই। তাদের পরব ও নানা অনুষ্ঠানে গিয়ে একদিকে আনন্দ পেয়েছি অন্যদিকে মনে কষ্টও পেয়েছি মণীন্দ্র ও কোশল্লাকে দেখে। দুজনেই পৃথক সকলের থেকে এবং নিজেদের থেকেও। বিষণ্ণ মুখ। কোন অনুষ্ঠানেই যোগ দেয় না। দূর থেকে দেখে আলাদা আলাদা ভাবে। দুজনই দুজনকে ভালবেসেছিল। সহজভাবেই। সামাজিক বিয়ে হতে পারতো। কিন্তু শহরে রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করা এবং আধুনিক জীবন যাপনের আশা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করা অপরাধ হ'য়ে দাঁড়ালো। কোন শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতার পরামর্শে কোশল্লা মামলা করে মণীন্দ্র ও তার পরিবারের সকলকে কিছুদিন জেলে রেখে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে দুজনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ল। মণীন্দ্রের এখনও কোশল্লাকে বিয়ে করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তার পরিবারের ঘোরতর আপত্তি। বাধা সমাজেরও। এর সমাধান একটা তো বের করতে হবে। সেটাই সুকঠিন। মাসের পর মাস কাটে। কিন্তু সমাধান মেলে না। দেড় বছর কেটেছে এইভাবে।

পরের বছর বান্দনায় গিয়ে সমাধান হ'ল সমস্যার এক অলৌকিকভাবে। মানঝি হারাম আমাকে খুব ভালবাসে। তাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছি আমি এতদিন। পুজোর থানে আমাকে পাশে নিয়ে বসেছে মোড়ল। কথায় কথায় তাকে বলি তোমার কাউকে ক্ষমা করার বোধ হয় শক্তি নেই। মোড়ল খানিকটা হাড়িয়া খেয়েছে। নেশাটা জমতে শুরু হয়েছে। সে বলল আমার শক্তি নেই এই সমাজে একথা বলার কারো সাহস আছে? আমি বললাম কারো সাহস নেই একথা ঠিক। কিন্তু তোমার যে শক্তি আছে তা বুঝব কী করে?

মোড়ল বলল, আমার শক্তি দেখতে চাও?

আমি বললাম নিশ্চয়ই।

সে বলল—কী করতে হবে বলো? দেখি পারি কিনা।

আমি সুযোগ বুঝে বললাম—মণীন্দ্র আর কোশল্লার বিয়ে দিয়ে দাও। একটা বড় ভোজ করার আদেশ দাও। তা যদি পার তাহলে তোমার শক্তি দেখবে সবাই। শুধু বড়ডিহা নয়।

সব মাঝি গ্রামের সাঁওতালেরা। শহরে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।

মোড়ল নেশার মধ্যেই বলে দিল—মণীন্দ্র ও কোশল্লার বিয়ে হবে এই ফাল্গুনেই। সকলে স্তম্ভিত। মোড়ল বলল যে বাধা দেবে তাকেই পতিত করা হবে। মণীন্দ্র ও কোশল্লাকে ডেকে আনা হ'ল। সকলের সঙ্গে উৎসবে শামিল করা হ'ল। নাইকি হারাম, গোডিথ হারামকে নির্দেশ দিল মোড়ল। এবারের বান্দনা পরব আমার কাছে সার্থক হ'ল। সমস্যার সমাধান পরবের খুশির মেজাজে আর হাঁড়িয়ার প্রতিক্রিয়ায় এত সহজ হয়ে গেল।

যথারীতি ফাল্গুনেই সে বিয়ে হয়ে ছিল। আমি সব কাজ ফেলে সেদিন গিয়েছি। সারা দিন থেকেছি। পরম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছি। তারপর খবর পেয়েছি বেশ কয়েকবছর তারা সুখী দম্পতি।

ধীরু মোক্তার

বরদাচরণ রায় ছিলেন ইংরেজ যুগের একজন মোক্তার। ডাক নামে পরিচিত ছিলেন ধীরু মোক্তার হিসেবে। বয়সের কারণে এবং সংক্ষেপে বলা সহজ বলে তাঁর থেকে বড় ছোট সকলেই তাঁকে বড়দা বলত। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং দেশী ডেপুটিদের কাছে কাজ করেছেন স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর আগে থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অংশ নেননি বড়দা। কারণ মোক্তারী করে রোজগারটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসি শাসনেও সমর্থক হয়েও কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেননি। ছোট পরিবার ছিল স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে সুলতাকে নিয়ে। দেরিতে বিয়ে করেছিলেন বড়দা। তখন মোক্তারী করা হয়ে গেছে বছর দশেক। শুরু করেছেন উনিশ শো ছত্রিশ সালে। সে বছর আমার জন্ম হ'য়েছিল। সে যুগে ম্যাট্রিক পাস করে প্রাইভেটে মোক্তারী পড়া যেত। বড়দা খুব সুন্দর ইংরেজি বলতে পারতেন। সেই সুবাদে দশ বছরে ভাল পশার জমেছিল। তারপর বিয়ে। তারও বছর দেড়েক বাদে সুলতার জন্ম। বড়দার নিকট কোন আত্মীয় ছিল না। জীবনে কারো কাছে কোন সাহায্য পাননি। কিন্তু মোক্তারী করে যখন প্রতিষ্ঠিত তখন অনেকে এসেছে আত্মীয় সেজে। সাহায্য চাওয়া আত্মীয়ের দল। বড়দা কারোকে বিমুখ করেননি। সেই বড়দাকে আমি যখন দেখি মোক্তার হিসেবে এবং বুঝতে পারি কি তার পেশা, আমি তখন স্কুলের ছাত্র। আমার বাবাও পেশায় মোক্তার ছিলেন। আমার স্কুল যাতায়াতের পথেই পড়ত বড়দার বাড়ি। মনে পড়ে সকাল সন্ধ্যায় গরুর গাড়ির সারি। দাঁড়িয়ে থাকতো বড়দার বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির সামনেও থাকতো অনেক গরুর গাড়ি। তবে সংখ্যায় সে তুলনায় বড়দার বাড়ির সামনে অনেক বেশি। প্রতি সন্ধ্যায় মোক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসতো যেন একটা স্কুল। আমার বাবার বৈঠকখানায় যেমন সাক্ষী শেখানোর পাঠশালা তেমনি বড়দারও। তখন চেয়ার টেবিলের বালাই ছিল না। বাবা বড়দা বা অন্য মোক্তার বসতেন চৌকিতে। গদীর ওপর চাদর পাতা। হেলান দেবার জন্য তাকিয়া। চৌকির ওপর ছোট নীচু টুল যেটা টেবিল হিসেবে ব্যবহার হ'ত। মক্কেলরা বসত সামনে লম্বা বেঞ্চিতে। বাবাকে দেখেছি রাত্রি সাড়ে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত সাক্ষীদের তালিম দিতে। কী জেরা হলে কী উত্তর হবে। মামলা প্রমাণ করতে কি অপরিসীম পরিশ্রম।

তাতেও ক'টা মামলা প্রমাণ হ'তো তা বলা কঠিন। সে যুগে এত বাস ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি হাতে গোনা কয়েকটা বাস। গাঁয়ের যাদের অবস্থা একটু ভাল তারাই মামলা করতো। আসামী হয়ে যারা আসতো তাদেরও জমিজমা না থাকা নয়। তবে জমিদার বা বড় জোতদার যখন মামলা করত তখন অধিকাংশ আসামী হ'ত গরীব। বাবাকে বা বড়দাকে, শুনেছি অনেক গরিবের মামলা করতে হ'ত। গরুর গাড়ি প্রায় প্রতিটি সচ্ছল লোকের ছিল। জমিদারের বেশি গরুর গাড়ি। যেদিন মামলার তারিখ তার আগের দিন রাত ভোরে গরুর গাড়ি নিয়ে বেরোত গ্রাম থেকে। সঙ্গে থাকত বামুন ঠাকুর রান্না করার জন্য। চাল শাক সব্জি আনা হত গ্রাম থেকে। তেল নুন মশলা ও মাছ কেনা হ'ত শহরে। সাক্ষীরা যেহেতু বাদীর হ'য়ে সাক্ষী দেবে তাই তাদের জন্য খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করতে হত। সাক্ষী দেবার জন্য কেউ তো টাকা দেবে না। বামুন ঠাকুর সাক্ষীদের সাড়ে নটায় খাবার দিতে হবে বলে ভোর থেকে রান্না শুরু করত। মোক্তারবাবুর বাড়িতে আলাদা ঘর রাখা থাকতো মক্কেলদের জন্য। রান্না করার জায়গা, স্নানঘর সব থাকতো তাদের জন্য আলাদা। যে যত বড় মোক্তার তার তত বেশি সে ব্যবস্থা। গরুগাড়ির বলদগুলোর জন্য আলাদা গোয়ালঘর। তাদেরও তিন দিনের ব্যবস্থা। একদল থাকতেই আর একদল এসে পড়ে। আর একদল যেমন যায় ভোরে, অন্য দল এসে পড়ে বিকেলে যাদের মামলা আছে কাল। বড় আশ্চর্য লাগত ছেলেবেলায়। বুঝতে পারতাম না মামলায় কি এত নেশা থাকতে পারে। আজ সে সব ইতিহাস। বিগত চল্লিশ বছরে সব কিছু বদলে গেছে। মানুষের চিন্তাও। কিন্তু সেই স্মৃতি যদি ইতিহাস করে লিখি তাহলে একটা আত্মতৃপ্তি আছে। বড়দাকে মোক্তার হিসেবে জানতে গেলে তৎকালীন সমাজ ও কোর্ট কাছারির চিত্রটাও জানতে হয়। বড়দা কিছুটা প্রতিষ্ঠা পাবার পর বিয়ে করলেন। তারপরও বছরে যে আয় করলেন তাতে নিজের বসতবাটী যেমন নতুন করে তৈরি করলেন তেমনি সেই বাড়ি সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘের মতো জমি কিনে মক্কেলদের বাসস্থান ও অন্যান্য যা ব্যবস্থা করেছিলেন শহরে সেটাই ছিল সব থেকে ভাল। কি রমরমা প্র্যাকটিশের। মক্কেলদের যেন মেলা বসে যেত বাড়ির চত্বরে। তিন কি চার জায়গায় রান্না হচ্ছে, সকাল নটা থেকে যেন বনভোজনের মতো খেতে বসেছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কিন্তু কাছাকাছি। তারপর দলবেঁধে সব কোর্টে যাচ্ছে। কোর্ট থাকলেই যেন বটগাছ থাকতে হবে। বটগাছের নিচেটা ইট সিমেন্টে বাঁধানো। চারিধারে লোক বসে আছে। হঠাৎ কোর্টের পেয়াদা হাঁক মারল—সুবল মণ্ডল হাজির হো। সঙ্গে দুই বটগাছ তলা থেকে দু'দল ছুটতে লাগলো। সে দৃশ্যও দেখেছি। আমাদের স্কুলের কাছেই ছিল ফৌজদারী কোর্ট। শুক্রবার একঘণ্টা টিফিন। চলে আসতাম বাবার মুহুরী দুর্গাদাস সরকারের কাছে। টিফিনের জন্য পয়সা নিতে যদিও স্কুলে টিফিন দিত। দূর থেকে মোক্তারবাবুদের ছোটাছুটি দেখেছি ও কোর্ট থেকে সে কোর্ট। বড়দার মক্কেল ছিল সকলের থেকে বেশি। বাবা বলতেন আচ্ছা চওড়া কপাল নিয়ে জন্মেছে বড়দা। তুঙ্গে বৃহস্পতি।' কপাল বড়দার সব দিক থেকেই ভাল ছিল। হিরন্ময়ীর মতো স্ত্রী। সুলতার মতো সুন্দর এক মেয়ে। ফুটফুটে বাচ্চা। তখন কি কেউ জানতো হিরন্ময়ী সুলতার জন্মের পর থেকে মানসিক রোগে আক্রান্ত। প্রথম প্রথম সে রোগের প্রকাশ ছিল না বিশেষ। শুধু হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাওয়া। রাগ হ'লে বক বক করা পনের-বিশ মিনিট। ডাক্তার, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ ও দৈব কোন কিছুই বাদ দেননি। কেউ কেউ বলত ভূতে পেয়েছে। তার জন্য ওঝা, প্রেতাত্মাকে দূর করতে। তেরলের বালা, পাহাড়পুরের আমানি এসবও মানসিক চিকিৎসার অঙ্গ হয়েছে। কিছুতেই কোন ফল হয়নি। বরং চিকিৎসা বিভ্রাটে দিনের দিন ক্ষতি হয়েছে। সামান্য মানসিক ব্যাধি থেকে হিরন্ময়ী

বদ্ধ পাগল হয়েছে। এমন এক সময় এসেছে বড়দাকে তালাবন্ধ করে ঘরে স্ত্রীকে রেখে যেতে হয়েছে বৈঠকখানায় কিংবা কোর্টে। স্ত্রীর সেবাও বড়দা করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। কোর্টে যাবার আগে হিরন্ময়ীকে খাবার খাইয়েছেন, স্নান করিয়েছেন। তার জন্য পেশা বেশ ক্ষতিও হয়েছে। মক্কেল কমেছে। উপার্জনও কমেছে। কোর্টে সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাটিয়েছেন। যে বড়দা বিকেল পাঁচটার আগে বাড়ি ফিরতেন না তিনি কোনদিন দেড়টা, কোনদিন দুটোয় বাড়ি ফিরে এসেছেন। সব সময় ভয় হিরন্ময়ী যদি কিছু করে ফেলে। মনের বিকৃতিতে আত্মহত্যা করা অসম্ভব নয়। এত দুশ্চিন্তা করেও কিন্তু হিরন্ময়ীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি বড়দা। একদিন কি যে হ'ল কোর্টে থাকতেই। মনটা খুব উদ্বিগ্ন হল। একবার দেখে আসি স্ত্রীকে। বেলা বারোটা তখন। বাড়ি এসে তালা খুলে বড়দা দেখেন হিরন্ময়ী রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। বড়দার মনে হল হিরন্ময়ী দেয়ালে মাথা ঠুকেছে বারবার। বহু রক্ত পড়েছে শরীর থেকে। কিছুক্ষণ বড়দা বুদ্ধি হারিয়েছেন। তারপর খেয়াল হয়েছে। ডাক্তার ডেকেছেন। তখন সব শেষ। পাঁচ বছরের শিশু সুলতা পুতুল খেলছে আপন মনে। কী হারাল সে সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই নেই। এর মধ্যে উকিল মোক্তার অনেকেই এসে পড়েছেন। হিরন্ময়ীর সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। সুলতাকে নিয়ে আমার বাবা এসেছেন আমাদের ঘরে। কয়েক দিন সুলতা থেকেছে আমার মায়ের কাছে। হিরন্ময়ীর শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছে। সুলতাও ফিরে গেছে বড়দার কাছে। বড়দার দায়িত্বও বেড়েছে। পসার আরো কমেছে। তিনি একাধারে সুলতার মা ও বাবা। এইভাবেই কেটেছে আরো পাঁচ বছর। সুলতা তখন দশ বছরের মেয়ে। জ্ঞান হয়েছে। বুঝতে শিখেছে। বাবা ছাড়া পৃথিবীর কারোকে চেনে না। বড়দাও সুলতা ছাড়া পৃথিবীতে একা। তারই মধ্যে বৈঠকখানায় বসেন। কোর্টেও যান। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে কোর্ট। আবার স্কুল থেকে মেয়েকে বাড়িতে আনা।

বড়দার মক্কেল এখন অনেক কম। তবুও বৈঠকখানায় নিয়মিত বসেন। বাড়ির সামনে গরুর গাড়ির ভিড় নেই। সারা সপ্তাহ শান্ত তাঁর বাড়ি। এমনই একদিনে এল অমঙ্গল। সারা জীবনটা বদলে দিল। বড়দাকে যারা শ্রদ্ধা করত, ভাল বাসতো, তারা ঘৃণা করতে লাগল। বড়দা হয়ে গেলেন ধীরু মোক্তার। একদিন একজন লোক এল বড়দার কাছে। সঙ্গে তার তেইশ চব্বিশ বছরের এক মেয়ে। স্বামী তাকে প্রায় মারধর করত, ভালভাবে খেতে দিত না। দিনের পর দিন অত্যাচার সহ্য করেছে সে মুখ বুজে। তারপর তার স্বামী আবার বিয়ে করে বৌ এনেছে। তাতেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন দুজনে মিলে অত্যাচার শুরু করেছে তা সহ্য করেছে কয়েক দিন। শেষ পর্যন্ত মারপিট করে একবস্ত্রে বের ক'রে দিয়েছে তাকে ঘর থেকে। এখন সে আশ্রয়হীনা, অসহায়া। কিছু একটা না করলে অনাহারে মারা যাবে সে। বড়দা তখন এমন একটা মানসিকতায় দিন কাটাচ্ছেন যে সেই মেয়েটির দুঃখে ঠিক থাকতে পারেননি। তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় তো দিয়েছেনই। তার বদলে সেই মেয়েটি সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম করেছে। সুলতাকে দেখাশুনা করেছে। কয়েকমাস পর গুঞ্জন উঠেছে চারিপাশে। এক বিবাহিতা যুবতীকে বড়দা রেখেছেন নিজের কাছে। সেই যুগের সমাজ তা মেনে নিতে রাজি নয়। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করেছে প্রতিবেশীরা। তারপর সেই প্রতিবাদের ভাষাটা আরো রূঢ় হয়েছে। এইভাবে কেটেছে এক বছর। বড়দা ভেবেছেন মেয়েটিকে বিয়ে করে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সেখানেও অনেক বাধা। প্রথমত, মেয়েটি বিবাহিতা। দ্বিতীয়ত, ধর্মে সে মুসলমান। বড়দা হিন্দু বিপত্নীক। দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা নেই। কিন্তু স্বামী তালাক না দিলে স্ত্রীর দ্বিতীয় বিয়েতে আইনে বাধা। সেখানেই মুশকিলে পড়েছেন বড়দা। মেয়েটির প্রতি

করুণা দিয়ে শুরু হলেও তা এক দুর্বলতায় পৌঁছতে দেরি হয়নি। তাকে বিয়ের কথা ভেবেছেন সেই দুর্বলতায়। সেইকথা ভাবতে গিয়ে বড়দা জেনেছেনও অনেক কথা মেয়েটির কাছ থেকে।

জীবন্নেসার বাবা অতি গরিব। তারা পাঁচ বোন, তিন ভাই। পাশের গাঁ নুরপুরে বড় চাষী মসিয়র রহমানের ছেলে সুলতান জীবন্নেসাকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সুন্দরী সেই মেয়েকে যে ভাবেই হোক পেতে হবে এটাই ছিল সুলতানের জেদ। হাতে টাকা আছে। বল্গাহীন ছেলেকে মাসিয়র রহমান শাসনে রাখতে পারেনি। জীবন্নেসার বাবার দারিদ্র্যকে সুলতান নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পাঁচ হাজার টাকা নগদ হাতে পাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি জীবন্নেসার বাবা। জীবন্নেসা বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে সুলতানকে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সুলতানের চরিত্র জানতে বাকি থাকেনি জীবন্নেসার। সুন্দরী মেয়ে দেখলে বিয়ে করাটা সুলতানের নেশা। কোন বিয়েই সে আইন মতে করে না। অর্থ দিয়ে হোক বা ভীতি প্রদর্শন করে হোক আগেও সুলতান দু-তিনবার বিয়ের নাটক করেছে। তাদের নিয়ে ছমাস কি আট মাস জীবন কাটিয়েছে। একজনকে বিদায় দিয়ে অন্যজনকে এনেছে। তাকেও বিদায় নিতে হয়েছে। মেয়ের বাবা সবক্ষেত্রেই অসহায়। কারণ অসহায় বাবার মেয়ে তার এই বিয়ে খেলার উপযুক্ত পুতুল। জীবন্নেসাকে বিয়ে করে প্রথম দু'তিনমাস কোন অশান্তি হয়নি। কিন্তু তারপর থেকে শুরু হয়েছে অত্যাচার। দিনের দিন বাড়তে থেকেছে। জীবন্নেসা যেন বাধ্য হয় বিদায় নিতে। কিন্তু জানে বিদায় নিয়ে কোথাও যাবার তার আশ্রয় নেই। এমনি অবস্থায় সুলতান আবার বিয়ে করে এনেছে লুলুফাকে। জীবন্নেসা স্বামীর বাড়িতে থাকাকালীন লুলুফা এসেছে। তার সাক্ষাতে এটাই সুলতানের দ্বিতীয় বিয়ে। জীবন্নেসা মনে মনে হেসেছে। তার থেকে সুন্দরী নয় লুলুফা কিন্তু গায়ের রং কালো। মুখ এমন কিছু নয়। কেন বা কিসের আকর্ষণে সুলতান তাকে বিয়ে করল বুঝতে পারে না সে। পুরুষের চোখ দিয়ে দেখলে হয়ত দেখতে পেত লুলুফার দেহের প্রতি সুলতানের কিসের আকর্ষণ। স্বামীকে এতদিনে চিনে ফেলেছে জীবন্নেসা। তার হাসি পেয়েছে লুলুফার অবস্থা হবে তারই মতো কয়েকমাস পর। হয়েছেও তাই। তিন মাস যেতে না যেতে সুলতান ঘরে এনেছে ফিরোজা নামে আর একজনকে। কিন্তু ফিরোজা অন্য ধাতুতে গড়া। একমাসের মধ্যে সে সুলতানকে করায়ত্তে এনে সংসারটা নিজের হাতে নিয়েছে। জীবন্নেসা ও লুলুফা যেন ঝি। সুলতান দেখেও দেখে না। বরং ফিরোজার পক্ষ নেয়। দুজনের ওপর সুলতান ও ফিরোজার অত্যাচার বাড়তে থাকে। এমন কি মারধর করা নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। লুলুফার বাবার জমিজমা আছে। আর্থিক সচ্ছলতাও যথেষ্ট। সে বাবার আশ্রয়ে চলে যায়। কিন্তু জীবন্নেসার তো কোন আশ্রয় নেই। এমনি অবস্থায় গ্রামের আনিসার রহমান সাহেব জীবন্নেসাকে নিয়ে আসে বড়দার কাছে। রহমান সাহেব স্কুল শিক্ষক। অবিবাহিত। জীবন্নেসাকে রাস্তায় পালাতে দেখে আশ্রয় দেন নিজের বাড়িতে। বৃদ্ধা মায়ের কাছে সব বলে জীবন্নেসার স্থান হয় কয়েকদিনের জন্য। কারণ রহমান সাহেব বত্রিশ তেত্রিশ বছরের যুবক এবং অবিবাহিত। সুলতান তাঁকে মামলায় জেরবার করতে পারে। সুলতান যে চরিত্রের তাতে সকলেই তাকে ভয় করে। জীবন্নেসার বয়স যা তাতে রহমান সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করা খুবই ভয়ের। সুলতান কিছু করবার আগেই জীবন্নেসাকে দিয়ে অন্তত খোরপোষের একটা নালিশ করানো এবং তার একটা আশ্রয় যাতে হয় তারজন্যই রহমান সাহেব তাকে বড়দার কাছে আনে। বড়দা তাঁর পুর্বপরিচিত এবং রহমান সাহেব বড়দার মক্কেলও। বড়দা সব কিছু শুনে জীবন্নেসার প্রতি তাঁর করুণা হয়। রহমান সাহেবের অনুরোধে জীবন্নেসা আশ্রয় পায় বড়দার ঘরে। মামলাও বড়দা একটা ক'রে দেন সুলতানের

বিরুদ্ধে। জীবন্নেসা থাকতে পায় মক্কেলদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলোর একটায়। নিজের রান্না নিজেই করে সে। ব্যবস্থা করে দেন বড়দা। খরচও দেন।

বড়দাকে এবার পড়তে হয়েছে নানা সমস্যায়। নানা লোকে নানা কথা বলে। হিন্দুর বাড়িতে এক যুবতী মুসলমান মেয়ে থাকবে এটা পছন্দ না করে হিন্দু, না মুসলমান। সমাজে পতিত হ'তে শুরু করেন বড়দা। ঠাট্টা ইঙ্গিত করতেও অনেকে ছাড়ে না। কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে না। বড়দার চরিত্র নিয়েও কটাক্ষ করে অনেকে। এমনি অবস্থায় বড়দা সুলতানকে একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি জীবন্নেসাকে নিয়ে ঘর করবে?' সুলতান মুখের সামনে বলে দেয়—ওকে নিয়ে আমি ঘরও করব না, তালাকও দেব না। বড়দা 'ভয় দেখান বহু টাকা দেন মোহরের দাবী তুলে জীবন্নেসাকে দিয়ে মামলা করাব।' সুলতান বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। বলে বিয়ের কোন কাগজ থাকলে তো দেন মোহরের নালিশ করবে! তবে একটা শর্তে আমি ওকে তালাক দিতে পারি। ওকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে আমাকে। টাকা পেলে তবেই আমি তালাক দেব। সুলতানের কথা শুনে বড়দা থমকে যান। তাঁর মনে মনে জীবন্নেসাকে বিয়ে করবার যে ইচ্ছা ছিল তা চলে যায়। বড়দার এখন সে অবস্থা নেই যে এত টাকা দিতে পারেন। বড়দা কঠিন এক সমসার সম্মুখীন। জীবন্নেসাকে বিয়ে না করে নিজের বাড়িতে রাখা দিনের দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। নিজে তো ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অপমানের পাত্র হয়েছেন, মেয়ে সুলতাও স্কুলে বন্ধু-বান্ধবের কাছে হেয় হচ্ছে। তাকে কথাও শুনতে হচ্ছে। মেয়ে প্রায় প্রতিদিন এসে বাবার কাছে জানায় স্কুলে তাকে কি অপমান সহ্য করতে হয়েছে। বড়দা অসহ্য বোধ করেন। আনিসার রহমানকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠান। তাঁকে সব কথা বলেন। কিন্তু রহমান সাহেবও কোন আশার আলো দেখাতে পারেন না। কিন্তু তাঁর বন্ধু জালালুদ্দিনকে ডেকে আনেন বড়দার কাছে। কূটবুদ্ধি আছে জালালুদ্দিন মোক্তারের। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি বলেন আনিসার রহমান সাহেব যদি রাজি থাকেন তাহলে একটা সমাধান তিনি বের করতে পারেন। রহমান সাহেব জানতে চান। কি বিষয়ে তাঁকে রাজি হ'তে হবে। জালালুদ্দিন বলেন 'আপনি তো জীবন্নেসাকে ভালবাসতেন, বিয়েও করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সুলতান তো মাত্র দুহাজার টাকা দিয়ে জীবন্নেসাকে ছিনিয়ে নিয়েছে আপনার প্রেমিকাকে। আপনাকে শুধু বলতে হবে জীবন্নেসা আপনারই স্ত্রী। জীবন্নেসাকেও তা স্বীকার করতে হবে। আপনি নালিশ করবেন সুলতান আপনার আইনত বিয়ে করা জীবন্নেসাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে জোর করে সহবাস করেছে, অপরের স্ত্রী জেনেও একটা মিথ্যা বিয়ের নাটক করেছে। আপনার দেওয়া সব সোনার গহনা আত্মসাৎ করেছে। আনিসার রহমান সব শুনে বললেন—এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শিক্ষক। মিথ্যাচার করতে পারব না। আপনি অন্য কিছু ভাবুন। জালালুদ্দিন সাহেব দমে যাবার মানুষ নন। তিনি বললেন তাহলে অন্য দাবাই দেব। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে একটা সুলতানের কাছ থেকে তালাক আদায় হলে জীবন্নেসাকে আপনি বিয়ে করবেন। আনিসার রহমান সে প্রস্তাবে রাজি হলেন খানিকটা ইতস্তত করে।

জীবন্নেসাকে তালাক দিতে বাধ্য করেছিলেন জালালুদ্দিন সাহেব। কীভাবে করেছিলেন তাও বললেন আনিসার রহমান। মোক্তারবাবুর এক মক্কেল সীতারা বহুবার চালান হয়ে এসেছিল আগে। বিভিন্ন পুরুষের সাথে রাত্রির অন্ধকারে পুলিশ দুজনকে ব্যভিচারের অভিযোগে চালান দিয়েছিল। জালালুদ্দিন সাহেবের কাছে উপকার পেয়েছে কোর্টে সীতারা। তাকে দিয়ে থানায় একটা অভিযোগ দেওয়ালেন। সুলতান জোর করে তার ওপর বলাৎকার

ও ইজ্জত নষ্ট করেছে। দারোগাকে বললেন প্রতি রাত্রে সুলতানকে থানায় ধরে এনে বসিয়ে রাখতে। আবার সকালে ছেড়ে দিতে। তাকে অ্যারেস্ট বা গ্রেপ্তার করার দরকার নেই। শুধু তার যেন সব সময় ভয় থাকে গ্রেপ্তারের। এইভাবে দশ পনেরো রাত থানায় মশার কামড় আর গ্রেপ্তারের ভয় নিয়ে কাটিয়ে জীবন্নেসাকে তালাক দিতে বাধ্য হল সুলতান।

আনিসার রহমান এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—জীবন্নেসার কী হ'ল তারপর? আনিসার রহমান সাহেব বললেন—যা হবার তাই হোল। জীবন্নেসা আমার গৃহিণী হ'ল। বেশ সুখেই কাটালাম প্রায় পনেরো ষোল বছর। আমরা দুজনেই এখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পর্যায়ে। শুধু একটা মাত্র দুঃখ আমার থেকে গেল সারাজীবন। ধীরু মোক্তার আমার কথায় জীবন্নেসাকে আশ্রয় দিয়ে সমাজে পতিত হয়ে থাকল বাকিটা জীবন। অপবাদ ও সমাজের ঘৃণা বয়ে বেড়াল আমার জন্য। এত উদার মনের মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। স্ত্রীকে নিয়ে ভুগেছেন বেশ কয়েক বছর। তাকে হারিয়েছেন সুলতাকে মানুষ করেছেন। কিন্তু তার বিয়ে দিতে পারেন নি। সুলতা যখন সতেরো বছরের তখনও ধীরু মোক্তার ভাল পাত্র খুঁজছেন। কিন্তু তখনকার সমাজ জীবন্নেসাকে আশ্রয় দেওয়াটা ভাল চোখে দেখেনি। রটনার কারণে জীবন্নেসা ধীরু মোক্তারের রক্ষিতা। তাই কোন হিন্দু বাবা সুলতাকে ছেলের বৌ করতে রাজি হয়নি। সুলতাকে কোন মুসলমান বিয়ে করবে এ অনুমতিও সমাজ দেবে না। সুলতা মনমরা হয়ে থাকতো। নিজেকে আমার দোষী মনে হ'ত। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম আমি যদি সুলতার জন্য কোন পাত্র দেখি আপনি অমত করবেন না। ধীরু মোক্তার বলতেন আমার মত নিয়ে কি আমার জীবনটা চলেছে? অমত আমার কিছুতেই নেই। আমি তো সমাজে পতিত, আমার সঙ্গে সুলতাও। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে। কোনদিন মৃত্যু এসে হাজির হবে। কিন্তু সুলতার কি হবে এই ভেবেই রাতে ঘুম হয় না। শুনে আমার কষ্ট হত। আমার ছাত্র, কি হিন্দু কি মুসলমান অনেককেই অনুরোধ করেছি। কিন্তু কেউ উদারতা দেখাতে পারেনি সমাজের ভয়ে। একদিন ধীরু মোক্তারকে বলেছি সুলতাকে আমায় দিয়ে দিন। ও জীবন্নেসার মেয়ে হোক। আমার কাছে থাকলে ওকে সবাই জানবে মুসলমান। হয়ত বিয়েতে কোন বাধা আসবে না আনিসার রহমানের মেয়ের। ধীরু মোক্তার উত্তরে বলেছিলেন সুলতা যদি আপনার মেয়ে হয় আমার কি আপত্তি থাকতে পারে? আমি সুলতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার কি মত? সে বলেছিল—আপনাকে বাবাই তো ভেবে এসেছি এতকাল। কেউ যখন আমাদের খবর নিতে সাহস পায়নি। আপনি এসেছেন। দুঃখ-কষ্টে পাশে থেকেছেন নির্ভয়ে। আমাদের জন্য ভেবেছেন অন্তর দিয়ে। ঋণ তো আপনার শোধ করা যাবে না। কিন্তু অসহায় এই বাবাকে আমি কার কাছে রেখে যাব? বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কি কোন পথ নেই? আমি লেখাপড়া শিখেছি। গান জানি। আরো হয়ত কিছু শিখে নেব। ছেলে হয়ে জন্মালে তো বাবাকে দেখার দায়িত্ব নিতে হোত। বাবা তো আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন। এবার আমার কর্তব্য আমি করি।

আনিসার রহমান সাহেবের একটা ভয় ছিল। সুলতা যদি আত্মহত্যা করে বসে। কিন্তু তার কথা শুনে সে ভয় তাঁর কেটেছে। তিনি ছোটছেলে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করে দিয়েছেন। সুলতাকে সেখানকার মাস্টার করেছেন। ধীরু মোক্তার তা দেখে সুখী হয়েছেন।

আমি ভাবি ধীরু মোক্তার, সুলতা, আনিসার রহমানকে তো বহুবার দেখেছি। কিন্তু তাদের জীবনের কত কথাই তো জানা ছিল না। আনিসার রহমান সাহেবের সংস্পর্শে না এলে কত কথাই অজানা থেকে যেত। এই অনিসার রহমানের কাছে আমিও ঋণী। পেশার প্রথম জীবনে

কত মামলা পাঠিয়েছেন আমাকে। অনেক সময় নিজে সঙ্গে ক'রে এনেছেন মক্কেল। অনেক স্নেহ পেয়েছি। তিনি আমার জীবনে না এলে ধীরু মোক্তারকে জানতেই পারতাম না তাঁর বাইরোটা দেখে।

চিন্তামণি দারোগা

ছেলেবেলার স্মৃতি। এক বৃদ্ধ বাউল গান গাইত আর এক আনা দু'আনা যা পেত তাতেই সন্তুষ্ট। সঙ্গে তার হাত ধ'রে আসত একটা ছোটছেলে। আমার থেকে বয়সে তখন সে কয়েকবছর ছোট। বৃদ্ধ বাউলের পরনে রং বেরঙের জোড়াতালি দেওয়া গোড়ালি পর্যন্ত আলখাল্লা। পায়ে ঘুঙুর হাতে একটা একতারা। নানা গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের গানই বেশি। সব গান মনে নেই। একটা গানের প্রথম লাইন আর বাকিটা বিষয় মনে আছে। নেচে নেচে গান করত "চিন্তামণি দারোগা আমায় করলে জ্বালাতন"। দেহতত্ত্বে চিন্তামণি হল মানুষের মন যা সব সময় জ্বালাতন করে। সাধারণভাবে চিন্তামণি নামের এক দারোগা গাঁয়ের মানুষকে কি ভাবে জ্বালাতন করে তার এক জীবন্ত চিত্র। সেদিনের সেই বৃদ্ধ বাউলের নাম ছিল নবনী দাস বাউল। যে ছেলেটি তার বাবার কাছে শিক্ষা নিয়েছিল তার নাম আজ বিশ্বজোড়া—পূর্ণদাস বাউল। শুধু বীরভূম নয় সে ভারত গৌরব। এখনো সে আমাকে ভোলেনি। দেখা হ'লে দাদা সম্বোধনে আমার মনটা ভরিয়ে দেয়। তাকে একবার অনুরোধ করেছিলাম সে গানটা গাইতে রেডিও বা টেলিভিশনে। তার বাবার লেখা সে গান হয়তো খুঁজে পায়নি। সেই গানের কথা দিয়ে একজন দারোগার কাহিনী শোনাব। আসল নাম তার যাইহোক। চিন্তামণি দারোগা সব যুগেই থাকে। সমাজে অবক্ষয় এলে চিন্তামণি দারোগারা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাইরের রূপ দেখে সেই চিন্তামণিকে চেনা যায় না। চেনে একমাত্র ভুক্তভোগী। কারো জীবনে দুর্ভাগ্য থাকলে বার বার আসে চিন্তামণি দারোগা। অনন্ত হাড়ির জীবনেও বার বার এসেছে কোন না কোন চিন্তামণি দারোগা। কম্বল সে ছাড়লেই কম্বলি তাকে ছাড়েনি। ডাকাতি ছাড়ব, সৎ জীবন যাপন করব ভেবেও সে পারেনি।

অনন্ত বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। খুব আদরে মানুষ। বাবা পরের জমি চাষ করে যা পেত তাতে তিনটে পেট চালাতে কোন অসুবিধা ছিল না। ধান পোঁতা বা ধান কাটার সময় বেশি ব্যস্ততা। অন্য সময় মজুর খাটা। মা সময়ে সময়ে মাঠে কাজ করত। তার জন্য ধান পেত খোরাকি। তাছাড়া কোপাই নদী বা খাল বিলে মাছ ধরে—সংসারে কিছু পয়সা দিত। অনন্ত যখন সাত-আট বছরের তখন থেকে গরুর বাগালের কাজ করত। অনেকের গরু সকালে মাঠে নিয়ে যেত চরাতে। বিকেলে ফিরত। মা দুপুরে খাবার দিয়ে আসত। গরু মাঠে চড়ছে। অনন্তর কাজ শুধু তাদের লক্ষ্য রাখা যাতে অন্যের জমির ধান গাছ না খেয়ে ফেলে। অফুরন্ত সময়। বাঁশের বাশী বাজাতো। খুব সুন্দর সুর তুলতে পারত। এইভাবে কয়েক বছর কাটার পর যখন জোয়ান হ'ল। মাঠে ধান পোঁতা ও কাটার মুনিস এবং ঘরে গেরস্থের গোয়ালের বাঁধা মহিন্দার। তিনজনেই রোজগার করে। সংসারে কোন অভাব থাকে না। প্রয়োজনও তাদের সীমিত। কিন্তু দু-এক বছর যেতেই অনন্তের এসব কাজ ভাল লাগত না। একদিকে

বাবা-মার আদর অন্যদিকে বাঁশীর নেশা। সব কাজ ফেলে মাঠে জঙ্গলে নদীর ধারে গান গেয়ে বেড়াত। তার বাঁশী বাজানো দেখে এক যাত্রাদল তাকে দলে নিল। এ গ্রাম সে গ্রাম যাত্রার পালায় বাঁশী বাজানো। কখনও কখনো সখীর পার্ট করত মেয়ে সেজে। সে কাজও বেশিদিন করেনি। যাত্রা তো প্রতিদিন হয় না। সারা বছর তার থেকে খাবার সংস্থান কঠিন হয়ে পড়ে। যাত্রাদলে থাকার সময় একজন দলে ছিল। নানা রকম যাদুবিদ্যা জানত। অনন্ত তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে দু-একটা যাদুর খেলা শিখে নেয়। তারপর সেটা শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। আরো কিছু শিখবার জেদ থাকায় শিখেও ফেলে। সব থেকে কঠিন এক যাদু যেটা সে শিখেছিল সেটাই জীবনে কাল হ'য়ে দাঁড়াল। যাত্রা ছেড়ে অনন্তর গ্রামে গ্রামে যাদুর নানা খেলা দেখিয়ে ভালই আয় হ'তে শুরু করে। যখন অবস্থাটা বেশ সচ্ছল হয় গিরিবালাকে বিয়ে করে অনন্ত। বেশ সুখের জীবন। কিন্তু সুখ চিরস্থায়ী হয় না। চিন্তামণি দারোগা এল জীবনে। বদলে দিল পরের জীবনটা।

একদিন সন্ধেবেলা অনন্ত গিরিবালার সঙ্গে বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। সেদিনের রোজগার গুনছে। পরে খাওয়া-দাওয়া করে শোবে। সেদিনের রোজগারটা অন্যদিনের থেকে কিছু বেশি। দুজনেরই মন খুশিতে ঝলমল। গিরিবালা বলছে—পৌষ মেলাতে দস্তার গয়না কিনে দিতে হবে। অনন্ত বলেছে—দস্তার তো দেবই। একটা সোনারও গয়না দেব। খুশিতে উৎফুল্ল হয় গিরিবালা। এমন সময় বাইরে থেকে হাঁক দেয়—অনন্ত আছিস? বেরিয়ে দেখে থানার একটা সেপাই। বলে—দারোগা থানায় ডেকেছে। আমার সঙ্গে যেতে হবে এক্ষুনি। অনন্ত ভেবে পায় না কেন যেতে হবে? বলে আমি কিছু করিনি। আমাকে কেন ডেকেছে গো সেপাইজী?" উত্তরে সেপাই বলে থানায় গেলে তা মালুম হবে। অনন্তকে খেতেও দেয় না সেপাই। গিরিবালা কাঁদতে থাকে। সেপাই অনন্তকে নিয়ে থানায় চলে যায়। সেখানে পৌঁছতেই দারোগা হুঙ্কার দেয়—শালা বের কর কানের দুল গলার ভেতর থেকে। অনন্ত কিছু বুঝতে পারে না কার কানের দুল বলছে দারোগা।

দারোগা বলে জমিদারের ছোটমেয়ের দুল তুই চুরি করে গলার মধ্যে রেখেছিস। বের কর না হলে হাত-পা ভেঙে দেব। অনন্ত বুঝতে পারে দারোগা জেনে ফেলেছে তার গলার মধ্যে সোনার ছোট কিছু গয়না রেখে তা আবার বের করে দেবার ম্যাজিক দেখানোর কথা। সে বার বার বলে—আমি ম্যাজিক দেখাই। কারো দুল নিয়ে ম্যাজিকের পর তা ফিরিয়ে দি। আমি তো কারো দুল ম্যাজিক করতে নিয়ে ফেরত না দেওয়া করিনি।

তারপর শুরু হয় স্বীকার আদায় করার নির্মম পন্থা। যথেষ্ট মারপিট করে তাকে চালান দেয় কোর্টে। প্রথমটা সামান্য এক চুরির মামলা। দুমাস তাকে থাকতে হয় জেলে। সিউড়ী জেলে দেখা হল দেদারী নামের এক কুখ্যাত ডাকাতের সঙ্গে। দেদারী ছাড়াও সুলতান খাঁ, রঘুবীর চৌবে, গোলক বাউড়ী আরো কত ডাকাতের সঙ্গে হ'ল পরিচয়। বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া ও বিহারে দেদারীর নাম কে না জানতো। সাত ফুট লম্বা বিশাল চেহারার এক হিংস্র দৈত্য যেন। জেলের উঁচু দেওয়াল টপকে রণপায়ে দৌড়ে রাত্রির অন্ধকারে ডাকাতি করে ভোরের আগে ফিরে আসত জেলখানায়। দেদারী ও অন্যান্যরা বলত—চিন্তামণি দারোগাকে তুষ্ট রাখলে দুচার মাস জেলে থাকতে হয় ঠিকই। কিন্তু শাস্তি যাতে না হয়, বছরের পর বছর কারাবাস করতে না হয় সে ভাবনা দারোগার। অবাক হ'য়ে অনন্ত সে সব শোনে। ভাবে চিন্তামণি তো ডাকাত গড়ার কারিগর। ডাকাত গড়া যে দারোগার নিজের স্বার্থে সেটা ও বুঝতে কষ্ট হয় না। অনন্ত এও শিখেছে কি কি কৌশল লাগে ডাকাতি করতে, পুলিশের চোখে কীভাবে

ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করতে হয়। চুরির মোকদ্দমা থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতে ডাক এসেছে থানা থেকে। চিন্তামণি দীক্ষা দিয়েছে অনন্তকে ডাকাতি মন্ত্রে। শুরু করেছে নতুন জীবন। প্রথম প্রথম ছোট ছোট বাড়িতে ডাকাতি। চিন্তামণি ভয় দেখিয়েছে ডাকাতি না করলেও সারা বছর মামলায় জড়িয়ে রাখবে। তার চেয়ে ডাকাতি করে লুঠের ভাগ নিয়মিত দিয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। অনন্ত উপলব্ধি করেছে তার আর ফিরবার পথ নেই। তাই ডাকাতি করেছে, নিয়মিত ভাগ দিয়ে গেছে। এটাও বুঝেছে অনন্ত ডাকাতি করে যা সোনাদানা পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই চলে যায় গয়নার দোকানে আর দারোগার পকেটে। কিন্তু চিন্তামণি দারোগা তো চিরকাল একটা থানায় থাকে না। একটা সময়ে বন্ধ হয় নতুন দারোগা এলে। চিন্তামণির উল্টে প্রতি রাতে পাহারায় বেরোন। ডাকাতি বন্ধ হয়ে যায়। অনন্তকে থানায় হাজিরা দিতে হয় প্রায়ই। চৌকিদার নজর রাখে। সে সময় হাতে পয়সা থাকে না। তাকে ও গিরিবালাকে কষ্টে কাটাতে হয়। অনন্ত যে মাঠে কাজ করবে তারও উপায় নেই। ডাকাতকে তো ঘৃণা পেতেই হবে সকলের। নতুন দারোগার পায়ে জড়িয়ে ধরে অনন্ত। একটা কিছু জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। নতুন দারোগা চাল কলে একটা করে দেন কাজ। সৎ জীবনের স্বাদ অনন্ত ও গিরিবালাকে সুখী করে। সেটাও সাময়িক। আর এক চিন্তামণি দারোগা বদলি হয়ে আসে। চিন্তামণির আদেশে গ্রেপ্তার হয় অনন্ত। অনন্তকে বলে—আজ আটমাস থানায় এসেছি। তোর দেখা পাওয়া যায় না। কোর্টে চালান হবি, না মাসোহারার ব্যবস্থা করবি? দিনে ধান কলে যেমন চাকরি করছিস তেমনি করবি। রাতের কাজ করে নিয়মিত দেখা করবি। না হলে চাকরি তো যাবেই জেলেও পচবি বছরের পর বছর। সব ডাকাত কি বাল্মীকি হয়? তুই তো ভালই জানিস আমাদের লেখা কাগজকে সব কোর্ট কত বিশ্বাস করে। একটার পর একটা ডাকাতি মামলা আর টি. আই প্যারেড চাওয়া। তার সঙ্গে তোর কাছ থেকে উদ্ধার করার মিথ্যা কাগজ হবে। সোনার হার উদ্ধার হয়েছে তোর কাছ থেকে। তোর সঙ্গে গিরিবালাকেও জেল পাঠাব। এখন ভেবে দেখ কী করবি?

অনন্তর ভাববার কিছু থাকে না। ডাকাতি করতে হয় আবার চিন্তামণি তুষ্ট তো জগৎ তুষ্ট। ভাগও দিতে হয়। আবার আসে ভাল এক দারোগা। থানার লিস্ট দেখে তিনি ধরেন অনন্তকে তাঁর এলাকায় কোন ডাকাতি হলেই। ধানকলের চাকরিও চলে যায় তার। অনন্ত ভাবে এ বেশ জীবন। যখন সত্যি সে ডাকাতি করে তখন থাকে জেলের বাইরে। কিন্তু ডাকাতি না করেও জেলে থাকতে হয় বিনাদোষে। বাবা-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বহু বছর। ডাকাত ছেলের জন্য বাবা-মাকে কেন ভুগতে হয়। সৎ দারোগা থানায় এলে অনন্তর হয় বিপদ। গিরিবালার সঙ্গেও কোন সম্পর্ক থাকে না মাসের পর মাস। দারোগার কাগজ যেন বেদ না উপনিষদ। সকলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু অনন্ত চিৎকার করে সত্য কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। সে যখন জেলে থাকে কেউ গিরিবালার খোঁজ রাখে না। কারো বাড়িতে ঝি গিরি করবে তার উপায় নেই। ডাকাতের স্ত্রীকে কেউ বিশ্বাস করে না। জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। গিরিবালা জেলখানায় এসে কাঁদে। স্বামীকে বলে—এবার জেল থেকে বেরিয়ে আমরা দুজন চলে যাব বহুদূরে। দেহের পরিশ্রম করে যা জুটবে তাই নিয়ে সুখে কাটাব। দুজনেই খাটবো। বাকি জীবনটা তো কাটাতে পাব একসঙ্গে। অনন্ত বলে তাই হবে। এরপর একদিন অনন্ত ছাড়া পায়। বিনা দোষে জেল খেটেছে এক বছর। কিন্তু বাড়িতে তো অভাব ছাড়া কিছু নেই। সমাজে পতিত সে। এমনি এক সময় আর এক চিন্তামণি দারোগা এসেছে থানায়। ডাক পড়েছে অনন্তের। চিন্তামণি জিজ্ঞেস করেছে জেল থেকে বেরিয়ে অভাব আর অনটন নিয়ে কেমন

আছিস? বলেছে—আমি যতদিন আছি লেগে পড় কাজে। অনন্ত বলেছে—হুজুর আপনার মতো ভাল লোক যদি থানায় বরাবর থাকতো তাহলে আমার কিসের ভাবনা। আমি নিজেই এসে আপনার সম্মান করতাম। জেল থেকে বেরিয়ে আমি নিঃস্ব অবস্থায় আসতে পারিনি লজ্জায়। ক্ষমা করবেন হুজুর। আপনার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা। আমাকে ডাকাতি করতে বলবেন না। আমি ও গিরিবালা আপনার সংসারের সব কাজ করে দেব। দুবেলা শুধু খেতে দেবেন। চিন্তামণি ভাবে এখনকার মতো এটাই ভাল। সেইমত অনন্ত ও গিরিবালা চিন্তামণির সংসারের কাজে যোগ দেয়। কয়েকমাস কাটে। অনন্ত ও গিরিবালা দু বেলা খাবার পেয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু এরই মধ্যে দেখতে পায় চিন্তামণি দারোগার দু এক জনকে দীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। সেটাও ভাল লাগে। ভাবে এবার তাহলে নিস্কৃতি। গিরিবালাকে বলে অনন্ত—আর নিশ্চয় দারোগা তাকে ডাকাতি করে মালের ভাগ দিতে বলবে না। এবার আমরা দুজনে কোথাও চলে যাব। দূরে, বহুদূরে। সেখানে শহর থাকবে না কাছাকাছি। গ্রাম থাকলেও তফাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে থাকব। যা জোটে তাই খেয়ে থাকব। শান্তিতে থাকা যাবে। গিরিবালাকে মাঝে মাঝে সে ধরনের কথা বললেও দারোগাকে সাহস করে বলতে পারে না। কয়েকমাস চলে যাবার পর কথা বলতে গিয়েও মুখ থেকে কথা বের হয়নি ভয়ে। দারোগা যদি রাগ করে মিথ্যা ডাকাতি মামলায় চালান করে দেয়। এইভাবে কাটতে থাকে।

একদিন দারোগার মেয়েকে দেখতে এল পাত্রপক্ষ। খাওয়ার প্রচুর আয়োজন। পাত্রপক্ষের মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। দারোগার সৌভাগ্যে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এমন এক সতের বছরের মেয়েকে অপছন্দ করা কঠিন। তারপর নিভৃতে পাত্র পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে দারোগা কি কথা অনন্ত শোনেনি। পাত্রপক্ষ বিদায় নিলে দারোগা ও গিন্নি খুব খুশি। অনন্ত ভেবেছে এটাই তার মনের কথা দারোগাকে বলার উপযুক্ত সময়। হাতজোড় করে বলেছে—হুজুর আমরা এদেশ থেকে চলে যেতে চাই। ডাকাতি যখন আর করতে হয় না তখন অন্য যে কোন অপরিচিত জায়গায় মুনিষ খেটে খাব। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চাই।

দারোগা বলে—সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে একমাস পরে। বিয়ে হয়ে যাবার পর চলে যাবি। তখনকার মতো আর কিছু বলে না দারোগা। অনন্ত ভাবে আর তো বড় বেশি হলে দেড়মাস। তারপর তো নিষ্কৃতি পাব। কয়েকদিন যেতেই দারোগা অনন্তকে ডাকে। বলে অনন্ত, মহা বিপদে পড়েছি। পাত্রপক্ষ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করছে। সোনার গয়না মেয়েকে তার মা নিজের কিছু ভেঙে গড়িয়ে দেবে। তাছাড়া ডাকাতি করা গয়না তো নিজের মেয়েকে দেওয়া যায় না। মেয়ের অকল্যাণ হবে। কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস থাকে। নগদ ঐ টাকার কি ব্যবস্থা হবে ভেবে আকুল হচ্ছি। তুই যদি সাহায্য করিস। তুই একমাত্র ভরসা। অনন্ত বলে—আমি কীভাবে সাহায্য করব। আবার তাহলে ডাকাতি করতে হয়। ডাকাতি করলে নগদ কি আসবে তার ঠিক নেই। সোনার গয়না সে তো আপনার কোন কাজে লাগবে না। দারোগা বলে—সোনাদানা যা পাওয়া যাবে তা স্যাকরাকে বিক্রি করে নগদ পাওয়া যাবে। তুই আমার মেয়ের মুখ চেয়ে একবার সাহায্য কর। এরপর আর কোনদিন তোকে ডাকাতি করতে বলব না। তুই অন্য অনেকের থেকে সাহসী। নানা কৌশল তোর জানা আছে। একবার তুই ডাকাতি কর।

অনন্ত চুপ করে থাকে। পরে গিরিবালা সব শুনেও কোন কথা বলতে পারে না অনন্ত বলে—তোকে কথা দিচ্ছি গিরি এটা আমার শেষ ডাকাতি। তারপর তোকে নিয়ে চলে যাব

দূরে বহুদূরে কাটাব শান্তির জীবন। দারোগার কাছে গিয়ে অনন্ত বলেছে—ডাকাতি একবার সে করবে যে কোন দিন। পরের দিনই তাকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। দারোগা রাজি হয়। সদ্য দীক্ষা পাওয়া কয়েকজন শিষ্যকে দারোগা অনন্তকে সাহায্য করবার আদেশ দেয়।

দুদিন পর অনন্ত গিরিবালাকে বলে বেড়িয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। সকাল হ'তেই গিরিবালার মনটা চঞ্চল হয়ে এক অজানা আশঙ্কায়। কোন কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। এক সময় ছুটে যায় দারোগার কাছে। দারোগাও চিন্তিত। কোন উত্তর দিতে পারে না। গিরিবালা ফিরে আসে নিজের ঘরে।

বেলা দশটায় খবর আসে থানায়। ইলামবাজার জঙ্গলে তিন মৃতদেহ পড়ে আছে। দারোগা পুলিশ নিয়ে ছুটে যায় জঙ্গলে। তিনটে মৃতদেহ তার চেনা। অনন্ত একজন। অন্য দুজন দারোগার দেওয়া দুই শিষ্য। থানায় মৃতদেহগুলো আনা হয়। ইতিমধ্যে সংবাদ এসেছে থানায় রায়পুর গ্রামে ডাকাতি করতে এসেছিল একটা দল। গ্রামের লোক তিনজনকে ধরে ফেলে। গণপিটুনিতে তারা মারা যায়। গিরিবালা খবর পেয়ে থানায় এসে দেখতে পায় স্বামীর মৃতদেহ। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। একসময় অজ্ঞান হ'য়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর গিরিবালা ভাবে—সকলের কাছে সে চিৎকার করে বলবে দারোগাই দায়ী অনন্তর মৃত্যুর জন্য। সে তো ডাকাতি করতে না পাঠালে অনন্ত মারা যেত না। কিন্তু কেউ তো তা বিশ্বাস করবে না। অনন্ত তো ডাকাতই। সে যে কারণেই হোক। মানসিক টানাপোড়নে গিরিবালা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে কিছুদিন পরই। অনন্তের কাছে চলে গেছে সে। সেখানে চিন্তামণি দারোগা নেই, ডাকাতি নেই। চিরশান্তিতে দুজন আছে অজ্ঞাত এক মহাশূন্যে।

লাসকাটা নাথুরাম

শহরের এক প্রান্তে একটা ঘর। মোটামুটি বড় ঘরই। চারদিক ফাঁকা অনেকটা। জেলখানার উঁচু প্রাচীর পশ্চিমে ফাঁকা জায়গার পর। উত্তরে খানিকটা দূরে সদর হাসপাতাল। হাসপাতালটা আবার শহরের দক্ষিণ সীমান্তে। ছেলেবেলায় ভয় পেতাম ঐ ঘরটার কাছে যেতে। সবাই বলত ওটা লাস কাটা ঘর। কেন যে সেটা লাস কাটা ঘর তা বুঝতে সময় কিছুটা লেগেছে। যখন বুঝলাম খুন হওয়া মানুষের মৃতদেহটা ডাক্তার পরীক্ষা করে তখন ভূতের একটা ভয় হ'ত। মনে হ'ত যে সব মৃতদেহ এ পর্যন্ত সেখানে এসেছে সব ভূতের আড্ডা হয় রাত্রিতে। সেই ভয়টা কাটতে অনেক সময় লেগেছে। আমার বয়সও যেমন বেড়েছে ঐ এলাকায় মানুষের ঘর বাড়ি তৈরি হয়ে সেটা একটা ঘন বসতি হয়েছে। তারপর শহরের পশ্চিম প্রান্তে নতুন বড় হাসপাতাল হয়েছে। লাসকাটা ঘর চলে গেছে হাসপাতাল কম্পাউন্ডের মধ্যে। কত ডাক্তার এসেছে। চলে গেছে এই দীর্ঘ সময়ে। কিন্তু লাসকাটা ডোম নাথুরাম ছিল বহু বছর। আমি আইন পেশায় আসার কয়েক বছর পরও সে কাজ করেছে। শেষ পাঁচ-ছ বছর বেঁচে থেকেও কাজ করেনি। নাথুরামকে চিনি ছেলেবেলা থেকেই। কি তার প্রকৃত কাজ তখন ধারণা ছিল না। তাকে সবাই ডাকতো পাতিয়া বলে। শুনতাম সে-ই নাকি মৃত দেহটা কাটা ছেঁড়া করে এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় সাহায্য করে। এর বেশি কিছু জানা ছিল না। ফৌজদারী

কোর্টে প্র্যাকটিশ করার সুবাদে পাতিয়াকে জানার এবং লাসঘরের নানা ইতিহাস শোনার সুযোগ হয়েছে। পাতিয়া নিজে একটা বিপদে পড়েছিল। আইনি সাহায্য পেয়েছিল সে আমার কাছে। তারজন্য তাকে কোন খরচ করতে হয়নি। কৃতজ্ঞ ছিল আমার কাছে। সময়ে অসময়ে টাকার প্রয়োজন হলে দু-পাঁচ টাকা দিতাম। খুশি হ'ত। তার নানা অভিজ্ঞতা জানাতো তার নিজের ভাষায়। কৌতূহলী মন আমার জানতে চাইত সে সব কথা। সেও বলে আনন্দ পেত। সারাদিন সে ভাল থাকতো। কিন্তু রাত্রির হলেই সে মদ খেতো। না খেয়ে থাকতে পারত না। বলত—হুজুর মদ না খেলে আমি ঘুমুতে পারব না। যতই স্নান করি যাতে নিজের গা থেকে মড়ার পচা গন্ধ নাকে আসে। আর মৃতদেহের ছবিটা মনের মধ্যে নাচানাচি করে। পাতিয়াকে রাত দশটার পর আর পাওয়া যাবে না সব ডাক্তার জানতো। তা কে ছাড়া কোন মৃতদেহের ঠিক মতো ময়নাতদন্ত হবে না তাও বুঝতো। সে যখন প্রথম কাজে েগে দেয় তখন বয়স পনেরো কি ষোল। তার কাকাকে সাহায্য করার কাজ। মৃতদহ কাটা-ছেঁড়া করা বা সেলাই করা এসবই তার শেখা কাকার কাছে। আবার মাইনে ছাড়াও বাড়তি রোজগারের কায়দা-কানুন শিখিয়েছে কাকা। পাতিয়ার কাছে শুনেছি সে সব কথা। পাতিয়া বলত—হুজুর, মাইনে যা পায় তাতে কোনক্রমে দুবেলা পেটের ভাত জোটে। মদ খেতে গেলে বাড়তি রোজগার চাই। এই বাড়তি রোজগার কি ভাবে করত সেটা আমার কাছে অকপটে স্বীকারও করেছিল। এই রোজগারের সূত্র ছিল মৃতদেহের প্রতি আত্মীয়স্বজনের মায়া। সে মায়া মরে যাওয়ার পর থেকে চিতায় আগুন দেওয়া বা কবরে মাটি দেওয়া পর্যন্ত। মৃতদেহ বেশি বা আদৌ কাটাছেঁড়া যাতে না করে তার জন্য আত্মীয়-স্বজন টাকা দেয় স্বেচ্ছায়। প্রয়োজন হলে বেশি দাবিও করা যায় ক্ষেত্রে বিশেষে। দুর্ঘটনায় বা বিষে মৃত্যু হ'লে কাটা ছেঁড়া না করার জন্য টাকা দেয়। ডাক্তার তো মৃতদেহ ছোঁয় না। বেশ তিরিশ হাত দূরে নাকে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে থাকেন। পাতিয়া বলে। ডাক্তার ছোট একটা কাগজ তা লিখে নেন। পরে বাড়িতে বসে রিপোর্ট লেখেন। এটাই সাধারণ নিয়ম। মেডিকেল জুরিস প্রুডেন্স থাকে টেবিলের ওপর। কঠিন কঠিন শব্দ তা থেকে নিয়ে রিপোর্ট লেখা হয়। কি লেখা হয় পাতিয়া তা জানতেও চায় না। সে বাংলায় ক্ষত জখম যা দেখে বলে তার ইংরাজি ডাক্তার কী লিখল সে নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। তখন সে ব্যস্ত কাটা ছেঁড়া দেহটা ভালভাবে সেলাই করে দেবার দর কষাকষিতে। খুব বেশি দর কষাকষি তাকে বহু সময় করতে হয় না। শোকসন্তপ্ত মন যা দাবি করে তাই দিতে চায়। মৃতের প্রতি মায়া, সৎকারের তাগিদ সব মিলে পাতিয়ার একটা সুন্দর পরিবেশ। অসৎ পথে অর্থলাভের অন্য সুযোগ আসে। সাধারণ মৃত্যুকে হত্যা, হত্যাকে দুর্ঘটনা আত্মহত্যাকে সাধারণ মৃত্যু এসব করা কোন কোন সময় কঠিন হয় না। পাতিয়া বলত—হুজুর অসৎ পথে আমি কোন রোজগার করিনি। তবে কাটাছেঁড়া কম করা বা সেলাই করার জন্য পয়সা নেওয়াটা কোন অসৎ কাজ নয়। কিন্তু একটা অসুবিধা কখনও কখনও আসে। ডাক্তার সৎ তো আমিও সৎ। ডাক্তার অসৎ হলে বাধ্য হয়ে যে কাজ আমাকে করতে হয় তাকে কি অসৎ কাজ বলে? সে তো চাকরি বজায় রাখতে বাধ্য হওয়া। সেই রকম দু একটা খারাপ কাজ যে করিনি তা বলতে পারব না। পাতিয়ার যুক্তি আমার সঙ্গে না মিললেও কিছু করার নেই। আমি বলেছিলাম—ঐ রকম দু একটা খারাপ কাজ করার গল্প বল। জানতে ইচ্ছে করছে। পাতিয়া বলেছিল তার নিজের ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

তখন ইংরেজ আমল। প্রায় শেষ দিক। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার নবগোপাল রায় বাস করতেন রায়দীঘি গ্রামে। বিশাল জমিদারী। খাজনা আদায় থেকে লক্ষটাকা আসতো। গ্রামে

দশ বিঘে জমিতে ছিল বসতবাড়ি, আমবাগান, বড় দীঘি, ফুল ও নানা ফলের গাছ অনেকটা জায়গা জুড়ে। চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটা দুর্গামন্দির, শিবমন্দির, নাটশালা। সে যুগে একটা অলিখিত আইন ছিল। জমিদার ছাড়া কেউ পাকাবাড়ি করতে পারে না তার জমিদারীতে। দুর্গাপূজা কালীপূজা শুধু জমিদারের মন্দিরে হবে। বাধ্য প্রজারা আসতে পাবে প্রসাদ খেতে পারে। নন্দগোপাল তাঁর বাবা নবগোপাল রায়কে দেখেছেন। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটরা আসতেন পূজাপার্বণে। আপ্যায়নে জলের মতো খরচ করতেন। নবগোপাল মারা যান দেশ স্বাধীন হবার বছর সাত আট আগে। নন্দগোপাল জমিদার হয়ে কিন্তু নবগোপালের মত অর্থশালী হতে পারেননি। নবগোপাল অপব্যয় করেছেন এবং শেষ দিকে খাজনা আদায় কমতে থাকে। তবুও নন্দগোপাল আরো প্রতাপশালী হবার চেষ্টা করতেন। তা বিফল হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলেন প্রতাপশালী হ'তে গেলে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। তাছাড়া জমিদার তিনি খুব বেশি বছর থাকতে পারেননি। প্রথাটাই আইনে বিলুপ্ত হ'ল। বিচক্ষণ নায়েব গোমস্তার পরামর্শে বেশ কিছু জমি স্বনামে-বেনামে রাখতে পেরেছিলেন বলে অবস্থাটা সামলানো গিয়েছিল। বাইরে নন্দগোপাল তা জানতে দেননি। নবগোপালের মত অপব্যয় না থাকায় যেটুকু অর্থ ছিল তা লগ্নি করেছিলেন ব্যবসায়। ফলে নন্দগোপাল একজন ধনী এ প্রচারটা ছিল। ছেলে মদনগোপালকে লেখাপড়া শিখিয়ে সদরে ডাক্তারী করার জন্য বাড়ি কিনেছিলেন। মদনগোপাল বছর দু-এক প্র্যাকটিশ করার পর নানা জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। কিন্তু নন্দগোপাল ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন ধানবাদের এক কোলিয়ারি মালিকের মেয়ে বিমলার সঙ্গে। বিমলা সঙ্গে এনেছিল দুশো ভরি সোনার গয়না, লক্ষ টাকা নগদ এবং বিয়ের দান সামগ্রী। নন্দগোপাল বৌভাতে প্রচুর খরচ করেছেন। শহরের গণ্যমাণ্য লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বৌভাতের যে আয়োজন হয়েছিল সে রকম আমি খুব কম দেখেছি। আমিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলাম বাবার সঙ্গে। নন্দগোপাল বাবার পুরনো মক্কেল ছিলেন। নবগোপাল ও নন্দগোপাল সম্বন্ধে বাবার কাছে শুনেছিলাম অনেক কথা। সত্যিকারের জমিদার যারা ইংরেজ আমলের তাদের দেখার সুযোগ আমার হয়নি। বাবা বলতেন নবগোপাল ছিল ছোটখাটো একটা রাজা। আমি নন্দগোপালকে উকিল হওয়ার পর যখন দেখি তখন জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবসার আয় থেকে তিনি ধনী। তাঁকে দেখার আমার একবারই সুযোগ হয়েছিল মদনগোপালের বৌভাতে। তারপর নন্দগোপালের আর কোন খবর রাখিনি। বৌভাতের বছর তিনেক বাদে কানে একটা খবর এসেছিল। বিমলা মারা গেছে। এইটুকুই।

নাথুরাম একটা মর্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়েছিল তার একটা অসৎ কাজের কথা বলতে গিয়ে। রাত্রি তখন আটটা। তখন লাসকাটা ঘর ছিল পুরনো হাসপাতালের কাছে। পাতিয়া সবে ফিরেছে বাড়ি। মদ খাবার জোগাড় করছে। এমন সময় একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল তার কুঁড়েঘরের খানিকটা দূরে। গাড়ি থেকে নেমে একজন তার কাছে এল। বলল ডাক্তারবাবু ডাকছেন। পাতিয়া গাড়ির কাছে এলে ডাক্তারবাবু গাড়ি থেকেই বললেন—পাতিয়া এক্ষুণি একবার মর্গে আয়। গাড়ি চলে গেল। পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল একটা চেয়ে নিয়ে গেল লাসকাটা ঘরে। সেখানে পৌঁছুতেই সেই অচেনা লোক পাতিয়ার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল তোকে যা বলব করে দিতে হবে। পাতিয়া বলল—আমি একা কী করব? ডাক্তার দারোগা তারা সেখানে আছে। লোকটি তখন পাতিয়াকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে এক দারোগাও উপস্থিত। অবাক হয় পাতিয়া। কোন মৃতদেহ দেখতে পায় না। বেশ কিছুক্ষণ পর

একটা মৃতদেহ আসে সেখানে। অপূর্ব সুন্দরী এক বৌ। গাড়ি থেকে মৃতদেহটা লাসঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কোন কাটাছেঁড়া করতে হল না। শরীরে অবশ্য কোন ক্ষত বা কাটা জখমের চিহ্ন দেখা গেল না। শুধু দাগ একটা গলায়। খুব লক্ষ্য করলে তা দেখা যায়। পাতিয়ার মনে হল গলা টিপে খুন করা হয়েছে। অনেকক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। বুঝে উঠতে পারল না কেন এই সুন্দর ফুলটা অকালে ঝরে গেল। এমুখ তো কারো ক্ষতি করতে পারে না। পাতিয়া তার জীবনে অনেক কিছু দেখেছে। সন্দিগ্ধ স্বামী খুন করেছে স্ত্রীকে অথবা পরকীয়া প্রেম স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। পাতিয়া দেহে যা দেখেছে ডাক্তারকে সেই রকম বলেছে। অপ্রিয় আব্দার, অর্থের লোভ বা প্রলোভনও না আসা হয়নি। পাতিয়া নিজেকে সংযত রেখেছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি পাতিয়া। একদিকে অর্থ। তা প্রত্যাখান করলে ডাক্তারবাবুর রিপোর্টে চাকরি হারানো। পাতিয়াকে কিছুই করতে বলা হ'ল না। শুধু সাক্ষী হ'য়ে থাকা একটা যুবতী সুন্দরী বৌ-এর ময়না তদন্তের। কিছু কাগজপত্রে লেখালেখি আর পাতিয়ার সই নেওয়া। তারপর মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল গাড়িটা। ডাক্তারবাবুও চলে গেলেন অন্যান্যদের সঙ্গে। পাতিয়া উদাস হয়ে বসে থাকল। কতক্ষণ খেয়াল নেই। হাতে কিছু টাকার নোট। গুনে দেখতেও ইচ্ছা হ'ল না তার। ভাবনার মধ্যে ডুবেছিল। শিক্ষা ও অর্থের স্বরূপ দেখে আতঙ্কিত শুধুমাত্র কোন রকমে সই করতে জানা অশিক্ষিত এক ডোম। কত টাকা ডাক্তার আর দারোগা পেল যার জন্য আজ এই ব্যবস্থা। এক সাধারণ ডোমকে আশাতীত এই টাকা যারা দিতে পারে তারা কত দিতে পারে ডাক্তার আর দারোগাকে সে অঙ্ক পাতিয়ার জানা নেই। তা জানার কোন ইচ্ছাও নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে একসময় সম্বিত ফিরে এসেছে। সে তার বাড়ির কাছে একটা পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ছট পূজা হয়। একটা কাগজে সেই টাকা আর একটা পাথর রেখে ফেলে দিয়েছে পুকুরে। ঘরে ফিরে এসেছে তখন রাত বারোটা। অন্যদিনের থেকে বেশি মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠেছে সকাল দশটায়। হাসপাতাল থেকে ডাক এসেছে। বডি এসেছে। এরপরও কাটাছেঁড়ার কাজে মন দিতে পারেনি। ডাক্তার তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে কাজে অবহেলার। তদন্ত হয়েছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। বাধ্য হয়েছে মেথরের কাজ করতে।

পাতিয়া কেন মদ খেত জানতে চেয়েছি একদিন। তার নিজের জীবনও বড় কষ্টের। প্রথম যখন কাটাছেঁড়ার কাজ নেয় তখন সামান্য মদ খেত। একটু না খেয়ে থাকতে পারতো না। দিনে কাটাছেঁড়ার কাজ। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু—ছেলে বা মেয়ে যারই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে কাটাছেঁড়া সেলাই এসব কাজ করতে হয় দিনের যে কোন সময়। তারপর সেই প্রতিক্রিয়ায় মাথা উগ্র হয়ে যায়। মদ না খেলে ঘুম আসে না। মৃতদেহের মুখগুলো চোখের সামনে ভাসে। ডোমেদের সমাজ তাকে ঠিক মেনে নিতে পারত না। সামনে কথা বললেও দূরে দূরে রাখার একটা মানসিকতা ছিল। পাতিয়ার বিয়ে হয়েছিল যখন তার বয়স উনিশ কুড়ি। বৌ-এর নাম ছিল বিলাসীয়া। তার বয়স তের-চৌদ্দ। বিয়ে হলেও বিলাসীয়া তিন চার বছর বাবার বাড়ি উখরায় থাকতো। এটাই নাকি ওদের নিয়ম। পাতিয়া চাকরি পাবার পর বিলাসীয়া আসে তার কাছে। এক বছরও সে থাকেনি স্বামীর কাছে। তার কাজ বিলাসীয়া পছন্দ করত না। মনে হ'ত স্বামীর গা থেকে মড়া দেহের গন্ধ আসছে। স্বামীর সঙ্গে শুতে চাইত না। পাতিয়া বিছানায় শুতে ডাকলে বিনা কারণে চিৎকার করে লোক ডাকত। সবাই ভাবত স্বামী বোধ হয় প্রচুর মদ খেয়ে বৌকে মারছে। মিথ্যে করে বলতো যে স্বামী তাকে মেরেছে। পাতিয়ার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেত পাড়া পড়শীদের। এরকম দু একবার ঘটে যাওয়ায় পাতিয়া দূরে দূরে থাকতো

স্ত্রীর কাছ থেকে সারা দিন। রাত করে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে আকণ্ঠ মদ খেত। কোন এক সময়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। মাটির বিছানা আর আকাশ হত মশারী। সারাদিন ও রাত্রি কোন খোঁজ রাখতো না বিলাসীয়ার। পুরুষহীন জীবন স্ত্রী কিন্তু কাটাতে পারেনি। বিলাসীয়ার জীবনে একদিন এসেছিল অন্য এক পুরুষ। পাতিয়ার ঘরের কাছেই ছিল তার ঘর। নাম ছিল পূরণ। কাজ করত পিয়নের। পুলিশের বড় সাহেবের অফিসে। সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান, তার সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদ। চলনে-বলনে চৌকশ। বিলাসীয়ার তাকে চোখে পড়তে দেরী হয়নি। প্রথম আলাপ। তারপর সারাদিনের একাকীত্বের সুযোগ পূরণ নিতে দ্বিধা করেনি। পূরণ ও বিলাসীয়া একে অপরের খুব কাছে এসেছিল। এসব কথা পাতিয়ার কানে তুলে দেবার লোকের অভাব ছিল না। পাতিয়া শুনেও কিছু করত না। ভাবতো কি হবে প্রতিবাদ বা ঝগড়া করে। সে যা কাজ করে তাতে কোন মেয়েই তার সঙ্গে ঘর করবে না। জোর করে তো স্ত্রীর কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করা যায় না। এই ভাবেই চলেছে আট ন মাস। একদিন হঠাৎ বিলাসীয়া পূরনের সঙ্গে পালিয়েছে। পাড়া পড়শীরা নিজের নিজের সংসারের কথা ভেবে পূরণ ও বিলাসীয়ার এই মেলামেশা পছন্দ করেনি। তাদের প্রতিবাদেই তারা আর থাকে নি। তারপর থেকে পাতিয়া নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে। মৃতদেহ কাটা-ছেঁড়ার পর সেলাই করার মজুরী যা পেত তা মদ খেয়েই শেষ করেছে। কাজও করে গেছে বছরের পর বছর বরখাস্ত হবার দু বছর আগে পর্যন্ত। নিজের দুঃখ কষ্ট যা কিছু নিজের মধ্যে রেখেছে।

সব থেকে অসৎ কাজ সে জীবনে যে একটা করেছে তার জন্যই শুধু তার মনে দুঃখ। আমাকে বলেছে—হুজুর, সেই সুন্দরী যুবতী বৌটার মুখ আর গলার দাগ আমি কোন দিন ভুলতে পারি না। মনে অনুশোচনা আসে। সেদিন যদি চিৎকার করে বলতে পারতাম—দেখুন সবাই এক শিক্ষিত ডাক্তার আর দারোগার কীর্তি। টাকার জন্য এরা ইমান বেচে দেয়। চিৎকার যদি করতে পারতাম তাহলে সেই অবলা নিষ্পাপ মেয়েটাকে যে খুন করেছে তার বিচার হত। সাজা হ'ত। আমি তা পারিনি চাকরি যাবার ভয়ে। স্বার্থপরতায়। কিন্তু সে চাকরি তো একদিন গেল। সেদিনই যদি বরখাস্ত হতাম মনে অনেক শান্তি হ'ত। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বোধ হয় পাষাণ হয়ে যাব। পাতিয়ার জন্য দুঃখ হ'ত যখন বেকার হ'য়ে ঘুরত। আমার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততো। জানতাম আমার কাছ থেকে যা পাবে তা তার মদে চলে যাবে। তবুও তাকে না দিয়ে পারতাম না। কেন জানি না মনটা দুর্বল হয়ে যেত। বেশিদিন পাতিয়া বাঁচেনি। শুধু মদ খেয়ে কদিন আর বাঁচা যায়।

পাতিয়া যে সুন্দরী বৌ-এর কথা বলেছে তার সময় হিসেব করলে মনে হত সে বিমলা নয়তো। নন্দগোপাল তার ছেলে মদনগোপালের জন্য যাকে বৌ করে এনেছিল। তার মৃত্যু শুনেছিলাম সেই রকম একটা সময়ে। বড়লোকের সুন্দরী এক পুত্রবধূর মৃত্যু প্রথমটায় সবাই স্বাভাবিক জানতো। কিন্তু বিমলার বাবা মৃত্যুর পরে সন্দেহ নিয়ে নানা জায়গায় অনুসন্ধান করেছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। উকিল মহলে এরকম একটা অলোচনা হয়েছিল। সব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল এক সময়ে। পাতিয়ার কাছে ঐ ঘটনা শুনে মনে হচ্ছিল সেই সুন্দরী বৌ নিশ্চয় বিমলা। তা যদি হয় তাহলে সে মৃত্যু রহস্যই থেকে গেল। জানা গেল না কেন সে খুন হয়েছিল। এক ডাক্তার ও এক দারোগা মিলে যে কাজ করে ছিল তাতে তাদের কোন শাস্তি নিশ্চয় হয়নি। কোন এক অদৃশ্য বিচারকের হাতে শাস্তি পেল শুধু নাথুরাম। লাসকাটা ঘরে এক জীবিত মানুষ এই নাথুরাম বা পাতিয়া। কত মৃত্যুর সাক্ষী। আদালতে তাকে আসতে হয় না। সমাজ তাকে ঘৃণা করে। বিচিত্র নাথুরামদের মত মানুষদের জীবন। অজ্ঞাত তাদের

অনুভূতি। নাথুরামরা মনে হয় বেঁচে থাকে চিরকাল তাদের দুঃখ বেদনা নিয়ে। লাসঘর যতদিন থাকবে নাথুরামেরাও বেঁচে থাকবে একাধারে প্রয়োজন ও পতিত হয়ে।

রাজপুত

সিউড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রাম। গ্রামের নামটা প্রয়োজনীয় নয়। কারণ অনেকটা সত্য ঘটনায় স্থান কাল পাত্রটা পরিবর্তন করার সুপরামর্শ পেয়েছি খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনায়। যাক সে গ্রামের নামের কথা। সেই গ্রামে বাস করতেন গিরিজা সিং। তাঁর পদবী সিংহ নয়। বরং কেউ তাঁর পদবী সিংহ লিখলে গিরিজাবাবু খুব রাগ করতেন। নিজেকে তিনি রাজপুত ব'লে পরিয়ে দিতেন। তাঁরা কি ধরনের রাজপুত তা আমার ধারণার মধ্যে ছিল না। কত পুরুষ আগে তাঁর পূর্বপুরুষরা বীরভূমের এই গ্রামে এসেছিলেন বা তাঁদের আদি বাসস্থান আসলে কোথায় এই নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা নেই। কারণ এই গল্পের জন্য তার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু চরম জেদী স্বভাবের জন্য এই রাজপুতরা সাধারণ বাঙালীদের থেকে পৃথক। এই গিরিজা সিং এক সময়ে খুব মামলাবাজ ছিলেন এবং আমার পেশার প্রথম দশ বছরে আমাকে দিয়ে যে কত মামলা করিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একটা মামলা দায়ের করার পর যে পরের দিন ধার্য হ'ত সেই দিন তিনি আরো দুটো মামলা করতেন। এইভাবে এক বছরের মধ্যে দেখা গেল চল্লিশ বিয়াল্লিশ মামলা তিনি করে ফেলেছিলেন। কোন মামলায় আসামীদের সাজা হয়নি যদিও এক একটা মামলায় দশজন-পনেরো জনকে অভিযুক্ত করতেন। নিজে বাদী হয়ে কখনো কোন মামলা করতেন না পাছে উকিলে তাকে নানা জেরা করে। তাঁর নিজস্ব পেটোয়া কিছু মানুষ ছিল তারাই বাদী হয়ে মামলা করত। কারো সাজা হয় না এত টাকা খরচ করার পর তা নিয়ে গিরিজা সিং-এর কোন আপসোস হত না। বরং তাঁর একটা সুখ বোধ ছিল মামলার ভয়ে গ্রামের বহু মানুষের মধ্যে তার প্রতিপত্তি বজায় থাকতো ভীতির কারণে। বেশ চলছিল। একসঙ্গে উপার্জন এবং অভিজ্ঞতা লাভ আমার পক্ষে তখন জরুরী ছিল। কিন্তু যেদিন বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে আলাদা হ'ল গিরিজা সিং কোর্ট থেকে বহুদূরে চলে গেলেন। শেষদিন আমায় বললেন মারদাঙ্গার মামলা করে আর লাভ নেই। জমির মামলার বিচারক তাঁর কোন ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিবেশটাও বদলে গিয়েছিল। জমিহীন এক নতুন জমিদার শ্রেণী হ'তে শুরু করল তাঁর ছেলের বয়সীরা। তারপর গিরিজা সিং এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি প্রায় পনেরো বছর।

গিরিজা সিং পনেরো বছর পর একদিন হঠাৎ এলেন আমার কাছে। মামলা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হঠাৎ এ ইচ্ছা হ'ল কেন? জিজ্ঞেস করলাম। বললাম এতদিনে তাহলে মুন্সেফের বিচারে বিশ্বাস এল। গিরিজা সিং একটু ম্লান হাসি হাসলেন। তারপর বললেন এক ঘটনা। জানতে চাইলেন সেই ঘটনার জন্য মামলা করা যাবে কি না। তাঁর কাছে যা শুনলাম তাতে তাঁকে কোন মামলা করে সাহায্য করা যাবে না অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তিনি অক্ষমতার উত্তরে শুধু একটাই প্রশ্ন করলেন—দিনদুপুরে পাঞ্জাব থেকে পুলিশ এসে আমার

ছেলে ও বৌমাকে ধরে নিয়ে গেল আর তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না? আমি বললাম—কোন নালিশই আপনার করা যাবে না। আইনের এই দুর্বলতা আমাকে অক্ষম করল। অনেক ভনিতা হল। এবার গল্পে আসি।

গিরিজা সিং নিজে চরম মামলাবাজ হলেও তাঁর একমাত্র ছেলে শৈলজা সিংকে আদর্শ পুরুষ করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। স্কুল ও কলেজে শৈলজার মত মেধাবী ছাত্র ঐ তল্লাটে আর দুটো ছিল না। শুধু লেখাপড়াই নয় খেলা, আবৃত্তি নাটক সব কিছুতে শৈলজা ছিল প্রথম। স্কুলে যে কত পুরস্কার পেত ভাবতে পারা যায় না। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে সায়েন্স নিয়ে ভালভাবে পাস করলেও নানা কারণে পশ্চিমবাংলায় কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হ'তে পারে নি। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসা ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েছিল। ফলে ডাক্তারী পড়তে শৈলজাকে পশ্চিমে বাংলার বাইরের এক রাজ্যে ডোনেসান দিয়ে ভর্তি হতে হয়। ছেলের জেদ বাবার মতোই। শৈলজা ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে যেতে রাজি। কিন্তু বয়সের কারণে গিরিজাবাবুর যুবাকালের মতো জেদ ছিল না। ইচ্ছা না থাকলেও ছেলের জেদের কাছে নত হতে হয়েছিল তাঁকে। তাছাড়া ভেবেছিলেন পড়ার জন্য তো ক'বছর মাত্র। তারপর তো শৈলজা ফিরে এসে এখানেই ডাক্তারী করবে। কাছেই সিউড়ী শহর। সেখানে শৈলজা ডাক্তারী করলে তার বাবা-মা ছেলের কাছেই থাকবেন। এই সব নানা কথা চিন্তা করে গিরিজাবাবু বহু জমি বিক্রির টাকায় শৈলজাকে ভর্তি করলেন আর ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা ফিক্সড ক'রে মাসিক খরচার একটা ব্যবস্থা করলেন শৈলজা। পড়তে গেল ডাক্তারী। সকলেরই চরম উ'ৎসাহ। যাবার দিন দশেক আগে থেকে গ্রামের বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে শৈলজার নেমতন্ন। এক এক দিন এক এক বাড়ি। গ্রামের লোক সকলেই গিরিজাবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এতদিনে তিনি একটা কাজের কাজ করলেন। গিরিজাবাবুরও গর্ব হতে লাগল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে।

শৈলজা সেখানে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে বেশ ভাল ভাবেই পড়াশোনা করতে লাগল। পরীক্ষাগুলোতে ভাল রেজাল্ট হ'ল। বেশি বন্ধু ছিল না তার। জলন্ধরের ছেলে যশবীর সিং তার একমাত্র বন্ধু। যা কিছু মেলামেশা তার সঙ্গেই। যশবীর ও শৈলজাকে খুব ভালবাসতো। শৈলজা বাড়িতে নিয়মিত চিঠি দিত। দুর্গা পূজা যা অন্য লম্বা ছুটিতে বাবা-মার কাছে গ্রামের বাড়িতে থাকতো। হই হুল্লোড় করে যেত। তারপর একদিন ডাক্তারী পাস করলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল একটা। পশ্চিমবাংলায় না আছে চাকরির সুযোগ না স্বাধীনভাবে ডাক্তারীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। সব ক্ষেত্রে রাজনীতি ঢুকে গেছে। কাউকে না ধরে বা ঘুষ না দিয়ে চাকরি অসম্ভব। হাসপাতালের চাকরি না পেলে পসার জমবে না। কারণ সকলেই ভাবে হাসপাতালের বেড তো ডাক্তারের হাতে। একদিকে সরকারী ডাক্তারের সীমাহীন উপার্জন দুই দিক থেকে আর অন্য দিকে বেসরকারী ডাক্তার বছরের পর বছর ফাঁকা চেম্বারে মাছি মারে। কোন রোগী আসে নি পাঁচ বছরে এমন ডাক্তার মানুষের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ হয়ে উপবাস করতে পারে না। তাছাড়া বিশ-ত্রিশ বছর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তার এক ছোট মফস্বল শহরে তিন চারটে। তারাই সরকারি ডাক্তারের থেকে বহু কম উপার্জন করে। শৈলজার মেডিকেল ছাত্রজীবনের শেষ দুবছর সেই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। তার আগে এটা তার চিন্তায় আসেনি। যশবীর সিংকে সে বলতো সে সব কথা। যশবীর বলতো আমাদের পাঞ্জাবের যে কোন জায়গা অনেক ভাল। রাজনীতির বা ভ্রষ্টাচারের চেয়েও মানুষের গুণের কদর এখনও আছে। বলতো—আরে ইয়ার চলে আও হামারা পাঞ্জাব মে—কোই তকলিফ

নেহি হোনে দুঙ্গা।

সেটাই শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। শৈলজা শেষে জলন্ধরেই গিয়েছিল। যশবীর তার প্রতিশ্রুতির মর্যাদাও দিয়েছিল। জলন্ধরে যে তিনবছর শৈলজা ডাক্তার হয়ে কাজ করছিল সেই সময়ে তার আলাপ হয় মন্দিরা কানোয়ারের সঙ্গে। মন্দিরা কলেজে পড়তো। তার বয়স তখন একুশ। প্রথম আলাপেই দুজনের মধ্যে একটা আকর্ষণ এবং ধীরে ধীরে প্রেমের জন্ম হয়। শৈলজা ও মন্দিরা খোলামেলা মিশতো। মন্দিরার মা শৈশবে মারা গেলে তার বাবা আবার বিয়ে করে। সৎ মায়ের সঙ্গে মন্দিরার খুব ভাল সম্পর্ক না হলেও খুব একটা খারাপ ছিল না। মন্দিরার সৎ ভায়েরা দিদির প্রতি ছিল উদাসীন। ইতিমধ্যে মন্দিরার বাবা মারা যায়। শৈলজা ও মন্দিরার মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকে। দুজনেই বিয়ে করবে ঠিক করে। কিন্তু জলন্ধরে সে বিয়ের নানা অসুবিধা। এই ভাবেই কাটতে থাকে দিন। শৈলজা মন্দিরার কথা জানাতে পারে না চিঠিতে। এমনকি দুচারদিনের জন্য বাড়িতে এলেও সে গিরিজাবাবুকে, এমনকি শৈলজার মাকেও কিছু বলতে সাহস পায় না। গোঁড়া পরিবার এক পাঞ্জাবী মেয়েকে গ্রামীণ পরিবেশে পুত্রবধু হিসেবে নিশ্চয় মেনে নিতে পারবে না। এই ভয়টা শৈলজাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে সব সময়। মন্দিরার কথা তাই গোপন রেখেছে। কিন্তু এমন একটা সময় এসেছে যখন শৈলজাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছে মন্দিরার চাপে। স্থির করেছে অবশেষে দুজনেই জলন্ধর ছেড়ে চলে আসবে শৈলজার গ্রামে।

শৈলজা ও মন্দিরাকে এক ভোরে বাড়ি ঢুকতে দেখে গিরিজাবাবু ও তাঁর স্ত্রীবিস্ময়ে হতবাক। গ্রামের বহু মানুষ জমায়েত হয়েছে বাড়ির বাইরে। মন্দিরা শাড়ি পড়েছিল। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারে নি যে পাঞ্জাবী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরা সকলের মনের মধ্যে সামান্য স্থান করে নিয়েছে। মন্দিরার চোহারায় একটা মাধুর্য শৈলজার বাবা ও মাকে মুগ্ধ করেছে। তারপর মন্দিরা যখন ভাঙা ভাঙা হিন্দির টানে বাংলায় আগের শেখা দু'চারটে কথা বলেছে সকলের মতো মন্দিরার প্রতি সহানুভূতি এনেছে। শৈলজা সব কথা বলেছে মাকে। মা বুঝিয়েছে বাবাকে—ছেলেকে তো হারাতেই হবে যদি বিয়েতে অমত করা হয়। গিরিজাবাবুর মনে মন্দিরার প্রতি একটা কন্যাস্নেহ আগে থেকেই জন্মেছে। গ্রামের সমাজকে গিরিজাবাবু কোনদিনই প্রাধান্য দেননি। আজও সে নিয়ে কোন ভাবনা ছিল না। সাতদিনের মধ্যেই গ্রামের দুর্গা মন্দিরে হোম সপ্তপদী ইত্যাদি হিন্দু বিয়ের সব অনুষ্ঠান করেই বিয়ে হয়েছে। মন্দিরা পাঞ্জাবী মেয়ে হয়েও সে এত ভাল হতে পারে কেউ চিন্তাই করতে পারেনি। এত অল্প সময়ে সকলকে আপন ক'রে নিয়েছে সে। আরো পনেরো দিন কেটেছে। সিউড়ীতে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করার দিন স্থির হয়েছে। ঠিক তার আগের দিন ভোরে অন্ধকার থাকতে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে দরজায়। চারজন পাঞ্জাবি পুলিশ বাড়ির লোকজনকে ডাকিয়ে দরজা খুলিয়েছে। বহু মানুষ জমায়েত হলেও চারজনের হাতের রিভলবার দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি। শৈলজা ও মন্দিরাকে গাড়িতে তুলে সকলের সামনে থেকে নিয়ে চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে—জলন্ধরে কোর্টে যেতে। সেখানকার থানায় নাকি একটা পুলিশ মামলা দায়ের হয়েছে। তার খানিকটা পর গিরিজাবাবু সিউড়ী থানা এবং এস. পি সাহেবের কাছে গেছেন। তাঁরাও বিস্মিত হয়েছেন। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। গিরিজাবাবু সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছেন মন্দিরার এক সৎ ভাই গুরু বক্স সিং শৈলজার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন শৈলজা তার বোন মন্দিরাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে বলাৎকার করার উদ্দেশ্যে মন্দিরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

সেটা মন্দিরা জলন্ধর থেকে চলে আসার পাঁচ দিন পর। গিরিজাবাবু মন্দিরার ব্যবহার দেখে বিশ্বাস করেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হয় নি। মন্দিরা সাবালিকা তার যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে। সেটাই আইন। তবে কেন অন্যায় ও বেআইনীভাবে পাঞ্জাব পুলিশ শুধু শৈলজাকেই অভিযুক্ত করে পাঠাল? মন্দিরাকে বিচারকের কাছে হাজির করলেই সত্য প্রকাশ পেত। কেনই বা জলন্ধরের উকিল বলল তিনমাসের আগের শৈলজা তো জামিনে মুক্তি পাবে না। পরেও পাবে কি না বলা যায় না। গিরিজাবাবু বহু মামলা করা আইন বোদ্ধা এক পুরুষ। পুলিশকে এতটা অসৎ দেখেননি। মিথ্যা ছিল সেকালেও কিন্তু আজকের মিথ্যার যে বন্যা বয়ে চলেছে তার অভিজ্ঞতা গিরিজাবাবুর নেই। তাই তিনি শৈলজার ঘটনা উপলব্ধি করতে পারেন না।

আমি আদালতে দেখা বহু ঘটনা থেকে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে গিরিজাবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা...'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' সেটা আদালতে যে কতখানি গ্রহণযোগ্য তা আমি যেমন বুঝি অন্যপেশার মানুষ বোঝে না। মন্দিরার জবানবন্দিতে পুলিশ কি লিখে রাখল তার ওপরই বিচার করার ক্ষমতা নিয়ে এক বিচারক অসহায়। তদন্তকালে যদি পুলিশ মন্দিরাকে জবানবন্দির জন্য কোর্টে না পাঠায়, বিচারক কী করবেন?

পুলিশের নথিতে যা লেখা থাকবে তা দেখে অভিযুক্তকে কত মাস কি বছর থাকতে হয় কারাবাসে তার স্থিরতা নেই। শৈলজার ভবিষ্যৎ ডাক্তারী জীবন হয়তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, গিরিজাবাবুর ও স্ত্রীর হয়তো দুঃখের যন্ত্রণায় অকালমৃত্যু হবে, মন্দিরার মনে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে, হয়তো উন্মাদ হয়ে যাবে এক পবিত্র প্রেমের মূল্য দিতে। কিন্তু কে লাভবান হবে? তার উত্তর হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

পুলিশের খাতায় কী লেখা হয়েছিল সেটা জেনেছিলাম একমাস পর। শৈলজা ও মন্দিরাকে নাকি পুলিশ একসঙ্গে গ্রেপ্তার করেছিল জলন্ধর স্টেশন থেকে। বীরভূমের এক গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার কথা সম্পূর্ণ গোপন করেছে পুলিশ। মন্দিরার সম্বন্ধে পুলিশ জানিয়েছিল তার মানসিক অবস্থা ও শরীরের কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন তাঁরা। পুলিশের এই রিপোর্ট পড়ে বিচারক খুব খুশি হয়েছিলেন পুলিশের তৎপরতা ও মানবিকতার জন্য। জানি না সে দারোগার পদোন্নতি হয়েছিল কি না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পেশা বেশিদিন আমাকে মন খারাপ রাখতে দেয় না। নিত্যনতুন ঘটনা ও মামলায় অতীতের অনেক কিছু সব সময় মনে থাকে না। বহু বছরের পেশার জীবন আমাকে দিয়েছে এক বিশেষ শক্তি। মামলা করার পর কারো ফাঁসি বা যাবজ্জীবন দণ্ড হলে মনে তার কোন রেখাপাত করে না। হয়ত করা চলেও না। কারণ পরেই হয়তো অন্য মামলা করতে হয়, মন খারাপ নিয়ে পরবর্তী অভিযুক্তকে যথার্থ সাহায্য দেওয়া যায় না। এই মানসিকতা নিয়ে সাময়িক ভুলেই ছিলাম।

প্রায় পাঁচ মাস পর আবার গিরিজাবাবু এলেন। একা নয়, সঙ্গে শৈলজা ও মন্দিরা। বিস্মিত হবার হয়তো কিছু বাকি ছিল যা জানলাম তা সহজে ভাবা যায় না। মন্দিরার বাবার বাড়ি, সম্পত্তি ছাড়াও বাবা এবং মন্দিরার নামে ব্যাঙ্কে জয়েন্ট ফিক্সড ডিপোসিট ছিল একলক্ষ টাকার এবং তার একটা ম্যাচুরিটি ভ্যালুও ছিল। মন্দিরা জলন্ধর ছাড়ার পর তার সৎমা ও সৎ ভাই আশঙ্কা করল এসবই তো ভোগ করবে শৈলজা, এক বাঙালী এবং সেটা তাদের চোখের সামনেই। নানা ভাবনা-চিন্তা করে স্থানীয় পুলিশকে প্রলোভন দিল তাকেও অর্থের একটা বড় অংশ দেবে। বুদ্ধি ও পরামর্শ দিল পুলিশ। লিখিত অভিযোগ নেওয়া হ'ল যাতে পুলিশের কোন ক্ষতি না হয়। বাকি বুদ্ধির কাজ পুলিশের। হাসপাতালে মন্দিরার কাছে গেল সৎ ভাই।

তার শুধু চাহিদা বাড়ি সম্পত্তির নিজের অংশ মন্দিরা দলিল করে দেবে আর ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তুলে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে বাকিটা মা ও ভাইকে দেবে। প্রতিশ্রুতি দিল শৈলজার বিরুদ্ধে মামলা আর থাকবে না। শৈলজার প্রতি প্রেম, তারই জন্য তার কারাবাস। শৈলজার বাবামায়ের স্নেহ তখন মন্দিরার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। মন্দিরা তাই করেছে। তারপর মন্দিরাকে বিচারকের কাছে জবানবন্দির জন্য পাঠিয়েছে হাসপাতালে থাকার কয়েকদিন পর। মন্দিরা সত্য কথা বলেছে। তারপর পুলিশ সেই জবানবন্দির ভিত্তিতে একমাস পর শৈলজাকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা করেছে এবং বিচারক তাকে মুক্তিও দিয়েছেন।

মানুষ চরিত্র দেখেছি অনেক। কিন্তু গিরিজাবাবুর মতো মানুষ খুব কম দেখেছি। বিশাল এক ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসেবে দেখেছি, বিরাট চেহারার সঙ্গে বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি। বহু মামলা মোকদ্দমা করেছেন বজ্র কঠিন শক্তি নিয়ে। তখনও ছিল বিস্ময় তারপর তাকে অনেক বছর দেখিনি। কিন্তু যখন দেখলাম বার্ধক্য কেড়ে নিয়েছে তার অনেক কিছু। শরীর যেমন ভেঙেছে তেমনি হারিয়েছেন মনোবল। যে গিরিজা সিং মামলা তৈরি করতেন, ঘটনা সাজিয়ে সাক্ষী উপস্থিত করে বীরবিক্রমে কোর্টে চলা ফেরা করতেন, সেই মানুষ যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজের দিশাহীন নাবিক। কিন্তু তার মধ্যেও মুখে একটা প্রশান্তি। তৃপ্তি রয়েছে মনে। স্নেহের পাত্রী মন্দিরার প্রতি যেন শ্রদ্ধা। এত কষ্ট সহ্য করেছেন শৈলজার জন্য মনে, তবুও মন্দিরা যে কতখানি স্বর্থত্যাগ করতে পারে তা চিন্তার বাইরে। আমাকে বললেন—বৌমা কিন্তু একটা টাকাও নেয়নি তার প্রাপ্য থেকে। যেদিন মন্দিরাকে কোর্টে পাঠান হ'ল জবানবন্দি দেবার জন্য, শৈলজাকেও আনা হয়েছিল জেল থেকে। জবানবন্দির পর এক বস্ত্রে সে চলে এসেছে শৈলজার সঙ্গে। পথের যে সামান্য খরচ তা ধার নিয়েছে এক বান্ধবীর কাছে। আবার দুজ'নে ফিরে যাবে জলন্ধর। বুক ফুলিয়ে বাস করবে স্বামীর সঙ্গে। যশবীর সিং জানতো না মাঝের এসব ঘটনা। জানতে পেরে সে কোর্টে এসেছিল। সে দায়িত্ব নিয়েছে দুজনের জলন্ধরে বসবাস করার। এরপর তো আমার আর কোন অশান্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কথা কাঁটার মতো বিঁধছে। কোন মামলাই করা গেল না এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। তুমি একবার আমাকে একটা পরামর্শ দাও যাতে মামলা করতে পারি। আমি জলন্ধরে গিয়ে সে মামলা করব।

গিরিজাবাবুর কথা শুনে মনে হোল আগের গিরিজাবাবু যেন ফিরে এলেন। মামলা করার নেশা দীর্ঘদিন ত্যাগ করেও আবার নতুন করে পেয়ে বসল। সেটা নিশ্চয় মন্দিরার প্রতি স্নেহে, তার ন্যায্য প্রাপ্তির থেকে বঞ্চনার দুঃখে। আমি বললাম—এখন তো আপনি শৈলজা ও মন্দিরা সকলেই সুখী। সে সুখকে কেন নষ্ট করবেন মামলা করে? কিছুক্ষণ ভাবলেন গিরিজাবাবু।

তারপর বললেন—তুমি ঠিক বলেছ। কত মানুষকে কষ্ট দিয়েছি মিথ্যা মামলা করে। তাদের চোখের জলে তো অভিশাপ ছিল। নিজের দর্প, আর প্রতিপত্তির কথা আমাকে অন্ধ করেছিল বহুবছর। সেই অভিশাপের ফল বরং সামান্য পেয়েছি আমি। সুখ পেলাম সামান্য মনোকষ্টের পর। মন্দিরা মেয়ে হ'রে ফিরে এসেছে তার থেকে সুখের আর কী হ'তে পারে? ওদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হবে কাল। তারপর গ্রামে বৌভাত অনুষ্ঠান। তোমাকে যেতে হবে কিন্তু এরপর তারা বিদায় নিলেন।

বহু মানুষকে উপদেশ দিয়েছি মামলা না করতে। কিন্তু গিরিজাবাবুকে উপদেশ দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা কখনও পাইনি।

স্বীকারোক্তি

—আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ নই, বুঝেছেন?

—হ্যাঁ—

—আপনাকে কবে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?

—পরশু দিন সকালে।

—আপনি দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নন। কিন্তু যদি আপনি দোষ স্বীকার করেন তাহলে তার ভিত্তিতেই আপনার শাস্তি হ'তে পারে। বুঝেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে কেউ কোন প্রলোভন দিয়েছে বা ভয় দেখিয়েছে?

—না।

—কারো কথায় কি আপনি দোষ স্বীকার করতে চান?

—না।

—আপনি কেন দোষ স্বীকার করছেন?

—অনুশোচনায়।

—বলুন কি বলতে চান—

অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি। শহরের মানুষের মতো বুদ্ধি, কুটিলতা অভিনয় আমার জানা ছিল না। নিজে সরল বলে সকলকেই সরল ভাবতাম। আমার বয়স আঠারো হতেই বাবা-মা বিয়ের জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করল। দু-একটা পাত্রী দেখলো তারা। গাঁয়ের মেয়ে তাদের পছন্দ বেশি। কারণ আমাদের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শহরের কোন মেয়ে মানিয়ে নিতে পারবে না। এটা ছিল তাদের ধারণা। আমি তখন সবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে এক মফঃস্বল শহরে কলেজে ভর্তি হয়েছি। শহরে দেখি মেয়েরা রাস্তাঘাটে অবাধে চলাফেরা করে। পোশাক ও প্রসাধনে তাদেরকে গাঁয়ের মেয়েদের থেকে অনেক সুন্দরী মনে হয়। তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরানো যায় না। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রায় ছ মাস কাটল। শহরে যে সব মেয়েদের দেখি সবাইকেই সুন্দরী মনে হয়। গাঁয়ে যাদের দেখেছি তাদেরকে তুলনায় আনা যায় না। এমনি এক সময়ে একজনকে দেখলাম। এত সুন্দরী মেয়ে আগে কখনও দেখিনি। এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে এক গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে। মনের মধ্যে এক জেদ এসে গেল। নাম জানলাম রমা। প্রতিদিন তাকে দেখার জন্য একটা জায়গায় দাঁড়াই। রমা পথে যেতে যেতে একবার তাকায় আমার দিকে। তার এই চাউনি আমাকে পাগল করে তোলে। এটাই আমার জীবনে সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি। বাড়িতে ফিরে একদিন মাকে বললাম আমার মনের কথা, রমার কথা। মা, বাবাকে রাজি করালো। বাবা বলল—বিয়ে তুমি যাকে করতে চাও কর। কিন্তু দায়দায়িত্ব সব তোমার। আমার ঘরে আশ্রয় ও ভরণ-পোষণ দিতে পারি। এর বেশি কিছু নয়। আমি তখন প্রেমে অন্ধ। রমা আমাকে পছন্দ করে বা বিয়ে করতে রাজি কি না তা জানতেও চেষ্টা করি নি। একদিন সাহস করে রমার বাবার কাছে গেলাম। রমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তিনি কয়েকদিন সময় নিলেন ভাবার। হয়ত আমার সম্বন্ধে বা পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার খোঁজ নেবার জন্য। তারপর একদিন রাজি হলেন। আমার বাবা ও মা রমাকে দেখতে চাননি। বিয়ের ব্যাপারে কোন আগ্রহও দেখাননি। দিনস্থির করা বিয়ের যা কিছু ব্যবস্থা করা সবই আমাকে করতে হ'ল। রমার বাবা গরিব বলে বরযাত্রী

হিসেবে শুধু আমার দুজন বন্ধু এক পুরোহিত ও এক ভাণ্ডারী নিয়ে বিয়ে করতে এলাম রামপুরহাটে। গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে রাজগ্রাম স্টেশন। সেখান থেকে রামপুরহাটে। স্টেশনে গাড়ি নিয়ে এসেছিল আমাদের জন্য। বিলেতি গাড়ি। তখন অবাক হয়েছি। গরিব এক ব্রাহ্মণ কিভাবে এই গাড়ি পেল। কিন্তু সরল মন আমার। কোন খারাপ কিছু ভাবতে পারিনি। গাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটা অচেনা বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল। ভাবলাম প্রতিবেশী হয়ত সাহায্য করছে। আপ্যায়ন বা ব্যবহার খুব একটা ভাল লাগল না। তবুও মনে কোন সন্দেহের কারণ এল না। সব থেকে আশ্চর্য লাগল বিয়েবাড়িতে কোন মেয়ে বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নজরে এল না। বিশ-বাইশজন গুণ্ডা ধরনের ছেলে আমাদের ঘিরে রয়েছে। মুখে তাদের কোন হাসি নেই। এক সময় তারা আমাকে নিয়ে গেল বিয়ের ছাদনাতলায়। রমার বাবাকে কোথাও দেখছি না। সম্প্রদান করার জন্য এক অচেনা মানুষ। কোন শাঁখ বাজছে না। কিছুটা মন্ত্রপাঠের পর মুখ ঢাকা একটা মেয়েকে আনল সাত-আটজন। পিঁড়েতে বসা সেই মেয়েকে তুলে এনে আমার চারদিক ঘোরালো। তাকে দেখে রমা বলে মনে হল না। বেশ মোটা সোটা শরীরের গড়ন। শুভদৃষ্টির জন্য যখন নাপিত ছড়া কাটছে একটা চাদরের মধ্যে দুটি মাথা। শুভ দৃষ্টি হবে। একি! এতো রমা নয়। কুৎসিত এক মুখ। সারামুখে বসন্তের দাগ। গায়ের রং কালো কুচকুচে। বয়সেও মনে হ'ল আমার থেকে বেশ বড়। একবার দেখেই মুখ নামিয়ে নিলাম। আমার প্রতিবাদ করার শক্তি নেই। সেখান থেকে পালিয়ে যাব তার উপায় নেই। আমার বন্ধুদের পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন। এই অবস্থায় বিয়ের সব উপচার হ'ল। সংক্ষিপ্ত সব কিছু। হোম-সপ্তপদী সবই প্রায় জোর করে করালো। তারপর রাত্রি যখন তিনটে আমাকে ও সেই বউকে নিয়ে উঠল কয়েকজন। অন্য একটা গাড়িতে আটক অবস্থায় বন্ধুরা। গাড়ি চলতে লাগল অন্ধকারে। ভোরবেলায় আমাদের বাড়িতে সকলকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় ভয় দেখিয়ে যেতে ছাড়ল না। নতুন বৌকে ঘরে নিতে বাধ্য করল। প্রথমটা বাড়ির সকলে আমাকে ভুল বুঝল। শহরের মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে আমি পছন্দের যে পরিচয় দিয়েছি তাতে সকলেই অবাক। বন্ধুরা বিয়ের সমস্ত বিষয়টা প্রকাশ করলে তাতেও সকলে হতবাক হ'ল। বৌভাত করার যে আয়োজন করা হয়েছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি দুদিন ঘরে থাকলাম না। তিন দিনের দিন বাড়ি এসে বৌকে বললাম অষ্টমঙ্গলা করতে যাব কাল ভোরে। মনে মনে তখন স্থির করে ফেলেছি বৌকে খুন করব। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। যথারীতি অন্ধকার থাকতেই দুজনে বের হলাম রাজগ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরব। নির্জন পথ। কোন লোকজন নেই এমন একটা সময়ে একটা বড় পুকুরে গেলাম দুজনে। জলের কাছে গিয়ে গামছা দিয়ে বৌ-এর গলা বেঁধে জোরে গিঁট দিয়ে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেললাম। তারপর তার অসার দেহটা বড় গামছা আর একটা ভারী পাথর বেঁধে টানতে টানতে গভীর জলে নিয়ে গেলাম এবং জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। পুকুর থেকে ফিরে বাড়ির কাছে একটা মোটর গাড়ি দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলাম। ভয়ে আর বাড়ি ঢুকিনি। সারাদিন এখানে সেখানে কাটালাম। মনটা খারাপ হ'তে থাকলো। এক সময় মনে হল যাকে খুন করলাম তার হয়তো কোন দোষ নেই। রমাকে যদি কেউ ভালবেসে থাকে তাহলে সেও তো আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করতে পারে। বৌ বলে যাকে মারলাম তার হয়তো কোথাও বিয়ে হচ্ছিল না। এই ভাবে বিয়ে দিয়ে গাঁয়ের ছেলের চাঁদে হাত দেওয়ার কামনাকে উচিত জবাব দিল। অনুতাপ হ'তে লাগল। ভাবলাম আমার নিজের জীবন রাখার কোন অধিকার নেই। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি রেল লাইনে মাথা দিয়ে। কিন্তু মৃত্যু আসেনি। কিছু লোক দেখতে পেয়ে

আমাকে তুলে এনেছে রেল লাইন থেকে। তারপর ছুটে গেছি উকিলবাবুর কাছে। আমার কথা শুনে অবাক হয়েছেন। আমাকে উপদেশ দিয়েছেন থানায় আত্মসমর্পণ করতে। তিনি হয়ত আশঙ্কা করেছেন আবার যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে সত্যি প্রাণ হারাই। তাঁর কথা শুনে আমি থানায় গিয়ে স্বীকারোক্তি করেছি। পুলিশকে সাহায্য করেছি পুকুরে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করতে। এখন আপনার কাছে সব কিছু প্রকাশ করে মনটা হাল্কা হ'ল। আমি ইচ্ছা করে ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুন করেছি। তার জন্য যে শাস্তিই হবে আমার তাতে কোন দুঃখ নেই।

বীরু গোস্বামী স্বীকারোক্তি করেছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু পরে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। কয়েক দিন পর জেল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিতভাবে জানিয়ে ছিল যে পুলিশ ভয় দেখিয়ে সে স্বীকারোক্তি করিয়েছে। স্বেচ্ছাকৃত নয় সে সব কথা। তবুও বীরু গোস্বামীর যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল। পুলিশ যে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল তার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বহু সঙ্গতি ছিল। বীরুর পক্ষে যে উকিল ছিল তারও অনেক ত্রুটি ছিল। আমি তার মামলা নিতে পারিনি। কারণ সে আমার কাছেই এসে প্রথম বলে নিজের হাতে স্ত্রীকে খুন করার এবং নিজে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করার কথা। সম্পূর্ণ ঘটনা আমার কাছে সে বলেনি। আমিও প্রশ্ন করিনি কেন সে খুন করল। বীরুর বাবা পরে যখন আমার কাছে এসেছিল আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম—এ মামলা আমার করা সম্ভব নয়। পারিশ্রমিক যা চাইব তা দিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না তার। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি কি জবাব দেব সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন। আমারই কাছে যে দোষ স্বীকার করেছে। পুলিশের দ্বারা তখন ভীতি প্রদর্শনের কোন সুযোগ ছিল না। অনুতাপে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে সে। আবার যাতে সে তা না করতে পারে তার জন্য আমি পুলিশের কাছে পাঠিয়েছি। সে সত্যিকারের দোষী জেনে এবং আর একটা প্রাণ যদি আত্মহননের জন্য চলে যায় এই ভয়ে যে কাজ আমি করেছি পেশার স্বার্থে হয়ত তা করা উচিত ছিল না। তাছাড়া, আমি দোষ করেছি, খুন করেছি একথা আগে কোন অভিযুক্ত আমার কাছে বলেনি। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল অর্থই জীবনে সব কিছু নয়। সমাজের কাছে আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। প্রকৃত দোষীকে সুবিচার পেতে বা খুনের দায় থেকে মুক্তি পেতে হয়তো প্রকৃত সাহায্য দেবার শক্তি আমার থাকতো না।

বীরু গোস্বামীর শাস্তি হওয়ার পর বারবার একটা কথা মনে এসেছে। বীরুকে তো জেলে অনেকেই বলে থাকবে এই উকিল তোর সর্বনাশ করেছে, পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে, স্বীকারোক্তি করার পরামর্শ দিয়েছে। এখন তার বাঁচার একমাত্র পথ স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি অস্বীকার করা। সেও নিশ্চয় তা বিশ্বাস করেছে। সে বিশ্বাস আরো শক্ত হয়েছে যখন যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়েছে।

বীরুর জন্য দুঃখ হয়। তার ওপর যে প্রবঞ্চনা হয়েছে তাতে যে কোন মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু যতই প্রবঞ্চনার স্বীকার হোক না কেন খুন করার অধিকার তো তাকে দেওয়া যায় না। কোন উকিলের কাছে অনুশোচনায় যদি কেউ বলে আমি খুন করেছি তাহলে পেশায় আর্থিক স্বার্থে কি উচিত হবে তাকে স্বীকারোক্তি করতে নিষেধ করা? যদি নিষেধ আমি করতামও তখন যে অনুশোচনা বীরুর মনে এসেছিল তাতে সে তো আত্মহত্যাও করতে পারত। অথবা যারা জোর করে বিয়ে দিতে পারে তাদের পক্ষে বীরুকে খুন করে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া আমি তো পুলিশের কাছে পাঠিয়েছি পুলিশ তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সতর্ক করেছেন। ভাববার

সময় দিয়েছেন চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর আবার যখন সে এসেছে সতর্ক করেছেন। তারপর সে যা বলেছে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। বরং আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। বীরু যদি আমার কাছে না আসতো তাহলে আমি তার পক্ষ সমর্থন করার সাধ্যমত চেষ্টা করতাম। তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেতাম। বীরু মুক্তি পেলে আমার সুনাম হ'ত। কিন্তু সে খুন করেছে জানার পর আমি তার পক্ষ নিয়ে মামলা লড়তে কি বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতাম? তাকেও কি সুবিচার দিতে পারতাম? এখনো মাঝে মাঝে ভাবি কেউ এসে প্রথমেই যদি বলে আমি খুন করেছি তাহলে এক উকিলের কি সমস্যা হয়। অথচ সে যদি নির্দোষ প্রকাশ করে আসে তাহলে পেশার কোন ক্ষতি হয় না।

অন্য আর একটা দিকও আছে। বীরুর প্রতি যারা অন্যায় করেছে, একজনের বদলে অন্য এক কুৎসিত চেহারার বেশি বয়সের মেয়ের সঙ্গে গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে বীরুর। তারা যতটা অন্যায় করেছে তার প্রতিদানে বীরু তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে নি। আইনগত অন্য পথ খোলা ছিল। কিন্তু বীরু আইনটা নিজের হাতে নিয়ে অনেক কম অপরাধী এক মেয়েকে খুন করে জঘন্যতম অপরাধ করেছে। তাকে কি ক্ষমা করা যায়, না তার পক্ষ কোর্টে সমর্থন করা যায়? পেশা এবং বিবেক যখন সংঘর্ষে নামে তখন বিবেকেরই বোধ হয় জয় হয়। তার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি আছে পেশার উপার্জনে তা নেই।

মহামান্য জুরিবৃন্দ

মাঝে মাঝে ভাবি কেন গেলাম পাগলাগারদে। না গেলে দেখতে হ'ত না অবনীদাকে। জানতাম না তিনি রাঁচীর পাগলা গারদে আছেন। জানলে হয়ত যেতাম না। ডিসেম্বরের ছুটি। বেড়াতে রাঁচী। ডাক্তার বন্ধুর আমন্ত্রণে যাওয়া। তাতেই বিপত্তি। চেনা মানুষকে দেখলে কার না যেতে ইচ্ছে হয় তার কাছে। অবনীদাকে দেখলাম। আমাকে দেখে খানিকটা সময় নিলেন চিনতে। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। মনে হ'ল কেন এঁকে আটকে রেখেছে পাগল বলে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বুঝলাম অবনীদা পাষাণ হয়ে গেছে। আমায় বলল শিশির। তোকে একটা জুরি অ্যাড্রেস শোনাই। তারপর শুরু করল বলতে। শোনা ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নেই। অবনীদা শুরু করলেন। বললেন—ভাল না লাগলে উঠে যাব। কিন্তু উঠে গেলে আমি কষ্ট পাব। ভাবলাম এই অবনীদাকে কে বলে পাগল? বহু বছর একসঙ্গে প্র্যাকটিশ করেছি। একটা আত্মিক যোগ তো আছে। কষ্ট হয় হোক। তবু শুনব। অবনীদা আমার প্রায় দশ বছর আগে এই পেশায় এসেছেন। বহু বছর কাজ করেছি একসঙ্গে। কত ভাবে সাহায্য পেয়েছি। কৃতজ্ঞতাও তো থাকা দরকার। তাই শুনতে হল। তিনি আরম্ভ করলেন।

ভাবছি এই কি সেই অবনীদা। উনিশশো ষাট সালের প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী উকিল। যাঁকে ভয় করতো সাক্ষী, পুলিশ। যার কাছে জ্ঞান নেবার জন্য বিচারক ধৈর্য ধরে শুনতেন তাঁর-কথা। কি ব্যক্তিত্ব। কি সকলকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। গলার এক মোহময় মাধুর্য নিয়ে জুরিদের সামনে অভিযুক্তের পক্ষে আবেদন রাখতেন মুগ্ধ হয়ে জুরিরা শুনে যেতেন অবনীদার কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। 'বহু মামলায় নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে

অভিযুক্ত। শুধুমাত্র অবনীদার বাচন শৈলীতে। অন্যথায় তারা দোষী সাব্যস্ত হতেও পারত। তাঁকে দেখে মনে পড়তে লাগল কত ঘটনা। এত গুণী তবু নিরহঙ্কার। ভাবছি। হঠাৎ কানে এল **Gentlemen of the jury,**

মহামান্য জুরিবৃন্দ,

আমি অবনী মল্লিক। এতকাল ধরে কত মামলায় আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছি আপনাদের কাছে। আজ আমি বলব আমার কথা। জেলা কোর্টের এক উকিল আমি। প্রায় পঞ্চাশ বছর। ইংরেজ যুগে এসেছি পেশায়। স্বাধীনতা আন্দোলন দেখেছি। ইংরেজের নির্মম অত্যাচার দেখেছি বিপ্লবীদের ওপর। কত রক্ত ঝড়েছে দেশমাতার মুক্তির জন্য। কারাবাস হয়েছে শত সহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর। স্বপ্ন দেখেছি কত। দেশ স্বাধীন হ'লে চরিত্রবান স্বার্থত্যাগী শাসক হবে। মানুষের মঙ্গল ছাড়া তাঁরা আর কিছু ভাববে না। ধীরে ধীরে স্বপ্ন ভাঙতে শুরু হয়েছে। শেষে সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে আমি আয় করেছি যত, ব্যয় করতে হয়েছে বহুগুণ কম। যা কিছু সঞ্চয় করেছি তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে নিঃশেষ হয়েছে। অসৎ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সমাজ তৈরি হয়েছে। আপনারা এই পৃথিবীতে এসেছেন আমার অনেক পরে। আমি যে সুবর্ণযুগ দেখেছি তা দেখার হয়ত আপনাদের সুযোগ হয় নি। কিন্তু তবুও যে সমাজকে আপনারা দেখছেন তাতে নিশ্চয় আপনাদের কষ্ট হয়। সে কষ্ট আপনাদের থেকেও আমার বহুগুণে বেশি। কারণ সেই সব বিপ্লবীদের, আদর্শবান পুরুষদের, সৎ নিঃস্বার্থ মানুষদের আমি দেখেছি। আদর্শ শিক্ষকেরা যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে ভাবে চরিত্র গঠন করতে শিখিয়ে ছিলেন তার ফলে একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছিল আজ সেটাই দুঃসহ হয়েছে। নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না আজকের মানুষের সঙ্গে। সেটা আমারই দোষ তা স্বীকার করছি। এক বিচারক আমাকে একদিন বলেছিলেন—পাঁচ বছরেই ভেবে নিয়েছ উকিল হয়েছ? বিশ বছর শিক্ষানবিশী করে তারপর জেনো উকিল হয়েছ। আমি বিশ বছর মুন্সেফ হয়ে কাজ করে তবে সাবজজ হয়েছি। এইভাবে পাঁচ বছর থেকে আমি অবসর নেব। এখন আমি বলতে পারি আমি একজন বিচারক। দিন কয়েক আগে পাঁচ বছর ঠিক মতো প্র্যাকটিশ না করেও এক উকিল আমায় বলল—দাদু, আপনি পুরোন আইনের জ্ঞান নিয়ে কি বুঝবেন? আপনারা হয়তো ভাবছেন সার্থক উকিল অবনী মল্লিক এ কি কথা বলছে!

মহামান্য জুরিবৃন্দ,

আমি অবনী মল্লিক ঠিক কথাই বলছি। এটা মূল্যবোধের প্রশ্ন, বয়স্ককে সম্মান দেওয়ার প্রশ্ন, নিজের মধ্যে অহংভাবের প্রশ্ন। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সাধনা করেছি। সার্থক উকিল হব। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াব। তার জন্য সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবিনি। অর্থের বিনিময়ে আইনের সাহায্য দেওয়া ছাড়া আমি আর কী করেছি। কে কী উপকার পেয়েছে আমার কাছ থেকে। এ প্রশ্ন আমার নিজেকে। একথা ঠিক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমি কোন প্রতিশ্রুতি কারোকে দিইনি যেমন অনেকে দিয়েছে। কিন্তু পালন করেনি। কিন্তু আমি তা না দিলেও বিবেকের দংশন তো সহ্য করতে হয়। ল' ইজ এ জেলাস মিস্ট্রেস সেটা বুঝেছি জীবন দিয়ে। নিজের সংসারের দিকে তাকাইনি। সময় ছিল না। স্ত্রী প্রথম প্রথম অভিযোগ করত। বহুকাল ছেড়ে দিয়েছে। অভিযোগ ছিল সংসারের খরচটা সকালে দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ। ছেলে মেয়ে পড়ছে কি না। স্কুলে যাচ্ছে কিনা এসব তো কোনদিন ভাবনি। আমার কথা বাদ দাও। দাসীবৃত্তি করতে এই সংসারে আসা। সুখ-দুঃখের দুটো কথা বলার তো সুযোগই পেলাম

না। পসার বাড়ার আগেই বা কি, পরেই বা কি। সামাজিকতা করতে হয় তুমি কর, পুজো-আর্চা তুমি কর। এসব নানা কথা বলতো। কানে কি যেত সে কথা। মাথায় তখন কোন খুনের মামলায় কি ডিফেন্স নেব তারই দুশ্চিন্তা। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া সময় সময় বেদনাদায়ক। সকলেই ভাবে সীমাহীন আয় উপার্জন। স্ত্রী এখনও বলে এর থেকে ওকালতি না চলা অনেক ভাল। এটা অবশ্য রাগে বলে। কারণ সে ভালই জানে সংসার এমনি চলে না। উকিল যেমন একদিকে স্বামী অন্যদিকে বাবা। সবার সবদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যাকে চলতে হয় সেই জানে উপার্জন কত জরুরি। খ্যাতির সঙ্গে আয় বাড়ছে এটা ধরেই নেওয়া যায়। পরিবারের সকলের সাধ আহ্লাদ বেড়ে যায়। স্ত্রী প্রায়ই বলে—ছেলেমেয়েরা ভাবে বাবার এত রোজগার। সবই মায়ের কাছে থাকে। দাও মা—এটা আমার বহু দিনের সখ। তোমাকে বললে তুমি প্রথমত শোনার সময় পাও না। যদি পাও তাহলে বল এখানে কত ইনকামট্যাক্স দিতে হবে, কত টাকা দিতে হবে ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম। বলেই মোটা আইনের বই দেখতে শুরু করে দাও।

আমি স্ত্রীর এসব কথা শুনি। শুনি আরো অনেক কথা। দোষ স্বীকার করি। কারণ জানি ঐ অপরাধের কোন শাস্তি নেই। মাঝে মাঝে ভাবি কেন এই জীবনটা আমার হ'ল। মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। বাবা বলতেন—তোমাকে বরুণ দাশগুপ্ত হ'তে হবে। বরুণ দাশগুপ্ত সেকালের খ্যাতিমান ফৌজদারী উকিল জেলা কোর্টের। জেলার বাইরে যে একটা জগৎ আছে যেখানে উকিল ছাড়াও অন্য পেশার বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আছেন। অন্য বহু পেশার বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আছেন। তাছাড়া আইন পেশায়ও কলকাতা হাইকোর্টে কত খ্যাতিমান এডভোকেট ব্যারিস্টার আছেন। এখন দুঃখ হয় বাবার দৃষ্টিটা কেন বরুণ দাশগুপ্তের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। সান্ত্বনা দি নিজেকে এটাই আমার ডেস্টিনি। সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম আমি। কলকাতার কোন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক হলে পেশার এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ত না। আপনারা হয়তো ভাববেন পেশার আবার যন্ত্রণা কি। দিন কোর্টে আসেন। কত মামলা করেন। কোটের পকেট ভর্তি হয়ে যায় নোটের বান্ডিলে। সুখের অভাবটা কোথায়? আপনারা ঠিকই চিন্তা করেছেন। কিন্তু তা আজ থেকে বিশ বছর আগের অবস্থা। সেই সময়ের সঞ্চয় কিছু ছিল বলেই তো আজো আছি অস্তিত্ব নিয়ে। বিগত পঞ্চাশ বছরে সার্থক শাসক শ্রেণীর কৃপায় দ্রব্যমূল্য যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় আয় বৃদ্ধি হয় নি। তাই প্রতি মাসে আয় যদি পাঁচ হাজার টাকা শাসন গুনে ব্যয় আট হাজার টাকা। সোজা অঙ্ক প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা জোগান দিয়ে সঞ্চিত ছত্রিশ হাজার নিঃশেষ বছরে। আমাদের কোন প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই। জীবনবীমা সম্বল। যে ভাবেই হোক সেটা যেন মৃত পলিসি না হয়। আপনাদের হয়তো বিশ্বাস করা কঠিন হবে একজন জেলার খ্যাতিমান উকিলের বছরে আয় বৃদ্ধি কি না হয়? পেশার যে স্বর্ণযুগে এসেছিলাম তা যদি আজও থাকতো তাহলে আয় বৃদ্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেন তা হয় না? বহুবিধ কারণ আছে তার। অভিযুক্তরা ভয় পায় একটা বিষয়ে। ভাল উকিলকে বিশ হাজার টাকা ফি দেব। ভাল জেরা আর্গুমেন্ট হবে। ফল কি নিশ্চিত? না। তারপর হাইকোর্টে আপিল। তাতেও বেশ কয়েক হাজার। তার চেয়ে অর্ধেক অর্থ বাদী ও সাক্ষীকে দেওয়া অনেক নিরাপদ। প্রমাণাভাবে মুক্তি নিশ্চিত। সে অবস্থায় পাঁচশ হাজার টাকা দিয়ে উকিল খরচের সাশ্রয়। প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থক যদি অভিযুক্ত হয় কোন মানুষের ক্ষমতা থাকে কোর্টে সাক্ষী দেবার? বড় উকিলের কী প্রয়োজন? আরো বহু ছোট বড় কারণ আছে মফস্বল বাংলায়। সত্তরের দশক থেকে শিক্ষার যা প্রকাশ তাতে বিচার ব্যবস্থায় আস্থা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে। পশ্চিমবাংলার বাইরের সহজ উপায়ে পাওয়া ল'

ডিগ্রি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণাভাব বিচার ব্যবস্থাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে সেটা একটা দুঃস্বপ্ন। অতি অল্প সময়ে ধনী হওয়ার বাসনা, প্রবঞ্চনা ও শোষনের এক সভ্য ও গোপন হাতিয়ার এখন। মহামান্য জুরি, মনে দুঃখ আছে। বলে ফেলি। তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার দুঃখ জানাবার জন্য কোন প্রচেষ্টা না থাকাই ভাল। এসব বলতে গেলে প্রকৃত সমস্যাই তুলে ধরা যায় না। যদিও সমস্যার অনেক কারণের মধ্যে সেগুলোও কারণ।

মহামান্য জুরি,

আমি অবনী মল্লিক সেটা যে কত অসুবিধার সেটা বলতে গিয়ে অন্য অনেক কথা বলে ফেললাম। আপনারা হয়তো ভাবছেন একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল এত পসার, এত উপার্জন তবুও কি করে অসহায় হ'তে পারে? জেন্টলমেন অব দ্য জুরি, পারে শুধু নয়। অসহায়ই। আমার দুই মেয়ে দুই ছেলে। তিনের বেশি নয় এ প্রচার সে যুগে ছিল না। তবুও সহযোগীদের আট কিংবা দশ ছেলে মেয়ে দেখে ভয় হ'ত। কি ভাবে তাদেরকে ভালভাবে মানুষ করব। সে যাই হোক। এক মেয়েকে নিয়ে সমস্যাটাই বলি। লেখাপড়া যা সে শিখেছিল সেটা তার মায়ের চেষ্টায়। দেখতে সুন্দরী তো ছিলই। তার ওপর বি.এ পাশ করেছে। বার বার স্ত্রী বলে মেয়ের জন্য সুপাত্র দেখতে। প্রতিদিন রাত্রে প্রশ্ন করে—কি করলে? নাকি বিয়েটারও সব চিন্তা আমারই? ফলে নানা লোককে বলি। লোক মানে তো আমার মক্কেল আর কিছু সহযোগী উকিল। তারাও চেষ্টা করে। সন্ধান দেয় নানা পাত্রের। দাবী দাওয়া যথেষ্ট পাত্র যেমনই হোক। শেষে একটা ছেলেকে ভাল লাগল। পাত্রপক্ষ বলল তাদের কোন দাবি দাওয়া নেই। ভাল লাগল কথা শুনে। সাধ্য মত মেয়ে জামাইকে তো দেবই। বিয়ে দিলামও। সে আমলে সোনার ভরি পাঁচ শ' টাকা। তিরিশ ভরি সোনার গয়না ও অন্যান্য যৌতুক এবং জামাইকে উপহার ইত্যাদিতে প্রায় নব্বুই হাজার খরচ হল। জামাই চাকরি করে কাছেই এক কারখানায়। প্রাইভেট কোম্পানির অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বাসও হয়েছিল। কারণ বিয়েতে কোম্পানির বড় বড় সব অফিসাররা এসেছিল। সেটা যে একটা ইলেকট্রিক হেড মিস্ত্রির কাজ আসলে, বুঝতে বেশি দিন সময় লাগেনি। মাইনে যা শুনেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল। শহরের একটা মেসে থাকতো বিয়ের আগে। বিয়ের পনেরো দিনের মধ্যেই জামাই আমার মেয়েকে নিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হল আমার বাড়িতে। মাস থেকে বছর কাটতে লাগল। ভদ্রতায় তো জামাইকে কিছু বলা যায় না। তারও লজ্জার বালাই নেই। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন এক যুবক। বছর কয়েক যেতে এক সন্তান হল। প্রথম মুখ দেখলাম নাতির। আনন্দে মন ভরে গেল। জামাইকে আর বলা গেল না এবার বিদেয় হও। আমার বলার অক্ষমতা আর তার নীচ মানসিকতায় সে স্ত্রী ও ছেলে সমেত নিজেকেও সঁপে দিল আমার কাঁধে। আমি অবনী মল্লিক, খ্যাতিমান শ্রদ্ধেয় অনেকের কাছে। আমার খরচ বাড়তে লাগল আর জামাই-এর অর্থ ব্যাঙ্কে জমা হতে লাগল। এই ভাবেই কাটল বেশ কয়েক বছর। নির্লজ্জ জামাই নিয়ে বসবাস। মেয়ে ও নাতির জন্য তাও সহ্য করে গেলাম। কিন্তু একদিন হঠাৎ পুলিশ এল বাড়িতে। জামাই-এর খোঁজ করল। জানতে পারলাম সে কোম্পানির স্বার্থে ইলেকট্রিক চুরি করে বলে মামলা হয়েছে। আমার সম্মানে তাকে গ্রেপ্তার করল না। সাধারণত জামিন হয় না। কিন্তু অবনী মল্লিকের জামাই। জেলে যেতে হ'ল না। মাসে একটা ক'রে দিন পড়ে কোর্টে। হাজিরা দিতে হয়। বুক ফুলিয়ে যায়। কার জামাই দেখতে হবে না। আমি মাথা নামিয়ে থাকি। জামাই-এর কিন্তু তাতেও একটা গর্ব আছে। কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারও আসামী আছে তার সঙ্গে একই মামলায়। অন্য মানুষের

একটা খরচ আছে কোর্টে। অবনী মল্লিকের খাতিরে তাকে কোন খরচ দিতে হয় না। সত্যি আমার কি সম্মান। কি খাতির। মেয়ে ও নাতির মুখ চেয়ে সব সহ্য করতে হয়। কোর্টে জামাইকে দেখে সব লোকে। আমার দিকে আঙুল তুলে দেখায় অবনী মল্লিকের জামাইকে। লোকে মনে মনে একটা আনন্দ পায়। আমি লজ্জা পাই। আমাকে লজ্জা দিতে পেরেই তো আনন্দ তাদের। একদিন মেয়ে বলল—বাবা, আমি যে তোমার কাছে থাকি, তোমার জামাইও থাকে। কিন্তু লোকে বলে আমি নাকি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাই না বলেই তুমি ওকে ঘর জামাই করে রেখেছ। আমার খুব লজ্জা করে। তার থেকে ওকে অন্য কোথাও থাকতে বল। ও যা কৃপণ কোন একটা মেসে থাকবে, খেয়ে না খেয়ে বা সামান্য খেয়ে দিন কাটাবে। লোকে তো জানবে, চিনবে তোমার জামাইকে। তোমার বা আমার কেউ কোন দোষ দিতে পারবে না। প্রয়োজন হ'লে ডাইভোর্স নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবো। পরনির্ভর স্বামীর সঙ্গে একত্রে বাস করার থেকে নিজে আলাদা হয়ে থাকা অনেক ভাল। মেয়ের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমি অবনী মল্লিক। ভেবে বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হয় আমাকে। একদিন জামাইকে বললাম—তুমি একটা আলাদা বাসা নাও। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকবে। মাসে মাসে কিছু খরচ আমি দেব। চুপ করে থাকল। বোবা হয়ে থাকা প্রয়োজন বলেই। একদিন তাকে নিয়ে গেলাম একটা বাড়ি দেখতে। আমার খাতিরে বাড়ি ভাড়া একশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিলাম। পরের দিন জামাইকে বললাম তুমি আগে যাও। বিয়েতে দেওয়া খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল গাঁয়ের বাড়ি থেকে এনে বাস করার উপযোগী কর। তারপর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে যাবে। এটা কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে করতে হবে। জামাই গেল। পনেরোদিন পর আমি দেখতে গেলাম ভোরে। মর্নিং ওয়াক করার পথে। ডেকে তুললাম। ঘরে গিয়ে দেখি একটা সস্তা তক্তায় সতরঞ্চি বিছিয়ে নোংরা একটা মাথার বালিশ রাখা। সেখানেই রাত্রে শোয়। ফিরে এলাম মনের কষ্ট নিয়ে। স্ত্রীকেও বলতে পারছি না। খবর নিয়ে জানলাম হোটেলে খায় বিনা পয়সায় যা দেয়। হোটেলের মালিককে হঠাৎ হঠাৎ দশ বিশ হাজার ধার দেয় চড়া সুদে। তার বদলে সুদ না নিয়ে খাবারটা ফ্রি। সুদের কারবারও করে অনেকের সঙ্গে। আরো জানতে পারি ব্যাঙ্কে তার কয়েক লক্ষ টাকা আছে। আমি ব্যয় করেছি তার পেছনে। তার কারণে। আর সে আমার কাঁধে ভর করে শুধু সঞ্চয় করে গেছে। তাতেও দুঃখ ছিল না। দুঃখ হ'ল এটা জেনে স্ত্রী বা ছেলের নামে কোন অর্থ সে ব্যাঙ্কে রাখেনি। এতকাল রূঢ় হ'তে পারিনি। সেদিন রূঢ় হ'লাম। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। বললাম যোগ্য হ'য়ে যদি কোন দিন আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারো তাহলে এসো। তা নাহলে আমার সামনে কোনদিন আসবে না। সে আর আমার সামনে এসে দাঁড়ায়নি কয়েক বছর। কিন্তু, অবনী মল্লিকের নাম ব্যবহার করেছে নিজ স্বার্থে। কন্ট্রাক্টারির কাজ পেতে। সাপ্লাই-এর কাজ পেতে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে আমি অবনী মল্লিকের জামাই।

জেন্টলমেন অব দি জুরি,

এখানেই শেষ নয়। একদিন সেই বাড়ির মালিক এসে বললেন—আপনার কথায় বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি আপনাকেই দিয়েছিলাম। আমি বাড়ি বিক্রি করে দুর্গাপুরে ছেলের কাছে চলে যাব। দয়া করে বাড়িটা যদি ছেড়ে দেন তাহলে ন্যায্য দাম পাব। আমি বললাম—আপনার ভাড়াটিয়াকে বলেছেন? জামাই বলতে লজ্জা করল। উত্তরে তিনি বললেন—তাকে না বলেই কি আপনার কাছে এসেছি। সে কি বলেছে জানেন? সে বলেছে

বাড়িটা কিনে নিতে চায়। দাম দেবে আশী হাজার। দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় তিনটে ঘর ও বারান্দা নিয়ে সে আছে মাত্র একশ টাকা ভাড়ায়। সে বাড়িতে মোট ঘর ছয় খানা, দুদিকে বারান্দা, ডাইনিং কাম কিচেন ও ফাঁকা জায়গা প্রায় দুকাঠা। ফাঁকা অবস্থায় গোটা বাড়িটা বিক্রি করতে পারলে দাম পাব কম করেও চার লাখ টাকা। অযৌক্তিক এই কাজ সমর্থন তো করা যায়ই না। আবার প্রতিকার আমার কাছে দুরূহ। অসহায় আমি। কোন সাহায্য করতে পারিনি। যাবার সময় ভদ্রলোক একটা কথা বলে মনটা আরো ভারাক্রান্ত করে গেলেন। ভাড়াটিয়া থাকে একটা ঘরে। আরেকটা ঘরে সন্ধে থেকে সেটা মাতালদের আড্ডাস্থল হয়। যারা টাকা ধার নেয় ওর কাছে তাদের পয়সায় মদ খায়। আরেকটা ঘরে স্তূপীকৃত ফাঁকা মদের বোতল। ভদ্রলোক মেয়েঘটিত ইঙ্গিত একটা দিলেন। সামনা সামনি বলা যায় না বলে। আমি নিজে পছন্দ করে যে পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি সে যে আমার ও পরিবারের এত সর্বনাশ করবে চিন্তা করতে পারিনি। বলতে পারেন, আমি কি অপরাধ করেছি, কোন দিন কাউকে প্রবঞ্চনা করিনি। ফি বলে যা দাবি করেছি পরিশ্রম করার জন্য সেখানে যে পেরেছে অর্থ দিয়েছে, যে পারেনি সে আসেনি। কাউকে ভুলিয়ে বা জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে দিতে হবে বলে বা মামলায় খালাস করে দেব এই বলে তো কারো কাছে টাকা নিইনি। আপনারা ভাবতে পারেন ঠিক ঠিক আয় দেখিয়ে ইনকাম ট্যাক্স দিইনি। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে সত্যি কি তা দেওয়া উচিত? যখন আমার শক্তি আছে সামর্থ্য আছে। আমি ট্যাক্স দিয়ে যাব অন্যের বিলাসিতার স্বার্থে। আর আমি যখন অক্ষম, শক্তিহীন, উপার্জনহীন তখন আমার জন্য ভাববার কেউ নেই। ইনকাম ট্যাক্স প্রকৃত রোজগার প্রকাশ করে দিলে রুগ্ন বৃদ্ধ বাবা-মার কি চিকিৎসা করাতে পারতাম? সামাজিক দায়বদ্ধতায় তাঁদের শ্রাদ্ধ করতে ব্যয় করতে পারতাম? আমি অবনী মল্লিক সেটাকে অপরাধ বা পাপ বলে মনে করি না। আপনারা অপরাধ মনে করলে শাস্তি দিতে পারেন।

মহামান্য জুরি,

আপনারা জানেন অবনী মল্লিকের পরমায়ু কামনা করে অনেকে। নিকট আত্মীয় ও শুভার্থীরা করে। সেটা স্বাভাবিক। যারা নির্ভরশীল তারা যে স্বার্থের জন্য করে তা নয়। শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকে সেখানে। কিন্তু এই অবনী মল্লিক যাদের কাছে নামী উকিল বলে পরিচিত এবং যাদের মামলা আছে, আইনি সাহায্য প্রয়োজন, তারা অনেকেই বলে ঈশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। রাগ হয় তাদের ওপরে। কি স্বার্থপর। ক্লেদাক্ত ও কলুষতায় ভরা জীবন সেখানে, শাসকের সুশাসনে জীবন দুর্বিষহ, মৃত্যু সেখানে কাম্য হয় অহরহ বিতৃষ্ণায় মন ভারাক্রান্ত তখন এক শ্রেণীর মানুষ এই অবনী মল্লিকের দীর্ঘায়ু কামনা করে। যশস্বী ডাক্তারের একই দুর্ভাগ্য। একদিন একজন খুব আক্ষেপ করে বলল—জানেন উকিলবাবু, রাতে আমার ঘুম হয় না। আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলাটা পাঁচ বছর হয়ে গেল তবুও সেই কবে আপনাকে কী দিয়েছি। হঠাৎ যদি আপনার কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে আমার কী হবে? আপনার তো বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। এই বয়সটা খুব খারাপ। ঈশ্বর না করুন কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে আমাকে পাঁচগুণ বেশি টাকা দিয়ে ক'লকাতা থেকে উকিল আনতে হবে। ভাবি এটাও তো সত্যি তার আশঙ্কার কথা। কিন্তু প্রতি বছরই তো কেউ না কেউ আশঙ্কা নিয়ে আসবে আর আমাকে সুস্থ সক্ষম যুবকের মতো বেঁচে থাকতে হবে। এটা তো কঠিন সমস্যা। এতদিন বেঁচে থেকে প্র্যাকটিশ করে যাওয়াটা নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে। কিন্তু

না করে কি কোন উপায় ছিল। আমার কাঁধে কত দায়িত্ব সেটা আরো প্রকট হয়েছে প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নায়কদের কল্যানে। আমি অবনী মল্লিক কারোকেই ভয় করিনি। আজ আমাকে ভয় করতে হচ্ছে মৃত্যুকে নয়। জীবনকে।

মহামান্য জুরি, যাঁদের সুশাসনে এবং মঙ্গল করার অসীম চেষ্টা সত্ত্বেও আমার দুর্ভাগ্যে মঙ্গল হ'ল না, মানসিক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিলাম, দয়া করে বিচার করুন আমার সম্বন্ধে কি আদেশ দেওয়া যায়। আপনাদের বিচারে যা সাব্যস্ত হবে তাই মাথা পেতে নেব। শুধু চিন্তা ক'রে দেখবেন কেন এই অবনী মল্লিককে ভয় করতে হচ্ছে জীবনকে। এক সুবর্ণযুগে এসেছিলাম এই আইন পেশায়। কোন আন্তরিকতার অভাব ছিল না কাজে। উকিল, পুলিশ, সাক্ষী সকলের যৌথ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিচার হ'ত। তখন পুলিশ তদন্ত করত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ঠার সঙ্গে। রাজনৈতিক দলের কোন প্রভাব ছিল না। কখনই পুলিশ ভাবতো না বিচারটা তার একক দায়িত্বে। উকিল বিচারে সহায়তা করত ব্রত নিয়ে। সাক্ষীরা ভাবতো না তারাই সব। মানুষের বিচার তাদেরই ওপর নির্ভর করে না। সাধারণ নিয়ম ছিল সেটাই। ব্যতিক্রম না থাকা ছিল না। পুলিশ যে ঘুষ নিত না তা নয়। গ্রেপ্তার করে দড়ি বেঁধে কোর্টে নিয়ে যাবে না, বা মারধোর করবে না এই সব কারণে ঘুষ নিত। কিন্তু তদন্তে কোন ত্রুটি থাকলেও ইচ্ছাকৃত গাফিলতি থাকতো না। সাক্ষীদের অধিকাংশ ভয় পেত মিথ্যা বলতে। উকিলের জেরার ভয় ছিল। ব্যতিক্রমও ছিল। অবশ্য সংখ্যায় তা কম। জীবনটা এইরকম একটা পরিবেশে কাটল বেশ কয়েক বছর। তারপর শুরু হ'ল অবক্ষয়। অতিঅল্প সময়ে তা এমন এক জায়গায় এল যে ক্যান্সারের মত সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ল। গোটা সমাজটা এমন বদলে গেল যে মূল্যবোধ হারিয়ে গেল। ভাল কথাটার অর্থ বদলে গেল। লাইন নামে একটা কথা চালু হল। পুলিশের সাথে, সরকারী উকিলের সাথে, কার লাইন আছে সেটাই বিচার্য। সেখানে ভাল উকিলের স্থান নেই। পাঁচ বছরও যে ওকালতি করেনি, মনের কথা ভাষা দিয়ে ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারে না, সে আয় করে দশগুণ। আর চল্লিশ বছর ধরে যে উকিল আইন শিখেছে, জেরা শিখেছে সওয়াল করতে শিখেছে, সে বসে থাকে দিনের পর দিন। বছরের পর বছর মামলা হয় হাতে গোনা কয়েকটা। যেগুলো হয় তার বেশিরভাগ প্রমাণ অভাবে অথবা রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত মুক্তি পায়। ভাল উকিলের স্থান নেই সেখানে। আমি অবনী মল্লিক ভুক্তভোগী। তাই মৃত্যুকে নয়। জীবনকে ভয় পাই।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন অবনীদা। চোখ দুটো বন্ধ করে এতক্ষণ জুরির কাছে নিবেদন করছিলেন এক কালের খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত উকিল। নিবেদন শেষেও চোখ বন্ধ বেশ কিছুক্ষণ। উঠতে পারছি না আমি সেখান থেকে। তাঁর এতক্ষণ কথা বলার অনেকাংশ আমার জানা। যদিও আমার দশ বছর আগে এসে তিনি স্বর্ণযুগ দেখেছেন আরো বেশি। আমার যা কিছু দেখা স্বাধীনোত্তর যুগে। সোনার মধ্যে খাদ দেওয়া তখন ক্রমাগত বেড়েছে। অবনীদা সাংসারিক জীবনে কিছুটা অসুখী সেটা জানতাম। মেয়ের জীবন নিয়ে অশান্তি, ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা এগুলো অনুমান করতে পারতাম যদিও সব কথা জানা ছিল না। তিনি অনেক সময় হাসিমুখে বলতেন—মল্লিক গিন্নীর মতো সরল স্ত্রী নিয়ে ঘর করা কঠিন। স্ত্রী ঝগড়ুটে বা প্যাঁচালো হলে বোঝা যায়। সরল স্ত্রীকে বোঝা খুব কঠিন। সরল স্ত্রী বাইরের সকলকেই সরল দেখে। তাতে বহু সময় ভুগতে হয় স্বামীকেও স্ত্রীর সঙ্গে। এটা আমরা সকলেই জানতাম বৌদির স্নেহে ছেলেরা মানুষ হয়নি। যখন যা চেয়েছে তা পেয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অবনীদা একজনকে একটা দোকান করে দিয়েছিলেন। দোকান চলত

না। সকাল সন্ধ্যা সে দোকানে বসত ঠিক। কিন্তু ব্যবসা করার কোন জ্ঞান বা ক্ষমতা কিছুই ছিল না। কোন বিশেষ আয়ও ছিল না। সেই অবস্থায় বড় ছেলের বিয়ে হয়। তার ছেলেমেয়ে হয়। তাদেরও সকলের দায়দায়িত্ব অবনীদার কাঁধে। ছোট ছেলে নিজের পছন্দে বিয়ে করে। তারও ছেলেমেয়ে হয়। অবনীদার সংসারে তারাও সকলে। একা মানুষ অবনীদা। তাঁরই রোজগারে এতগুলো মানুষের বসবাস ও ভরণপোষণ। নিঃস্ব হয়ে যাবারই কথা। তাঁকে বাইরে দেখে কিছু বোঝা যেত না। বার লাইব্রেরিতে যখন আসতেন তখন হাসি ঠাট্টা আমোদে কাটাতেন। আমি জুরির বিচার দেখেছি মাত্র চার বছর। তার মধ্যে দু'বছরের বেশি ছাত্র হিসেবে কলকাতা হাইকোর্ট সেসেন্সে। পেশায় এসে দেখেছি। কিন্তু জুরিদের সামনে কোন মামলা করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু অবনীদা দশ বছরের মধ্যে পাঁচ-ছয় বছর সে সুযোগ পেয়েছেন। অভিজ্ঞতাও বেশি। বহু মানুষের মামলা করেছেন। বহু বিচারকের সামনে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আবেদন নিবেদন করেছেন। ডাক্তার বন্ধু বলল, "অবনীদা মাঝে মাঝেই এরকম করেন। চেনা মানুষের সামনে নয়। কে যে তাঁর চেনা আর কে অচেনা তা-বোঝা দুষ্কর। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ কোন মানুষকে দেখলেই তিনি জুরি অ্যাড্রেস শুরু করে দেন। এখানকার কোন রোগীকে পাকড়াও করে শোনাতে লেগে যান। কেউ শুনুক না শুনুক তিনি বলে যাবেন চোখ বন্ধ করে। শুধু আরম্ভ করার সময় সামনে কেউ থাকলেই হ'ল। ওঁর সব কথা এখানকার কেউ বোঝেও না। তার ওপর মানসিক রোগের জন্য তো সকলে আছে এখানে। আপনাকেই একমাত্র দেখলাম যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনতে ওঁর কথা। তারপর বন্ধুর সঙ্গে তার কোয়ার্টারে গেলাম। কথায় কথায় বললাম অবনীদা বোধ হ'ল আমায় চিনতে পারেননি। চোখ খুলে একবারই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। তারপর তো আর চোখ খোলেননি। বন্ধু বলল—উনি নিশ্চয় আপনাকে চিনেছেন। আমি যেটুকু শুনলাম আপনার সঙ্গে থেকে তাতে মনে হল যে বিষয় নিয়ে বলছেন তা তো আগে কারো কাছে বলেননি। জুরির এসব কিছু নিবেদন করা আগে তো শুনিনি। আশ্চর্য লাগছে আপনাকে পেয়ে উনি তাঁর নিজের জীবনেরও কথা বললেন যা আগে কোনদিন বলেননি। দেশনেতাদের গালাগালি করা তাঁর দৈনন্দিন কাজের একটা অঙ্গ। দেশটাকে কোথায় নিয়ে এল তারা এটাই বক্তব্যের মূল সুর। তাই অবাক হচ্ছি। ডাক্তার হিসেবে মনে হচ্ছে প্রায় যদি কোন মানুষকে কালো কোট পরিয়ে তার সামনে আনা যায় তাহলে ওঁর মনটা হালকা হবে। ধীরে ধীরে হয়ত সেরে উঠবেন।"

ফিরে এসেছি ওখান থেকে। পথে আসতে আসতে ভেবেছি—অবনীদা কি সত্যিই পাগল? তিনি যা বললেন এতো অনেকের মনের কথা। বিশেষত ওঁর বয়সী যে কোন মানুষের। তাঁর দুঃখের কারণগুলো তো অযৌক্তিক নয়। চিন্তায় তো কোন অস্বচ্ছতা নেই। কালোকে যিনি কালো দেখেন তিনি কি হিসেবে পাগল? ডাক্তার জানতে পারে। আমিও তো অবনীদার মতো চিন্তা করি। তাহলে আমিও কি তাঁর মতই পাগল?

বিশাল সিং

বিশালদা ও পুনম বৌদি কোনদিনই মুছে যাবে না আমার স্মৃতি থেকে। পুলিশের ইন্সপেক্টার বা সাব-ইন্সপেক্টার তো দেখলাম অনেক। ভালো মন্দ সব রকম। চিন্তামণি দারোগার কথা লিখেছি। শত শত চিন্তামণি দারোগা যেন ডাকাত গড়ার কারিগর। নকশাল আন্দোলনের সময় নিখিলেশ সেনকে দেখেছি। কি বিচিত্র দারোগা ছিল সে। আন্দোলনের প্রথম দিকে নিখিলেশ নকশালদের ভয় করতো। পুলিশ রেডের আগে নকশালদের খবর দিত আগাম। বন্দুক রিভলবার কে থানায় জমা দেয়নি জানিয়ে দিত। ছিনতাই হোত, সে সব বন্দুক রিভলবার। আবার শেষ পর্যায়ে যখন আন্দোলন, অমিয় সামন্তের মতো দক্ষ পুলিশ সুপার এলেন, নিখিলেশের চরিত্র একেবারে বদলে গেল। নিষ্ঠুর হাত দিয়ে তাজা জোয়ানগুলোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ এনকাউন্টার দেখিয়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বহু দারোগা দেখারও দুর্ভাগ্য হয়েছে। বহু অসতের মাঝে বিশালদার মতো ক'জনকেই বা দেখলাম। সৎ হওয়ার পরিণামও দেখলাম বিশালদার জীবনে। পুলিশই যে পুলিশের শত্রু হয় এটাও এক অভিজ্ঞতা। আবার এক পাঞ্জাবী পরিবার যে এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে মিলতে পারে সেও এক মধুর অনুভূতি। জাতি বা ধর্ম যে মানুষের মধ্যে প্রেম ভালবাসায় কোন বাধা হতে পারে না এ শিক্ষা পেয়েছি বিশালদার কাছে। পুনম বৌদির কাছে।

বিশালদার ঠাকুর্দা প্রথম এসেছিলেন সিউড়িতে জলন্ধর থেকে। ভাগ্য অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিলিটারিতে ড্রাইভার ছিলেন। যুদ্ধে একটা হাত চলে গিয়েছিল। উধাম সিং নাম ছিল ঠাকুরদার। পানাগড়ে থাকতো তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই। উধাম সিং আশ্রয় নেন সেই ভায়ের কাছে। মিলিটারী অকশানে কেনেন একটা ট্রাক। তিলপাড়ায় ময়ুরাক্ষী নদীর বাঁধ তৈরির সময় সেই ট্রাক খাটতো। এক ড্রাইভার ছিল। তারপর ছেলে করতার সিং সেই ট্রাক চালাতেন। কয়েক বছরের মধ্যে দুটো ট্রাক আরো কেনা হয় এবং করতার সিং ও ভাই প্রেম সিং ঠিকাদারীরও কাজ শুরু করেন। বহু টাকার মালিক হন। বিশাল সিং করতার সিং-এর ছেলে। প্রেম সিং-এর কোন ছেলে ছিল না। ভাইপো বিশালই ছিল তাঁরও ছেলে। প্রেম সিং চেয়েছিলেন বিশাল লেখাপড়া শিখুক। জাত ব্যবসায় আনতে ইচ্ছা ছিল না। বেণীমাধব স্কুলে বিশালদা যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, আমি তখন ক্লাস সেভেন। বিশালদা ম্যাট্রিক পাস করে বেরিয়ে গেলেন। আমি তখনও স্কুলে। আমার সময়ে ম্যাট্রিকের বদলে স্কুল ফাইনাল হ'ল। আমি পাস করে বিদ্যাসাগর কলেজে গেলাম। বিশালদা তার দু তিন বছর আগেই কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। স্কুলে বছর দুই বিশালদা ও আমি একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি, নাটক ও আবৃত্তি করেছি। সেই সুবাদে আমি ছিলাম তাঁর খুব কাছের। তারপর আর দেখা হয়নি বিশেষ। স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার পর খবরাখবর রাখতাম না বিশালদার। বেশ কয়েক বছর পরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

জি. টি. রোড ধরে যাচ্ছি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ ক'রে। বরাকরে দামোদর নদীর ব্রিজের এপারে দাঁড়াতে হয়েছে। উল্টো দিকের গাড়িগুলো ব্রিজ দিয়ে পার করা হচ্ছে। হঠাৎ এক পুলিশের পোশাকে গুরুগম্ভীর গলায় যেন হুঙ্কার দিল—"আপকা ড্রাইভিং লাইসেন্স"? হতচকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছি। তিনি তখন মৃদু মৃদু হাসছেন আর আমাকে লক্ষ্য করছেন। চেহারায় বেশ পরিবর্তন দেখছি। ছফুট লম্বা, ফর্সা গায়ের রং। মাথায় টুপি। সযত্নে রাখা মোটা গোঁফ। চিনতে খানিকটা সময় লেগেছিল। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে

গেল—"বিশালদা না?" গাড়ি থেকে আগেই নেমে দাঁড়িয়েছি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিশালদা বললেন—অর্চিষ্মান, তুমি তো চিনতে পারনি, কিন্তু গাড়ির জানলায় পাশ থেকে শুধু তোমার মুখ দেখেই চিনেছি।" আমি বললাম—আপনার পুলিশী চোখ, দেখার শক্তি আমার থেকেও অনেক বেশি। অপরাধী দেখা চোখ ঠিক চিনেছে। সত্যি আমার কাছে তখন আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না। আমাকে আমার গন্তব্যস্থলে যেতে না দিয়ে জোর করে নিয়ে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারে। পুলিশের ইন্সপেক্টারের যে এমন কোয়ার্টার হতে পারে ধারণা ছিল না। কাঠের দুটো তক্তা জোড়া দেওয়া। একটা চাদর দিয়ে ঢাকা দুটো পাতলা তোষক। একটা ট্রাঙ্ক, একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার। বারান্দায় দুটো চেয়ার একটা ছোট গোল টেবিল। তোষক চাদর ও বালিশ এবং ট্রাঙ্কটা নিজের। বাকিগুলো থানা থেকে দেওয়া যা কোয়ার্টারে বরাবর থাকে। ধনী করতার সিং-এর ছেলের কি সহজ-সরল জীবন যাপন। বিলাসের কোন উপকরণ নেই। দেওয়ালে একটা আলমারি। কোন কাঠের ফ্রেম বা পাল্লা নেই। সেখানে কিছু বই আছে। নীচের তাকে তেল চিরুনি ইত্যাদি। তার পাশেই একটা মাঝারি আয়না। পেরেক থেকে ঝুলছে। বিশালদা ও পুনম বৌদি দুজনেই ব্যবহার করেন। পুনম বৌদির সঙ্গে অলাপ করিয়ে দিলেন বিশালদা। বৌদি অতি সহজে আপন করে নিলেন। ভাঙাভাঙা বাংলা বলতে শিখেছেন। বোঝেন বাংলা সবটা। বিশালদা হয়ত শিখিয়েছেন। বিশালদা আমায় বৌদির কাছে বসিয়ে পোশাক বদলাতে গেলেন। ঘরের চারদিক দেখছি। পুনম বৌদি তা লক্ষ্য করেই হয়ত বললেন—ও তো কোন থানাতেই বেশি দিন থাকতে পারে না। বড় জোর তিন কি চার মাস। তারপরই বদলী। ওকে বিদায় দিতে তৎপর হয়ে ওঠে সকলেই। স্বার্থে আঘাত পড়ে। কারো কথায় চলার মানুষ তো নয়। যখনই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে আঘাত লাগে, একটা ট্রাঙ্ক আর এই বিছানা নিয়ে সদাই প্রস্তুত।" এর মধ্যে বিশালদা এসে বসলেন। বৌদি চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে ভেতরে গেলেন। বিশালদাকে বললাম "আপনার জীবনটা তো বদলে গেছে একেবারে। বাবা ও কাকার একমাত্র চোখের মণি ছিলেন আপনি। আদর ও প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ। আপনার এই পুলিশের চাকরি নিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের কোন মানে আছে কি? আপনি তো আরো ভাল চাকরি করতে পারতেন বা পৈত্রিক ব্যবসায় যেতে পারতেন?"

"পারতাম তো অনেক কিছু, আবার পারতামও না হয়ত। পুলিশের চাকরি আমি নিজের ইচ্ছায় নিইনি। বাবার ইচ্ছা। আমি যেন সৎ কর্মনিষ্ঠ পুলিশ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই। বাবার এই ইচ্ছার পেছনে একটা কারণ ছিল। একবার বাবার একটা ট্রাক পুলিশ সিজ করে বিনা কারণে। ট্রাক ফেরত চাইতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাইলেন। পুলিশ টাকা না নিয়ে কোন রিপোর্ট দেবে না আর বাবাও টাকা দেবেন না। বাবা থানায় গেলে খুব অপমানিত হন। এদিকে ট্রাক পড়ে থাকল তিন মাস। রোদে-বৃষ্টিতে মরচে ধরতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট ও রিপোর্ট ছাড়া গাড়ি ফেরত দেবেন না। তিনমাস পর গাড়িছাড়া পেল কারণ পুলিশ কোন মামলা দিতে পারেনি। তারপর সে গাড়ি হাতে পেয়ে দেখা গেল একটা চাকা নেই, নেই আরো কিছু কিছু পার্টস। মেরামত করতে খরচ হল প্রায় দশ হাজার টাকা। তিন মাস গাড়ি না চালাতে পেরে ক্ষতি হ'ল পঞ্চাশ হাজার টাকা। কে দেবে ক্ষতিপূরণ? ম্যাজিস্ট্রেট না পুলিশ? বাবার মনে জেদ এসে গেল। আমাকে পুলিশ করবেন। ঘুষখোর পুলিশদের কাছে আমার মতো পুলিশ হবে শুধু আদর্শ নয়, আমার চরিত্র দিয়ে চপেটাঘাত করা হবে তাদের। বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি সৎ হয়েছি কিন্তু কারো আদর্শ হতে পারিনি। চরিত্র দিয়ে তাদের যতই জুতো

মারি, তাদের গায়ে লাগে না। চামড়া এত মোটা।"

খুব ভাল লাগলো ওদের সংসার। ছেলেকে রেখেছে পুরুলিয়া স্কুল হস্টেলে। শুধু স্বামী স্ত্রীর অস্থায়ী সংসার। সহজ ও সরল। অভাব নেই, অভাববোধও নেই। বিশালদার চিন্তাধারা অন্য সকলের থেকে আলাদা। ওঁদের টানে গেছি যখন যেখানে থেকেছেন। বিশালদা প্রায়ই বলতেন "কোন অপরাধী পুলিশের শত্রু নয়। তারা কৌশল বের করে অপরাধ করেও কি ভাবে প্রমাণ না রেখে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। কিন্তু কোন পুলিশকে খুন করার প্রবৃত্তি থাকে না। আত্মরক্ষায় তারা গুলি চালায় হয়ত। কিন্তু সাধারণত খুন করার কোন ইচ্ছা থাকে না। তারা ভাবে একটা পুলিশ মেরে তো কোন লাভ নেই। কিন্তু পুলিশের সব থেকে বড় শত্রু পুলিশ। কোন সৎ পুলিশের জন্য স্বার্থহানি হ'লে সে অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলায়। তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে।" আমি বিশালদার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। বিশালদার সঙ্গে তর্ক করতাম। দুজন দুই বিপরীত মেরু থেকে দেখি সব কিছু। কিন্তু বিশালদার যে আশঙ্কা পুলিশই পুলিশের শত্রু তার সত্যতার উপলব্ধি হল একদিন। সে উপলব্ধির জন্য যে এত মূল্য দিতে হবে ভাবিনি।

দুঃসংবাদ এল ঝড়ের গতিতে। সংবাদটা ছিল গুলিবিদ্ধ হয়ে বিশালদা হাসপাতালে। আশঙ্কা নিয়ে গেলাম। ভেবেছি তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাঁর মৃতদেহ। পাশে পুনম বৌদি পাথরপ্রতিমা যেন। একটা গুলিই যথেষ্ট ছিল প্রাণ নেবার জন্য। কিন্তু বেশ কয়েকটা গুলি মারা হয়েছে। যেন বেঁচে ওঠার কোন সম্ভাবনাই না থাকে। চোখের জল রুখতে পারিনি। রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই এমন একটা মানুষের জন্য বুকটা হু-হু করে উঠেছে। আমাকে কে সান্ত্বনা দেয় যে আমি বৌদিকে সান্ত্বনা দেব। করতার সিং, প্রেম সিং এসেছে। করতার সিং বাকরুদ্ধ প্রেম সিংকে সামলানো যায় না। দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। সে দৃশ্যও দেখা যায় না। কুনাল দশ বছরের ছেলে বাবাকে ধরে বসে আছে। কখনও বা বাবার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে। এর কিছুক্ষণ পর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল সৎকারের জন্য। আমিও গেলাম। মনে পড়ছে স্কুল জীবনের কথা, তারপর হঠাৎ আবার যোগাযোগ, নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার কথা। বিশালদা বলতেন পুলিশই পুলিশের শত্রু। এক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছে। ঠিক করলাম-এর পেছনের রহস্য আমাকে জানতেই হবে।

জানতেও পেরেছিলাম সে রহস্য। কিন্তু তার প্রমাণ আদালতে হাজির করে দোষীর শাস্তি—অসম্ভব ছিল। পুলিশ যদি ঠিকমত তদন্ত না করে ঘটনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে তাহলে কত অসহায় মানুষ। বিশালদার সহকর্মী সাব ইন্সপেক্টার সুনীল রায় বলেছিলেন—"আমি জানতে পেরেছি কুখ্যাত মাফিয়া অরুণ আটওয়াল আছে পেছনে। কনেস্টবল রামাধীনকে বিশ্বাস করতেন বিশাল সিং। রামাধীন যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তিনি ভাবতেই পারেননি। রামাধীনই সেদিন খবর দেয় আটওয়াল বেঙ্গল থেকে বিহারে বহু গাঁজা পাচার করবে। তাকে এবং আরো দুজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে বিশাল সিং বেরিয়ে যান রাত নটায়। সেটা থানার জেনারেল ডাইরিতে লেখা আছে। তারপর বিহার চেক পোস্টের আগে বিশাল সিং অপেক্ষা করছিলেন কখন গাড়িটা আসে। গাড়ি এসেছিল ঠিকই। তাতে কিন্তু গাঁজা ছিল না। গাড়িটাকে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলি এসে পড়ে বিশাল সিং-এর গায়ে। অন্য একজন কনেস্টবলও আঘাত পায় গুলির। কিন্তু রামাধীনের গায়ে কোন গুলি লাগেনি। রামাধীন থানায় এসে খবর দেয়। সে যেন কিছুই জানতো না। বিশাল সিংকে ওপরওয়ালারাও সুনজরে দেখেনি। কারণ তাঁর মারফত মাসিক আদায় হত না। শুধু তাই নয়

অরুণ অটোয়াল ওঠা-বসা করে উঁচুতলার অফিসারদের সঙ্গে। পার্টি দেয়। রাজসিক খানা পিনার বন্দোবস্ত থাকে। বিশাল সিং খুন নিয়ে মামলাও শুরু করে পুলিশ। নিরীহ দু'চারজনকে ধ'রে তদন্ত দেখানো হয়। কিন্তু সব ধামাচাপা পড়ে যায়। সৎ পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে ধারালো অস্ত্রের ওপর পা দিয়ে। বিষাক্ত সাপ তাকে ঘিরে থাকে তার চারপাশ। মাফিয়া অটোয়াল বাংলা বিহারে রাজত্ব করে। তার শক্তিতে নির্বাচিত হয় নেতা। সে নেতা মন্ত্রী হয়। মন্ত্রীর স্নেহছায়ায় থাকে সে। বিশাল সিং ছিল অটোয়ালের পথের কাঁটা। তাকে চলে যেতে হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে।

করতার সিং সব কিছু বিক্রি করে চলে গেছেন ফাগুয়ারা। পুনম বৌদি ও ছেলে কুনালও গেছে সেখানে। মাঝে মাঝে চিঠির আদান-প্রদান হয়। খবরাখবর দেওয়া নেওয়া হয়। সংবাদ পেয়েছি একদিন যে করতার সিং মারা গেছেন এক বছরের মধ্যে। পুত্রশোক সহ্য করতে পারেননি। মৃত্যুর আগে শুধু অনুতাপ। তাঁর ইচ্ছাতেই তো বিশাল পুলিশ হয়েছিল। বাবার মনের শান্তির জন্যই তো সৎ ও কর্মনিষ্ঠ হয়েছে। তারই কি এই পুরস্কার। কুনাল বড় হয়েছে। কলেজ থেকে পাশ করে সে জেদ ধরেছে পুলিশ হবে। পুনম বৌদি কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন কুনালকে। তিনি চান না কুনাল পুলিশ হয়। বিশালদার জীবন যেন কুনাল না পায়। বৌদি লিখেছেন—ভাইয়া কুনাল ছোট থেকে তোমার কথা জানে। ওর বাবা তোমাকে যে ভালবাসতো তাও জানে। তোমাকে ওর খুব শ্রদ্ধা। তুমি যদি ওকে একটু বোঝাও। তোমার কথা হয়ত শুনবে।

আমি কুনালকে চিঠিতে লিখেছি মায়ের মনে কষ্ট বা দুঃখ দিয়ে কি লাভ। পুলিশ ছাড়া কি আর কোন চাকরি নেই দেশে। আরো অনেক উপদেশভরা কথা লিখে অনুরোধ করেছি। কুনাল চিঠির উত্তর দেয় পাঁচ পাতা। চিঠিতে লিখেছে আঙ্কল। আপনি শুধু মায়ের কষ্ট দেখলেন। ঠাকুর্দার ইচ্ছা, বাবার আদর্শ ও চরিত্রটা একবার মনে করুন। আপনি কি চান ভয়ে আমি পিছিয়ে যাই? তাহলে তো দেশে কোনদিন সৎ পুলিশ থাকবে না। ভারতবর্ষে জন্মে ভুলে যাব ভগৎ সিং, নেতাজী, লালা লাজপত রায়ের আদর্শ। মানুষের জীবন তো হঠাৎ যে কোন কারণে শেষ হয়ে যেতে পারে। বজ্রপাত, দুর্ঘটনা এ তো মানুষের প্রায় নিত্যসঙ্গী। সেভাবে মৃত্যু হ'লে কি সার্থকতা জীবনের? বাবা বিশাল সিং তো বেঁচে আছেন সব সৎ ও অসৎ পুলিশের মনে। আপনি কি মনে করেন অটওয়াল বা রামাধীন বা অন্য কোন উঁচুতলার অফিসারের মনে কোনদিন পাপবোধ আসেনি? আসতে বাধ্য যদিও তার প্রকাশ নেই বাইরে। আপনি আঙ্কল পারবেন বোঝাতে মাকে। কত মা তো তার ছেলের কপালে চন্দনের তিলক দেয় যুদ্ধে যাবার আগে। কত মাকে তো শুনতে হয় তার ছেলে শহিদ হয়েছে দেশের জন্য। গর্বে তো বুক ভরে যায় মায়ের। আপনি অবাক হবেন ফাগুয়ারায় মা কত শ্রদ্ধা পান মানুষের কাছ থেকে। সবাই বলে—এ শহিদ বিশাল সিং এর স্ত্রী। আমি পুলিশে যোগ দিয়ে শুরু করব বাবা যেখানে শেষ করেছেন। আমার প্রথম কাজই হবে পুলিশের মধ্যে রামাধীন খোঁজা। অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করব জীবন। আপনারা যেমন অবিশ্বাস দিয়ে দেখতে শুরু করেন মামলাকে। একটা একটা করে প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করে তবেই তো অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে পৌঁছন। না হলে অবিশ্বাসটাই থেকে যায়। আমিও সেই পথে যাব। বাবার জীবনে যদি কোন ভুল থাকে তার থেকেই শিক্ষা নেব। বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমিও পুলিশ হব। আপনি বিচক্ষণ বেশি বলার কিছু নেই। মাকে আমি জানি। আপনি বোঝালে মা বুঝবে। পুলিশের লোক দেখুক সৎ বিশাল সিং-এর ছেলে। এটা আমার কাছে

গৌরবের।

কুনালের যুক্তি খণ্ডন করবার আমার শক্তি নেই। আমি পুনম বৌদিকে সব কথা লিখলাম। কুনালের মনের কথা, আদর্শের কথা। তার সঙ্গে এও লিখলাম বিশালদার ইচ্ছাও ছিল কুনাল পুলিশ হয়। তিনি চাইতেন ছেলে ইন্সপেকটার হবে না। হবে এস. পি, ডি. আই. জি, আইজি। সৎ থাকার প্রয়োজন সেখানেই বেশি। রাজনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজন সেখানেই বেশি।

খবর পেয়েছি কুনাল এডিশনাল এস. পি. হয়ে পুলিশে যোগ দিয়েছে। পুনম বৌদি বা কুনালকে যাই লিখি, মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক থেকেই যায়। পুনম বৌদি হয়ত আমার কথায় কুনালের জেদকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আতঙ্ক তো তাঁরও মনে। সিঁদুরে মেঘ দেখে ঘর পোড়া গরু যেমন ভীত সন্ত্রস্ত। একটি মাত্র ছেলে। তার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে দুঃখের শেষ থাকবে না। বিশালদা বলতেন—'তোমার বৌদি খুব সরল। আর সরল মানুষ নিয়ে আমার সব থেকে বেশি সমস্যা। পৃথিবীটাকে দেখে নিজের সরল চোখ দিয়ে। বোঝার শক্তি নেই। হাজার চেষ্টা করেও ঠিক ঠিক বোঝানো যায় না। যুক্তি বা তক্ক খাটে না। চুপ করে থাকতে হয়। ঠকে যদি শেখে। বা আমি এই পৃথিবীতে না থাকলে যদি শেখে। আমি বলতাম—সবেতেই আপনার পুলিশী চিন্তা। কোন জিনিসকে আপনি সহজ সরল ক'রে দেখতে পারেন না। নিজে যেটা বোঝেন, ভাবেন সেটাই ঠিক। অন্যেরা ভাবতে জানে না।'

বিশালদা কোন উত্তর দিতেন না। শুধু হাসতেন। আজ সব মনে পড়ছে। একদিন শোনালেন এক ঘটনা। যার তদন্ত তিনি নিজে করেছিলেন। ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা। নিজে খুন করলো তার স্ত্রীকে। মাটির তলায় পুঁতে দিল মৃতদেহ। স্ত্রীর নাম কনকলতা। সেই নেতা খুনের পরদিন এল এক মহিলাকে নিয়ে। নাম বলল কনকলতা। অভিযোগ করল এক জনের নামে। নেতাকে অবিশ্বাস করা রাজনৈতিক কারণে অপরাধ। কিন্তু বিশালদার যেন সন্দেহ হ'ল। তিনি ভাবলেন এক নেতা আর এক নেতার বিরুদ্ধে এই মেয়েটিকে কাজে লাগাচ্ছে। বিশালদা প্রথমে খোঁজ করলেন কনকলতার বাবার বাড়ি কোথায়। গ্রামের লোক জানালো কনকলতা নামে একজন গৃহবধূর কথা জানে তারা। সে হ'ল সেই নেতার স্ত্রী। তার বাবার বাড়ি কুলতোড়া। কনকলতা নামে কোন বিবাহিতা যুবতী কেউ নেই গ্রামে। নেতা বাস করে রূপডিহিতে। রূপডিহির একজনকে নিয়ে বিশালদা গেলেন সেই নেতার বড়ি। নেতাকে বললেন কনকলতাকে একবার প্রয়োজন জবানবন্দী নিতে হবে। নেতা বিশালদাকে বসতে বলে তার একজন লোককে বললেন খেয়াকে ডেকে আনতে। লোকটি চলে যাবার পর নেতা বললেন কনকলতাকে ওরা খেয়া বলে জানে। কিছুক্ষণ পর খেয়া এল। সামান্য দু চার কথা তাকে জিজ্ঞেস ক'রে বিশালদা বিদায় নিলেন। গ্রামের লোককে নিয়ে যাবার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। কনকলতা নামের মেয়েটিকে দেখানো এবং তার সম্বন্ধে সবিশেষ জানা। জানতেও পারলেন। ঐ মেয়েটির নাম খেয়া বা কনকলতা কোনটাই নয়। সে নেতার এক রক্ষিতা। তাকে আলাদা একটা বাড়ি করে দিয়েছেন। নেতার স্ত্রীর নাম কনকলতা। রক্ষিতাকে নিয়ে নেতার সঙ্গে স্ত্রী কনকলতার প্রায় বাক বিতণ্ডা হয়। কনকলতা নাকি রাগ করে বাবার বাড়ি কুলতোড়া চলে গেছে দিন পনের আগে। বিশালদা কুলতোড়া গ্রামে গিয়ে কনকলতার খোঁজ নিলেন। জানতে পারলেন সে আজ প্রায় ছ মাস আসেনি। স্বামীর বাড়িতেই আছে। দিন পনেরো আগে তার স্বামী এসেছিল কনকলতা এখানে এসেছে কিনা জানতে। তারপর সে বলেছিল—তাহলে

হয়ত মামার বাড়ি কুশুমযাত্রা গেছে। সেখানে খোঁজ করার জন্য সে চলে যায়। বিশালদার মনে সন্দেহ জাগে। গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে মনে হয়। তারপর হঠাৎ মনে হয় কনকলতা খুন হ'য়ে যায়নি তো। যদি তা হয় তাহলে কিভাবে এগোবেন চিন্তা করতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে ঠিক করলেন নেতার খাস লোককে ধরতে হবে। মণিলাল খুব পেয়ারের লোক নেতার। তার অজান্তে কিছু হবে না। মণিলাল নেতার হয়ে নানা কুকাজ করে। নেতার ছত্রছায়ার থাকে বলে তাকে প্রমাণসহ কোন ঘটনাতেই ধরা যায় না। সত্যপথে এগিয়ে মণিলালকে ধরা বা প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা কঠিন। আবার সেই নেতাকে খুনের মামলায় ধরলে তার পনের দিনের মধ্যে বিশালদাকে বদলী হতে হবে। তখন যার ওপর তদন্তের ভার পড়বে সে মামলাটা নষ্ট করে দেবে। বিশালদা স্থির করলেন নেতাকে গ্রেপ্তার করবেন না এখন। প্রমাণ সংগ্রহ করে যাবেন গোপনে। তারপর চার্জশিট কোর্টে যেদিন পাঠাবেন সেদিনই সেই নেতাকে কোর্টে চালান দেবেন। বিশালদা আমাকে বলেছিলেন—জান অর্চিষ্মান দশদিন আমি ঠিক মত খাইনি, ঘুমাই নি। শুধু চিন্তা কনকলতা রহস্য আমি উদঘাটন করবই। ভাগ্য সেসময় হঠাৎ সহায় হয়ে গেল। একজন ধরা পড়ল ডাকাতি মামলায়। সে থানার জমাদারের কাছে স্বীকার করল ডাকাতি করে তার ভাগে পড়েছিল একটা সোনার হার। খুব সৎ জমাদার ছিল সে। আমাকে বলল সে কথা। আমার কাছে নিয়ে এল সেই ডাকাতটাকে। সে বলল হারটা আছে সুদর্শন নামে একজনের কাছে। সুদর্শন মণিলালের দাদা। আমি জমাদারকে বললাম—মণিলালকে গ্রেপ্তার করার এটাই সুযোগ। জমাদার ধরে নিয়ে এল সুদর্শনকে। জমাদারকে দিয়ে বলা করলাম তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে। তোমার ভাই মণিলালকে আনতে হবে থানায় এবং তাকে যা বলব করতে হবে। দায়িত্ব তোমার। দু'ঘণ্টার মধ্যে মণিলালকে থানায় নিয়ে এল সে। মণিলালকে বলা হল সুদর্শনকে ছেড়ে দিতে পারি তুমি যদি সাহায্য কর। দাদাকে বাঁচাবার আগ্রহ ছিল তার। সে হদিশ দিল। তার কথামত—নেতার বাড়িসংলগ্ন এক ডোবার পাড়ে মাটির গর্ত থেকে উদ্ধার হ'ল কঙ্কাল। শনাক্ত করার কোন অসুবিধা ছিল না। তার কাপড় সায়া-ব্লাউজ আর হাতে ছিল বালা। সেই বালা হাত থেকে পড়ে গিয়ে মাটিতে ছিল। সব কিছু হ'ল ভোর রাতে। নেতা গেছে তখন কলকাতায় পার্টির কাজে। সব কিছু গোপনে হ'ল। মণিলাল বলল বাদল বাগ্‌দিকে গ্রেপ্তার করলে সব কিছু জানা যাবে। বাদল বাগ্‌দিকে ধরা হ'ল। স্বীকার করল প্রথমে থানায়। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তার কথায় জানা গেল নেতার সঙ্গে স্ত্রীর বাক-বিতণ্ডা হ'তে হ'তে নেতা হঠাৎ স্ত্রীর গলায় হাত দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। বাদল বাগ্‌দিকে গভীর রাতে ডেকে সেই নেতা মাটির গর্ত করিয়ে কনকলতার মৃতদেহ সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়। কি ঠাণ্ডা মাথা সেই নেতার ভাবলে অবাক হবে। তারপর দিনই সেই নেতা অন্য এক মেয়েকে কনকলতা সাজিয়ে এনেছিল। উদ্দেশ্য পুলিশের খাতায় কনকলতাকে জীবিত দেখাতে। কি প্রমাণ খুব সহজেই এসেছে। নেতার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ করতে যাওয়া। গাঁয়ের মানুষের কাছে প্রকাশ করা স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছে। এরপর সেই নেতাকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করে দিলাম। যতক্ষণ সে থানায় ছিল তদ্বিরের পর তদ্বির। এক দেড় ঘণ্টা থানায় রেখেই পাঠিয়ে দিলাম কোর্টে।

বিশালদা চুপ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কতদিন পর বদলী হলেন?

বিশালদা হেসে বললেন—দশ দিনের মধ্যেই বদলীর আদেশ এসে গেল। পরদিনই চলে গেলাম অন্য থানায়।

এভাবে কত থানায় যে বদলী হয়েছেন তিনি শুধুমাত্র তিন কি চার মাসের ব্যবধানে।

অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারতেন না। পুনম বৌদিকেও পেয়েছেন তিনি ভাগ্যক্রমে। কোন বিলাসিতা নেই। শাড়ি-গয়নার আকর্ষণ নেই। চল অন্য থানায় বললে দশ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত। স্বামী যদি কষ্ট করতে পারে, আমি পারবো না কেন। দুজনের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা একধরনের। একটা ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। ছেলে কুনালকে মানুষ করতে হবে। দুজনে হয়তো ভাবতেন দুরকম। লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে কুনাল? বিশালদা চাইতেন ছেলে এস. পি হবে, তারপর ডি. আই. জি এবং শেষে আইজি। কিন্তু পুনম বৌদি কি চাইতেন মনে মনে বলা যায় না। হয়ত স্বামীর ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা ছিল। অথবা পুলিশের চাকরি আর নয়। তার থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা মিলিটারি হওয়া অনেক গৌরবের।

মনে পড়ল বিশালদাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম বছর দুয়েক পর। সেই নেতার কি হ'ল? কমললতাকে খুন করে সাজা হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'না সাজা হয়নি। কোন সাক্ষী কিছু বলেনি কোর্টে। হয়ত ভয়ে। নয়তো টাকা দিয়ে সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। বিচারের সময় তো আমি ছিলাম না। আর আমার তো কোন জাত ক্রোধ ছিল না। সত্যকে তুলে এনেছিলাম কোর্টে। তখন তো জানতাম না সত্য কোর্টে আসতে ভয় পায়। বলেই অট্টহাসি হেসেছিলেন বিশালদা।

আজ সব কথা মনে পড়ছে। ভাবছি তাঁর মতো মানুষ কেন বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। অকালে, আকস্মিক। আবার ভাবছি এই অকাল মৃত্যু কুনালের শৈশবে হয়ত এক আশীর্বাদ। বিশালদা বেঁচে থাকলে কুনাল হয়ত মানুষ হ'ত না। বিশালদার বৃদ্ধ জীবন হয়ত কষ্টপেতে কুনাল অমানুষ হ'লে। পদোন্নতিতে হয়ত বিশালদা ডি. এস. পি বা এস. পি হতেন বেঁচে থাকলে। কুনাল হয়ত তাহলে ভাবতো এস. পির ছেলে আমি। আমার কিছু না করলেও চলবে। তাঁর মৃত্যু কুনালকে এক কঠিন বাস্তবের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সব কিছুরই দুটো দিক থাকে। একটা খারাপ. অন্যটার ভবিষ্যৎ ভাল। কুনালের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। বাবার মৃত দেহকে ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে সে মানুষ হবে। বাবার শেষ থেকে ও শুরু করবে।

নেতা গ্রেপ্তারের ফলশ্রুতি যেমন একটা বদলী তেমনি নানা কারণে তাঁর বদলী হয়েছে। শুধু সৎ পুলিশ অফিসার বলে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গিয়ে এবং অবিচার সহ্য না ক'রে। দু তিনটে থানা বদলের পর একবার বিশালদার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ছিল। বিশালদা বললেন—কোন নেতার শাস্তি হয়েছে এরকম তুমি কি দেখেছ অর্চিষ্মান? আমার দুঃখ অন্যখানে। আমি সেই মামলার শেষ সাক্ষী। তদন্তকারী অফিসার। কোর্টে গিয়ে শুনলাম নেতার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দেয়নি। শ্বশুর বা তার লোক সত্য গোপন করেছে, অনেরা মিথ্যা বলেছে। সরকারী উকিলও দেখলাম আমার ওপর রুষ্ট। আমি নাকি বিরোধী দলের নেতার কথায় এবং অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে সেই নেতাকে লোক চক্ষে হেয় করেছি। পরে কিন্তু অনেকেই আমার প্রশংসা করেছে। দারোগার জীবনে প্রশংসা এবং নিন্দা থাকেই। আমার সে সব মনে দাগ কাটে না।

জীবনের স্বল্প পরিসরে বিশালদা কত ঘটনা কত চরিত্র দেখেছেন। যখনই গেছি শুনেছি নানা ঘটনা। আমিও বলেছি আমার দেখা ঘটনা ও চরিত্র। সব মনে নেই। থাকলে হয়ত ভাল হ'ত। দুজনে মিলে শেষ জীবনে উপহার দিতে পারতাম কৌতূহলী পাঠকদের। কিন্তু হ'ল না।

বিশালদার মৃত্যু আজ বহু বছর হ'য়ে গেল। কুনালেরই তো এখন বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

বছর দুয়েক আগে কুনালের বিয়ে হয়েছে। বার বার করে লিখেছে বিয়েতে যেতে হবে। দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছি সুদূর পাঞ্জাবে আমার যাওয়ার নানা অসুবিধার কথা। আমার সংসার বড় হয়েছে। আগে যেমন হুটহাট করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত, তা হয় না। সংসারের ও পেশার নানা বন্ধন আটকে রাখে। পুনম বৌদি অভিমান ক'রে চিঠি লিখেছে। অনুরোধ করেছেন পরে যেন একবার আসি। ছেলে বৌকে দেখে যাই। আমার পাঠানো মঙ্গলসূত্র সকলের খুব ভাল লেগেছে। পুণম বৌদির বেশি ভাল লেগেছে এই ভেবে বৌমার পারমিন্দরের গলায় এই মঙ্গলসূত্র কুনালের দীর্ঘ জীবন দেবে। ছেলে বৌ-এর বিয়ের নানা ছবি পাঠিয়েছে। কুনালের বৌ খুব সুন্দর হয়েছে। মুখখানা খুব মিষ্টি। কুনালের ছবিতে বিশালদার মুখ যেন বসান। মা বন্যে পুত্র শুনেছি, দেখেছি বাপ বন্যে কন্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন আলাদা। কুনালের মুখটা হয়েছে বিশালদার মতো। ছবি দেখে খুব আনন্দ হ'ল। কত অল্প বয়সে পুনম বৌদি বিধবা হয়েছেন। একে একে করতার সিং, প্রেম সিং চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। আরো কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন জীবনে। সব কিছুর মধ্যে কুনালকে মানুষ করেছেন। আজ কত বছর পর বৌদি সুখের মুখ দেখতে পেলেন।

বছরখানেক পর পুনম বৌদির একটা চিঠি পেলাম। কুনাল অফিসের কাজে নাকি কলকাতা আসছে। তারিখ দেওয়া আছে কবে কোন ট্রেনে কুনাল হাওড়া স্টেশনে নামবে। যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। গাড়ি দু'ঘণ্টা লেট। অপেক্ষা করতে হবে স্টেশনে। বার বার বিশালদার কথা মনে আসছিল। একদিন বিশালদার থানায় পৌঁছানমাত্র আমাকে বললেন—চল আমার সঙ্গে। একটা সংবাদ এসেছে। তারই তদন্তে যাচ্ছি। তোমারও নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আমি বললাম—উকিল পুলিশ এক গাড়িতে। তাও আবার একটা মামলার তদন্তে। শেষে আমাকেও সাক্ষী ক'রে দেন। আমি সাক্ষীকে জেরা করি, এখন আমাকেই জেরা খেতে হবে। বিশালদা কোন কথা শুনলেন না। জোর করে গাড়িতে তুললেন। আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেলাম গন্তব্যে। পেছনে বড় পুলিশ ভ্যান। জন দশেক রাইফেলধারী পুলিশ। আমি গাড়ি থেকে নামলাম না। বিশালদাও জোর করলেন না। মনে হ'ল ভুলেই গেছেন আমি সঙ্গে আছি। মন তখন সেই কাজে। অন্য কোনদিকে মন নেই। মিনিট কুড়ি পর ফিরলেন হাসি মুখ নিশ্চয়। যেন রাজ্যজয় করে এলেন। পেছনের পুলিশ ভ্যানে কয়েকজনকে পুলিশের হেপাজতে দিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন জিপে। পেছনে একটি সুন্দরী যুবতীকে তোলা হ'ল। সে তখন খুব কাঁদছে। অনুমান করলাম তাকে নিয়েই এই কাণ্ড। পথে বিশালদা খুব হাসি খুশি। বললেন—আজ একটা মহৎ কাজ করা গেল। যুবতীর জীবন যৌবন সব কিছু রক্ষা পেল।' বুঝলাম পুলিশী তৎপরতা কত অপরাধ রুখে দিতে পরে। আর কিছু জানতে চাইলাম না। মাইকের আওয়াজে সম্বিত ফিরে এল। কালকা মেল চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।

গেটের সামনে দাঁড়ালাম। চোখ ঘুরছে যারা নামছে আর এগিয়ে আসছে। একসময় দেখলাম ছ'ফুট লম্বা বিশাল চেহারার এক যুবক এবং তার পাশে-তার বৌ সালোয়ার কামিজ পরা। কুলির মাথায় বড় বড় দুটো সুটকেশ। এগিয়ে আসছে তারা। চিনতে কোন কষ্ট নেই। ছবিতে দেখা মুখ। কিন্তু বিশালদার থেকেও কিছুটা লম্বা, স্বাস্থ্যও কিছুটা ভাল। আমি এগিয়ে গেলাম একটু। আঙ্কল বলে দুজনেই মাথা নত ক'রে আমার হাঁটু ছুঁলো। কুনালকে জড়িয়ে ধরলাম। পারমিন্দরের মাথায় হাত দিলাম। স্টেশনের মধ্যেই ওর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। পুলিশের একজন ওদের নিয়ে গেল গাড়িতে। আমাকেও উঠতে হ'ল সে গাড়িতে। পথে

কুনাল যে ভাবে কথা বলছিল মনে হ'ল যেন অনেকদিনের চেনা। আমি যেন ওর নিজের আঙ্কল। পুনম বৌদির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কুনাল ও পারমিন্দর কয়েকঘণ্টা ছিল কলকাতায়। তারপর তারা চলে গেল উত্তরবঙ্গে। একটা অপরাধী চক্রের সন্ধানে। বুকভরা খুশি নিয়ে ফিরে এলাম। কুনালের মধ্যে নতুন করে বিশালদাকে দেখলাম।

কয়েদীরাও ভাবে

মহামান্য জুরিবৃন্দ,
সিউড়ী জেলের ভেতরে গিয়ে নানা কয়েদী দেখার সুযোগ হয়েছিল। কয়েকবারই। সরকার জেল ভিজিটার নিয়োগ করেছিলেন আমাকে। বেশ কয়েক বছর আগে। সেই সুবাদে দেখেছিলাম সালামত খাঁ, লছমন যাদব, বীরেন সিং, নেবুলাল, ভুলুয়া, বদ্রী নারায়ণ আরো অনেককে। দেখেছি, কথা বলেছি। জেনেছি তাদের মনের কথা। জজ, উকিল মুহুরি, পুলিশ সম্বন্ধে তাদের ধারণা অকপটে বলেছে। তারাও যে ভাবে, দেখে ও শোনে আর তার ওপর ভিত্তি করে একটা ধারণা জন্মায় তাদের মনে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। অজানা কত কথা জেনেছি। কোনদিনই হয়ত জানতে পারতাম না তাদের সংস্পর্শে না এলে। সশ্রম কারাদণ্ড পাওয়া কয়েদীরা চাষ করে, তরি-তরকারি আজ্জায়, মাটি কাটে। আরো কত কাজ করে। কাজের ফাঁকে তারা কোর্ট-কাছারী, উকিল মুহুরিদের নিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে। জেলের শাসকদের, ওয়ার্ডারদের ভ্রষ্টাচার ও বেআইনি নানা কাজের তারা নীরব সাক্ষী। পুলিশী নির্যাতনে জর্জরিত অভিজ্ঞতা তাদের আস্থা কেড়ে নেয় বিচার ব্যবস্থায়। নির্দোষ হয়েও সাজানো মামলায় যথার্থ আইনি সাহায্য না পেয়ে বছরের পর বছর কারাবাস করে। পুলিশী তদন্তের স্বার্থ বজায় রাখতে নির্দোষকেও কারাবাস করতে হয় মাসের পর মাস। আদালতের আঙিনায় বিশ বছরেরও বেশি কাটিয়ে এতটা জানা ছিল না। জেলে কৌতূহল যতটা মিটেছে তার থেকেও দুঃখ পেয়েছি বেশি। বহু অবিচার তো দেখেছি পেশার জীবনে। নানা কারণে ও পরিস্থিতিতে। বিচারক তো পর নির্ভরশীল। মামলার নথিতে যে প্রমাণ আনা হবে তারই মধ্যে বিচারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সন্দেহে তো কারো শাস্তি দেওয়া যায় না। যার ওপর প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব, যার প্রমাণ পরীক্ষা করার কর্তব্য, সে দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন হবে বিচার তেমনি হবে। এই বিচার ব্যবস্থায় যার যা কাজ তা যদি সুষ্ঠু ভাবে, নিঃস্বার্থভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে পালন না হয় তাহলে এক নির্দোষ, বিচারককেই অন্য চোখে দেখবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও যারা বিচারের সঙ্গে যুক্ত।

প্রথম যেদিন জেল দেখতে গিয়েছিলাম, চোখে পড়েছিল প্রদীপ্ত নামে এক সুন্দর চেহারার যুবককে। বয়স কতই বা হবে। কুড়ি-বাইশ। গায়ের রং ফর্সা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। তেমনি স্বাস্থ্য। মুখে একটা সরলতার ছাপ। তার সঙ্গে বিমর্ষতা মেশানো। চুপ করে আছে এক জায়গায় হতাশা নিয়ে। মনে হ'ল জীবন সম্বন্ধে সব কিছু স্বপ্ন যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সামনে দাঁড়াতেই একবার চোখ মেলে তাকাল। তারপর চোখটা নামিয়ে নিল। সেদিন কোন কথা হল না। জেলারের কাছে জানলাম তার নাম প্রদীপ্ত রায়। বধূ নির্যাতন ও আত্মহত্যার প্ররোচনার

অভিযোগে বিচারাধীন। ও নাকি কারো সঙ্গে কথা বলে না। খাবার দেওয়া হলে নাম মাত্র খেয়ে উঠে পড়ে। সব সময় কি যেন ভাবে। ওর আকর্ষণে দু-তিন বার গেছি। অনেক চেষ্টায় তাকে সহজ করতে হয়েছিল। আমার ওপর আস্থা আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রদীপ্ত বলল—আপাদের কোর্ট-কাছারী সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কলকাতায় পড়াশোনা করি। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-বৌদিকে নিয়ে সুখের সংসার। মাসে একবার বাড়ি আসি। যে দুচার দিন থাকি বৌদির সঙ্গে হাসি হুল্লোড় করি, খেলা করি। আমাকে নিজের ভায়ের মত দেখত। মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে তখন। বৌদির খুব ছেলের সখ ছিল। দাদা নানা ডাক্তার দেখিয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। মনে একটা কষ্ট ছিলই তার জন্য। কলকাতায় থাকার সময় চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ছিল। বৌদির চিঠিতে একটা মানসিক কষ্টের আভাস পেতাম। আমি আশা পূরণের সান্ত্বনা দিতাম। বাবা মাকে সেবায় বৌদি কোন ত্রুটি রাখত না। তাঁরা বৌদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হঠাৎ একদিন কলকাতায় খবর গেল বৌদি আগুনে পুড়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েও তাকে জীবিত দেখতে পেলাম না। যখন পৌঁছলাম তখন সব শেষ। আগুন লাগা দেখেই দাদা নেভাতে চেষ্টা করেছিল। তার হাত দুটোও পুড়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে প্রায় তিন ঘণ্টা জ্ঞান ছিল। ডাক্তারকে বলেছিল কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার। বৌদির দাদা ও ভাই এসেছিল। তারাও জীবিত দেখতে পায়নি। তারপর তিনদিন পর শ্রাদ্ধ-শান্তি হ'ল। সে সময় বৌদির মাও এসেছিল। বাবা শয্যাগত থাকায় আসতে পারে নি। এপর্যন্ত ঠিকই ছিল। হঠাৎ দশ-বারো দিন পর পুলিশ এল। আমার বাবা, মা, দাদাকে গ্রেপ্তার করল। জানতে পারলাম বৌদির দাদা বধূনির্যাতন ও আত্মহত্যার প্ররোচনায় মামলা করেছে। মাস দেড়েক পর বাবা ও মা জেল থেকে ছাড়া পেলেন জামিনে। দারোগা আমাকে ধরেনি ছাত্র ব'লে। বলেছিল গরমের ছুটি পড়লে যেন কোর্টে হাজির হই। তিন মাস পর দাদা জামিন পায়। ছুটি শুরুর দিন আমি হাজির হই কোর্টে। আমাকে জামিন দেননি জজ সাহেব। চৌদ্দদিন অন্তর কোর্টে যাই। সারাটা দিন ছোট একটা ঘরে কাটানো। দুর্গন্ধে ভরা সে ঘর। তার নাম নাকি লকআপ। কতকাল যে এ কর্মভোগ কে জানে। বাড়িতে বাবা ও মা দুজনেই শয্যাশায়ী জেল থেকে বেরিয়েই। সেদিন কোর্টে দেখা হ'ল মুরসেলিম নামে একজনের সঙ্গে। সে জামিনে ছাড়া পেয়ে আছে আঠারোবছর। তার বিচার এখনো শুরুই হয়নি। আমারও কি সেরকম হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে আছি। জানি না কবে মুক্তি পাব?

এতক্ষণ শুনছিলাম প্রদীপ্তর কথা। ভেঙে পড়েছে মাত্র এত অল্প সময়ে। আশ্বাস দিয়ে বললাম—সব মামলার তো দেরি হয় না। তোমার মামলা হয়তো এক বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে। জামিনও হয়ে যেতে পারে মাসখানেকের মধ্যে। প্রদীপ্ত বলল—আমার প্রথম দিনের কি অভিজ্ঞতা জানেন? কোর্টে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল আরো দশ পনের জনের সঙ্গে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি কালো কোট ও কাল গাউন পরা ম্যাজিস্ট্রেট। বসে আছেন। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে একজন খাকি পোশাক পরা। সেই পোশাকেরই একজন বাবা, মা ও দাদাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। আমার উকিল বলল—এফ. আই. আরে নাম আছে ঠিকই। তবু তো সে ছাত্র এবং কলকাতায় পড়াশোনা করে। ম্যাজিস্ট্রেট লিখলেন যার মানে হয় এফ. আই. আরে নাম থাকলে তাঁর জামিন দেবার ক্ষমতা নেই। আমার উকিল জজ কোর্টে আবেদন করলেন। জজ সাহেব লিখলেন আমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং তদন্তের জন্য আরো সময় দেওয়া উচিত। বার বার নীচের কোর্ট আর উঁচু কোর্টে আবেদন অগ্রাহ্য

হ'ল। শেষ বার আবেদন নাকচ হল চার্জসিট হয়েছে বলে। এদিকে উকিল মুহুরির প্রণামী দিতে দিতে অর্থনাশ। জামিনের আবেদন করতেই যদি হাজার হাজার টাকা চলে যায় আসল মামলা চালাতেই হয়ত পারব না। প্রতিবার উকিল আশ্বাস দেয়, খরচ হয় কিন্তু কোন কাজ হয় না। সত্যিকারের দোষী হলে কোন ক্ষোভ ছিল না। কবে যে বৌদির হাতের লেখা চিঠি দেখিয়ে মুক্তি পার ঈশ্বর জানেন আর আপনারা।

তবুও চেষ্টা করলাম বোঝাতে। রোগটা তো ক্যান্সার আমি জানি। তা বলতে পারলাম না। আমি তাকে সাহায্য করব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। সাহায্য আমি করেছিলাম। জজকোর্টে জামিন চাইতে দাঁড়িয়ে শুনলাম জজসাহেব সরকারী উকিলকে বলছেন—তদন্ত শেষ হয়ে চার্জশীট হয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দা, প্রমাণ সংগ্রহ শেষ। কি কারণে আসামীকে আটক করব? তিনি কোন সদুত্তর না পেয়ে প্রদীপ্তকে জামিন দিলেন। ওর ভাগ্য—আমারও ভাগ্য। প্রদীপ্ত জেল থেকে ছাড়া পেল। প্রদীপ্তর কথা পরে বলব আবার।

একদিন জেলখানায় দেখা হ'ল আক্তার সেখের সাথে। যাবজ্জীবন জেলের আদেশ আছে। মেদিনীপুর জেলে ছিল। এখন এখানে। তার জীবন আরো করুণ। প্রায় ষাটজন আসামীর মধ্যে সে একজন ছিল। মামলা শুরুর সময় তার নাম ছিল না। অনেকেরই ছিল না। পরে সাক্ষীর জবানবন্দিতে তার নাম আসে। ধর্ম নিয়ে দুই দলের রেষারেষি। তিনজন খুন হয়ে ছিল। পাঁচ জনকে কি অস্ত্র দিয়ে মেরেছিল উল্লেখ আছে। তখন শুধু বলা ছিল আরো বহু লোক ছিল পরে কার কৃতিত্বে দারোগা না সাক্ষীর জানা নেই কেউ দশজনের কেউ অন্য দশ জনের এইভাবে আসামীর সংখ্যা বাড়িয়েছিল। মামলার সাক্ষী হবার সময় ষাট থেকে কমিয়ে আসামীর সংখ্যা পনেরো দাঁড়ায়। সরকারপক্ষের সুবিধা সাক্ষীর স্মৃতিশক্তির ওপর চাপ না দিয়ে শুধুমাত্র পনেরো জনের মধ্যে মামলা সীমিত রাখা। শুরু থেকে তখন প্রায় সাত বছর পার হয়ে গেছে। সাত বছর আগে পুলিশ ধরেছিল। অন্যেরা খরচ করতে পেরে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল কয়েকমাস পরই। কিন্তু আক্তার অর্থাভাবে জেল থেকে বের হ'তে পারেনি। মুহুরি জামিনদার শতকরা পঁচিশ টাকা দাবি করে। হাইকোর্ট আক্তার ও দু'চারজনকে দশ হাজার টাকা জামিনের শর্তে রায় দেন মুক্তির। অন্যেরা গরু ছাগল ঘটি বাটি বিক্রি করে মুহুরি কি দিয়ে বের হয়। আক্তার তা পারেনি। বিচার পর্যন্ত তাকে জেলে কাটাতে হয়েছে। বাইরে যারা আছে তারা ইচ্ছামত মামলা বিলম্বিত করেছে যখন দেখেছে এক জজ যিনি তিন বছর থাকবেন। সাজা দেওয়া হাকিম। তার কাছে মামলা নয়। তার বেশ কয়েক কাল পর মামলা শুরু হয়েছে। অন্যদের মোটামুটি ভাল উকিল ছিল। আক্তারের উকিল সরকার দিয়েছে। দৈনিক পনের টাকা হিসেবে ফি। সেটাও বিল করে নিতে হবে। পাবে ছমাস পর। তার কাছে বেশি কিছু আশা করা যায় না। যারা ভাল উকিল দিতে পেরেছিল তাদের মধ্যে তিন জন খালাস পেল পাঁচজনের মধ্যে। যে দুজন মাথায় আঘাত করেছিল তাদের সাজা হ'ল। তার সঙ্গে আরো পাঁচ জনের। তার মধ্যে আক্তার একজন। আক্তার বলল—জানেন ঘটনার দিন আমি আদৌ গাঁয়ে ছিলাম না। তিনজন সাক্ষী আমার নামে বলল আমি নাকি হুকুম দিয়েছিলাম। সেটাই বিশ্বাস করলেন হাকিম। সাজা হ'ল। উকিল বলল জজ সাহেব কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন প্রতি সপ্তাহে। শনিবার মামলা শুনে বেলা দুটোয় কলকাতা গেলেন। সোমবার বেলা বারোটায় এসে আড়াইটায় রায় দিলেন। মামলা ভাবলেন কখন। আমি কোন উকিলকেই বলতে পারলাম না আপনি শুনানিটাই বা কী করলেন। বড় উকিল বক্তৃতা করল আর আপনি সেটাই আপনার বক্তৃতা বললেন। সে যাক, আমার অদৃষ্ট। কিন্তু দুঃখ আমার অন্য পুলিশ যাকে

খুনী বলে ধরে চারিদি্কের মানুষ তার দিকে আঙুল দেখায়। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের স্ত্রী যখন ধরে নেয় স্বামী খুনী তখন দুঃখের শেষ থাকে না। রামিলা বিবিকে বিয়ে করেছিলাম সুন্দরী দেখে। কিন্তু আমার চেহারা বোধ হয় তার পছন্দ ছিল না। বয়সের তফাত প্রায় পনেরো ষোল বছর। গরিব বাপের মেয়ে। আমার বিঘে তিনেক জমি দিল। পরের জমিও চাষ করতাম। বিয়ের এক বছরের মধ্যে খুনের মামলায় জড়িয়ে ছিল গাঁয়ের শত্রুরা। তাদের একজনের নজর ছিল রামিলার ওপর। হয়ত গোপনে মেলামেশাও ছিল। এখন তাই মনে হয়। পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর যতদিন জেলে ছিলাম রামিলা তার খুনী স্বামীকে একদিনও দেখতে আসেনি। মেদিনীপুরের জেল আমার কাছে দুঃস্বপ্ন। প্রত্যেকের আত্মীয়স্বজন স্ত্রী দেখা করতে আসে। আমার কাছে কেউ আসে না। প্রথম প্রথম দু'চারজন দালাল কোর্ট লক্ আপে আসত ধান্দায়। পয়সার লোভে। তারাও আর আসেনি। গাঁয়ের কাউকে নিয়ে কি আসতে পারে না রামিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে! আমার অভিমান হয়। ঠিক করি এতদিন যখন আসেনি, এবার এলেও দেখা করব না। কিন্তু অভিমানটাই থেকে যায়। রামিলা আসে না। ভাবতাম এমনি ভাবে বাঁচলে আমি হয়ত পাগল হয়ে যাব। আপনি অবাক হয়ে যাবেন শুনে রামিলা একদিন এসেছিল কোর্টে। রায়ের দিন। যাবজ্জীবন জেল শুনতেই বোধ হয় এসেছিল। তার তিন দিন পর জেলে সে আবার এসেছিল। সঙ্গে এক মৌলভী আর এক যুবক। তালাক চাইতে। এ চাওয়া আমার কাছে তখন আদৌ দুঃখের মনে হয়নি। রামিলার ওপর মায়া হল। সে কি করে কাটাবে সারাজীবন। আমার তো আজীবন জেল বাস। সরকার যদি পনেরো-বিশ বছর পর দয়া ক'রে আমাকে ছেড়েও দেয় আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার তো শেষ। মেদিনীপুর থেকে এখানে এসে আমি অনেক সুখী। অনেক কয়েদি বন্ধু হয়ে গেছে। কোন মুহূর্তে আমায় কাঁদতে দেয় না। এদের হৃদয় আছে, মন আছে। আপনাদের আদালত চত্বরে তো শুধু পাথর দেখেছি। অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক। ভালবেসে তো কেউ পাশে দাঁড়ায়নি কি উকিল, কি মুহুরি। ভাগ্য গুণে যদি একজন ভাল উকিল ও বিচারক পেতাম আমার জীবনটাই পাল্টে যেত।' আক্তারের চোখে জল। আর থাকল না আমার কাছে। আমারও তো কিছু বলার নেই। নিজেকে দোষী মনে হয়। আক্তারের চোখ দিয়ে তো দেখিনি। মন নিয়ে তো ভাবিনি এত কাল।

নেবুলাল আবার অন্য মানুষ। ছয় ফুট লম্বা বিশাল পুরুষ। কাল কুচকুচে রং। বহু ডাকাতি করেছে জীবনে। পুলিশ বন্ধু, উকিল বন্ধু, মুহুরি বন্ধু। বিহারের জামবুনিয়া গ্রামের লোক। কিন্তু যবে থেকে ডাকাতি শুরু করেছে কোন সম্পর্ক নেই গ্রামের সঙ্গে। বিভিন্ন শহরে কাটিয়েছে জীবন। কিন্তু কোন শহরেও দুই বা তিন বছরের বেশি নয়। দিনে ভয়সা টানা গাড়িতে মাল নিয়ে যাওয়ার কাজ। রাতে ডাকাতি। পুলিশ ওর কাবেজে। সব সময় তো টাকা-পয়সা দিয়ে বশ করা যায় না। অন্য পথ হচ্ছে মেয়ে মানুষ। প্রায় আট বছর কেটেছে জেলের বাইরে। এই সময়ের মধ্যে গোড্ডা, জামতাড়া, দুমকা দেওঘর, ভাগলপুর শহরে কাটিয়েছে। নেবুলাল বলেছে হুজুর টাকার মতো বন্ধু নেই। ছোটখাটো মামলায় যদিও বা পুলিশ পাঠিয়েছে কোর্টে, ছাড়া পাবার জন্য কাগজে যা লেখার দরকার তাই লিখেছে। উকিল—মুহুরি টাকা নিয়েছে। কাজ ও করেছে। যদি বা কোন ডাকাতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ খোঁজ করেছে, উকিল সাহায্য করেছে। যেদিন কোথাও ডাকাতি হয়েছে সেখান থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে কোন কোর্টে তার হাজিরা লেখা আছে। কিন্তু একদিন তাকে ধরা পড়তেই হ'ল। একটা বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে দেখে একটা ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে আর একটা বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় আগুনের কাছে চলে গেছে। নেবুলাল ঝাঁপ দিয়ে বাচ্চাকে বাঁচায়

বাইরে থেকে যারা আগুন দেখতে পায় তারা চিৎকার করতে করতে বাড়ির দিকে আসতে থাকে। মানুষজনকে আসতে দেখে তার দলের পাঁচ-সাতজন পালিয়ে যায়। নেবুলাল পালাবার চেষ্টা করেনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘরের পর বারান্দায় আসতেই সবাই তাকে ধরে ফেলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বিশাল চেহারার মানুষ দেখে তাকে ডাকাতদলেরই একজন এবং বাচ্চা চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে ভাবে। নেবুলাল সেই বাচ্চার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তো কথা বলতে পারে না। সত্য কথা ডাকাত নেবুলালও পারে না বলতে। সে ভাবতে থাকে জীবনে একটা শিশুর সে প্রাণ বাঁচিয়ে যে কাজ করেছে তার তৃপ্তি অনেক। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। তারপর বিচারে শাস্তি হয়েছে।

জেলখানায় গিয়ে আমার অভিজ্ঞতাও কম নয়। অপরাধ জগতের কত অজানা কথা জেনেছি। দোষী নির্দোষের সহাবস্থান এই জেলখানায়। জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলার একসঙ্গে সকলেই সৎ সাধারণত দেখা যায় না। দুজন অসৎ তো একজন সৎ। কয়েদীর চোখে কেউ সৎ পড়ে না কিন্তু। যা চলে আসছে তাই চলবে। ঠিকাদার টেন্ডার দিয়ে মাল সরবরাহের অধিকার পায়। সে মাল দেয় বিল করে তার দ্বিগুণ। কয়েদীদের কাছ পর্যন্ত সব মাল পৌঁছে না। ঘি, মাছ, মাংস ভাল চাল ডাল পৌঁছে যায় কোয়ার্টারে এটাই বিশ্বাস করে কয়েদিরা। কয়েদীদের দুঃখ দুর্দশার কথা কতটা বিচারক জানেন তা তাদের জানা নেই। শীতে ছেঁড়া কম্বল গায়ে কাটাতে হয় নতুন কম্বল এলেও। মদ-গাঁজা পেতে অসুবিধা হয় না অনেকের যদি ওয়ার্ডার সহায় থাকে। এসব অভিযোগ বহু কয়েদীর। জানি না এখন কতটা উন্নতি হয়েছে জেলখানার ভেতরটা। কারণ আজ সাত-আট বছর কোন কয়েদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

লছমন যাদব বিহার থেকে আসা আর একজন। সে ধরা পড়েছিল বাংলায় কোন অপরাধের জন্য। দোষ স্বীকার করার জন্য থানায় তাকে বলে দিয়েছিল পুলিশ। সে কিন্তু কোন স্বীকারোক্তি করেনি। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আলাদা করে রাখার জন্য আদেশ দেন। সে যেন ভাবতে পারে স্বাধীনভাবে। তাকে স্বাধীনভাবে ভাবতে হয়নি। কুশিক্ষা দেবার মানুষ কানে কানে ঠিক বলে দিয়ে আসে পুলিশের কথায় স্বীকার কোর না। তাছাড়া স্বীকার করলে সাজা থেকে অব্যাহতি নেই। লছমন বলেছিল—"হুজুর হামারা বিসওয়াস নেহি কোই উকিল—মুহুরি পর। ও তো সব লোক দালাল হ্যায়।"

আমি বললাম এইসা মাত কহো লছমন। সব উকিল মুহুরি একহি তরা নেহি হোতা হ্যায়। হো সাকতা হায় তুম জিসসে মিলে থে ও দালাল লেকিন সবকা উপর এইসা ইলজাম লাগানা আচ্ছা নেহি হ্যায়।

লছমন চুপ করে থাকে। কোন প্রতিবাদ করে না লছমনের সঙ্গে থাকা জামাল বলে—হুজুর লছমনের দোষ নেই। ও যা দেখেছে তাই বিশ্বাস করে। ও পাল্লায় পড়েছিল যতীন মুহুরির। আপনারা তাকে কতখানি জানেন জানি না। কিন্তু ওর দুর্নাম আছে এক টাউট বলে। প্রথমেই একজনের কাছে হাজার দুহাজার টাকা নিয়ে বসবে যাতে ওর কব্জা থেকে সে যেতে না পারে। দালালের ভাষায় পাখির ডানা ভাঙা। উড়ে গিয়ে অন্য ডালে বসবে তার উপায় নেই। তারপর সস্তা উকিল দিয়ে কাজ করাবে। উকিল সব মিলিয়ে পাবে বড় জোর একশ টাকা। নতুন এসেছে কোর্টে। যা পায় তাই অনেক। আশার বাইরে। মামলায় যতীন মুহুরিই সব। তিনমাস পর যখন কারো জামিন হবে তখন শতকরা পঁচিশ টাকা তাকে দিতে হবে। আর আপনাদের হাকিমকেই বা কি বলব। পাঁচ হাজার দশহাজার টাকার জামিনের আদেশ। জেল থেকে বেরোতে সেই হিসেবে কত টাকা লাগবে একবার ভাবুন। যতীন মুহুরি নিজে কোন

লেখাজোখার কাজ করে না। গোটা পাঁচেক অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারাই জামিননামা দেবে। জামিননামা মানে আর এক জেলখানা। প্রতি মুহূর্তে ভয় জামিন ছেড়ে দেবে। তাহলে আবার বহু টাকা দিয়ে নতুন জামিনদার দিতে হবে। নিজের পছন্দের ভাল উকিল দেবার অধিকার নেই। মক্কেলের উপকারের থেকেও বেশি বখরা নিজে যাতে পায় সেইদিকে কড়া নজর। উকিলের নাম করে পাঁচ হাজার আদায় করে উকিলকে দেবে একহাজার। লছমনের আত্মীয়দের কাছে যতীন নিয়েছে নানাভাবে বহু টাকা। ঘুষ দিতে হবে বলেও টাকা নেয়। এরপর যদি লছমন কিছু খারাপ ভাবে উকিল মুহুরি সম্বন্ধে তাহলে কি দোষ দেবেন হুজুর?

আমি সত্যি কোন জবাব দিতে পারি না। একজনের দোষে কয়েদীদের চোখে সারা গোষ্ঠী ঘৃণ্য। টাউট শ্রেণীর কিছু মানুষ আছে বলেই তো সম্মান হারানো কিছু মুষ্টিমেয় শ্রেণীর। দিনের দিন টাউটের সংখ্যা এত বাড়ছে যে এই বিচার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি হবে ভাবলে আতঙ্কিত হই। কারণ এই ব্যবস্থায় তারা তো একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়। আইনের আশ্রয়ে থেকেই তো তারা বেআইনি করে।

জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে কয়েদীরা হাকিম বলে। কোন কোন হাকিমকে যেমন দেবতা ভাবে তেমনি বিপরীত ধারণাও থাকে। জেলে বসেই তারা সব খবর পায়। কি ভাবে পায় তা জানা নেই। একদিন একজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। অরুণাংশু তার নাম। দাঙ্গা ও মারপিটের ঘটনায় তিনি অভিযুক্ত হ'য়েছিলেন বছর চারেক কোর্টে আনাগোনা করে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা তিনি বলেছিলেন। এক বিচারক প্রকাশ্যে বললেন—"লোকের ধারণা হয়ে গেছে কোর্টে কারো সাজা হয় না। সে ধারণা পাল্টাতে হবে। তানাহলে কোর্টের প্রতি মানুষের ভয় থাকবে না।" অরুণাংশু একদিন দেখেছেন এক বিচারক। চারজন আসামী একদিন কোর্টে হাজির থাকতে পারেনি। তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট করতেই পারেন। কিছু বলার নেই। কিন্তু যারা হাজির আছে সংখ্যায় প্রায় চল্লিশজন তাদেরকেও বিচারক জেলে পাঠালেন। মুখে বললেন এই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের জেলেই থাকতে হবে। পরে অবশ্য তারা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিল। কিন্তু খরচান্ত ও দুর্ভোগ তো তাদের সহ্য করতে হয়েছে। তার ক্ষতিপুরণ কীভাবে হবে। অরুণাংশু বলেছিল কাদের নামে একজনের কথা। তার যখন সাজা হল উকিল বললে হাকিম মামলাটা বুঝতেই পরে নি। আপিল করলে এসাজা টিকবে না। কাদেরের বউ গয়না বেচে আপিল করল। আপিলেও রায় বহাল থাকল। উকিল বললে নীচের কোর্টে মামলাটা ঠিকমতো চালান হয়নি। বড় উকিলের কথা ফেলে দেওয়া যায় না। আবার প্রশ্ন করতে সাহস হয় না এতই যদি মামলাটা খারাপ ছিল তাহলে খরচ করিয়ে আপিল করলেন কেন? কে দেবে আলো যাতে দেখা যাবে কোন উকিল ঠিক বলল? এই বিভ্রান্তি নিয়ে কাদের জেল খাটছে। শপথ নেয় ছেলের মাথায় হাত দিয়ে এবং বলে যে সে নির্দোষ। অরুণাংশু শিক্ষিত অন্যান্য কয়েদীদের চেয়ে। জেলে সে বিভিন্ন কয়েদীর কাছে নতুন নতুন কথা শোনে। আমাকে বলল—"থানার ডাক জানেন? ভাবছেন চিঠি পত্রের ডাক বিলি। তা কিন্তু আদৌ নয়।" এই বলে ডেকে পাঠাল সূর্যপ্রসাদকে। তাকে বলল, 'তোর ঘটনাটা বল। সেই থানার ডাক। তুই তো মনোহর লালকে খুন করার জন্য জেলে আছিস। মনোহর কি করত? সূর্যপ্রসাদ খানিকটা ভেবে বলতে শুরু করল। "শহর বা গঞ্জে অবাঙালি ব্যবসায়ী যেখানে আছে তারা খুব ভীতু। তাদের সংখ্যাও অনেক। থানায় সরাসরি তাদের কাছ থেকে কেউ মাসিক বন্দোবস্তের টাকা দেয় না। থানায় গোপনে নীলাম ডাক হয়। বেশি ডাক যে দেয় তাকেই থানা থেকে ঠিকা দেওয়া হয় মাসিক আদায়ের। যে

ঠিকা পায় ডাক মতো টাকা জমা দেয় থানায়। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে। শুধু ডাক বেশি দিলেই হবে না। যারা ডাক দেয় তারা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত। সেটাই থানার কাছে প্রধান। মনোহর লাল চৌবে তেমনি এক ডাকের ঠিকাদার বছরের পর বছর ধরে। কারণ তার ডাক সব থেকে বেশি। মাসের প্রথম সপ্তাহে মনোহরলাল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থানায় জমা দেয় নিয়মিত। যা আদায় করে তাতে থানায় দেওয়ার পরও মাস প্রতি দশ হাজার টাকা তার নিজের থেকে যায়। তাছাড়া কোলিয়ারি থেকে চুরি করা কয়লা ট্রাকে ট্রাকে চালান যায় মুর্শিদাবাদ, মালদা এমন কি উত্তরবঙ্গে। একটা র‍্যাকেট কাজ করে। মনোহরলাল তাদেরও মাধ্যম। এইভাবে সাত বছরে মনোহরলাল প্রচুর টাকার মালিক হয়ে যায়। সে প্রথম যখন আসে কিছুই ছিল না তার। প্রথম সে ঠেলা গাড়ি চালাত। কোন এক দারোগার কৃপায় সে হয় টিকটিকি। যে কোন অপরাধ কোথাও হবে তারও যেমন খবর দিত, তেমনি ঘটে যাওয়া অপরাধের সঙ্গে কারা যুক্ত সে খবরও দিত থানায়। এইভাবে থানার সুনজরে আসে সে। আর্থিক সাহায্যও পেত থানা থেকে। চোরাই কয়লা যারা পাচার করে তাদেরও সংস্পর্শে আসে সে। তাদের সঙ্গে থানার একটা যোগাযোগ ছিল বহু আগে থেকেই। সরাসরি পাওনাগণ্ডা পেতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বাধ সেধেছিল পার্টি করা কিছু ছেলের দল। ঘুষ নিতে গেলে তারা চিৎকার করে বেশি। বাধাও দেয় তারা কোন ট্রাককে ছেড়ে দিলে। তার থেকে এই ডাক ব্যবস্থা ভাল। বেশি জানাজানি হয় না। শাসকদলের হয়ে দু'চারটে কাজ করে দিলে দলও চায় ঘুষ নিক। তাদের দিয়ে কাজ করানো সহজ। ভয় থাকে মরুভূমি থানায় বদলী। তবে ডাকব্যবস্থা দলের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ করে না। মনোহরলাল অতি অল্প সময়ে বাড়ি গাড়ির মালিক হল। ভোটের সময় গাড়ি দেয়। দল এবং পুলিশ উভয়েই সন্তুষ্ট। ব্যবসাদারেরা খাতির করে। মনোহরলাল যেমন মাসিক টাকা নেয় তেমনি অনেক আগাম খবর তার মারফত পুলিশ পাঠায়। কালোবাজারী করার জন্য গুদাম ভর্তি মাল সাময়িক সরিয়ে ফেলতে পারে ওপরওয়ালার ইন্সপেকশনের আগেই। কোন মামলা হয় না। সেই মনোহরলাল একদিন খুন হ'ল। বেপরোয়া ছিল সে। তাকে কেউ মারবে বিশ্বাসই করত না। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত সকলেরই থাকে। মনোহরলালের শত্রুর অভাব ছিল না। একচেটিয়া থানার ডাকের ঠিকাদার বেশ কয়েক বছর ধরে। ব্যবসাদারদের কারো কারো ক্ষোভ ছিল মনোহরলালের কাজে। তাকে খুন করার সংবাদ থানায় যেতেই পুলিশ পাগলা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল এলাকার নিরীহ লোকের ওপর। ধরপাকড় ও নানা নির্যাতন করেও পুলিশ আসল খুনী ধরিতে পারে না। কিন্তু কিছু লোককে না ধরলে ওপরওয়ালা চোখ রাঙ্গায়। সূর্যপ্রসাদ বিনা প্রমাণেই জেলে এসেছে। সে বলল—আপনারা তো পুলিশের কাগজকে বেদ উপনিষদ ভাবেন। অকারণে জেল খাটতে কি কষ্ট ভোগ করতে হয় তার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই। বিনা দোষে কয়েকমাস জেল খেটে বেরিয়ে মনে হয় দোষ করেই জেল যাব।

সূর্যপ্রসাদের মনের দুঃখ বুঝি। আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকার জন্য দোষ দিতে পারি না। সত্তর একাত্তর সালের কত ঘটনাই তো দেখেছি। নকশাল সন্দেহ করে যে নিরীহ সরল ছেলেকে পুলিশ ধরল, মামলা দিল মিথ্যা, মুক্তি পেয়ে সেই ছেলে সত্যিকারের নকশাল হ'ল। বহুখুনের নায়ক হ'ল। মিসা হল। আন্দোলন শেষ হ'তেই রাজনৈতিক দল তার চাকরির ব্যবস্থা করে দিল। শত শত খুনীকে জেল থেকে মুক্তি দিল। কারণ আগের শাসকদল নাকি তাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছিল। দূষিত রক্তকে আরো দূষিত করেছিল। সেই দূষিত রক্ত যখন রক্তের জন্য সংগ্রামের নামে কাজ করতে লাগল সবাই তখন চিৎকার করে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ

বলা শুরু করল। কিন্তু কি আশ্চর্য এই উগ্রপন্থীর জন্ম দিয়েছে স্বাধীনোত্তর রাজনীতি, বিভাগ বণ্টন ও বাটোয়ারা, নেতৃত্বের বিলাসী জীবন। নিরাপত্তার ঘেরা টোপে নিজেরা নিরাপদ থেকেছে। আর প্রাণ হারিয়েছে নিরাপত্তাহীন সাধারণ মানুষ। সত্তরের দশক যেমন তা প্রমাণ করেছে, চল্লিশের দশকে তেমনি তার অঙ্কুরকে চেনা গেছে। কেন মানুষ উগ্রপন্থী হ'ল, কেন মানুষের শত্রু হ'ল মানুষ সেদিকে দৃষ্টি কতখানি দিয়েছি আমরা? বিগত বছরের আইন পেশার অভিজ্ঞতা যেমন হয়েছে সাধারণ অপরাধী সম্বন্ধে তেমনি রাজনৈতিক চরিত্র যে অপরাধীর জন্ম দিয়েছে তাদের সম্বন্ধেওও। কিন্তু অসহায় বাকহীন হওয়া যেন নিয়তি।

বদ্রীনারায়ণ একটা খুব ভাল কথা বলেছিল। বিহারের ঝাড়খণ্ড দলের এক খুদে নেতা। গরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত গ্রামে গঞ্জে। সে বলেছিল শুধু আমাদের মধ্যে ছেলে যে কজন ডাকাত আছে শুধু তাদেরকেই কেন ডাকাত বলা হয়? জেলের বাইরে কি কোন ডাকাত নেই? নাকি ডাকাত চেনার চোখ কারো নেই? আমি বলেছিলাম—তোমার শেষের প্রশ্নই ঠিক। উত্তরও আছে সেই প্রশ্নেই। সত্যি কথা—ডাকাত চেনার চোখ যে ছিল তা অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর বদ্রীনারায়ণ তার নিজের কথা বলেছিল। সুস্থ রাজনীতি, করার স্বপ্ন নিয়ে যে দলে এসেছিল। তার আদর্শ ছিল মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মুখিয়া নামে এলাকায় সে রাজত্ব করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় জোতদার। সেং রকম এক মুখিয়া পরশুরাম চৌবে। তার নিজস্ব এক ডাকাতদল ছিল। থানার যে সব পুলিশ ছিল তারা সে ডাকাত দলকে ধরত না। কোন জায়গায় ডাকাতি হলে মুখিয়া তার শত্রু বলে যাকে মনে করে পুলিশ তাকেই চালান দেয়। মুখিয়া পুলিশকে সন্তুষ্ট করে তার জন্য। বদ্রীনারায়ণ মুখিয়ার বিষনজরে পড়ে সেইদিন যেদিন থানার দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানল ডেপুটি কমিশনারের কাছে আর মুখিয়ার বেনামী একশ বিঘে জমির নাম রেকর্ড করার চেষ্টা করে আসল চাষীদের নামে। তার এক সপ্তাহের মধ্যে বদ্রীনারায়ণকে পাঁচটা ডাকাতি মোকর্দমায় চালান দেয় দারোগা। বাংলার মহম্মদবাজার থানার ডাকাতি। বিহার বাংলার সীমান্তবর্তী থানার দারোগাদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক থাকে। কোন অসুবিধা হয় না। কারণ বিহারের থানায়ও বাংলার মানুষকে চালান দেওয়া হয়। সেইভাবেই বদ্রীনারায়ণ ছিল সিউড়ী জেলে। বেশিদিন তাকে থাকতে হয়নি। ঝাড়খণ্ড পার্টির দুমকার নেতারা চাপ সৃষ্টি করে তিন মাসের মধ্যেই তাকে জেল থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিল। সে তারপরও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। বিহারের কোর্ট উকিল মুহুরি সম্বন্ধে তার জানার আগ্রহ হয়েছিল জেলে থাকতে থাকতে। একদিন বদ্রীনারায়ণ মোটর সাইকেলে এল এক বন্ধুকে নিয়ে। ছুটির দিন ছিল। আমার হাতে সময়ও ছিল। বললে "জানেন উকিলবাবু, কোর্ট সম্বন্ধে এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাক্ষী ভেঙে মামলায় খালাস হওয়া যায়। বই-এ লেখা আছে সাক্ষী ভাঙা অপরাধ। জামিন নাকি নাকচ হয়। কিন্তু সাক্ষী যদি নিজে থেকেই ভেঙে যায় তাহলে কি হবে? আমি বললাম নিজে থেকে সাক্ষী ভেঙে গেলেও অপরাধ হবে যদি প্রমাণ হয় সে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে শপথ নিয়েও।

আমার কথায় বদ্রী হাসল। বললে—মিথ্যা কীভাবে প্রমাণ হবে? আগে পুলিশের কাছে বলেছিল তা দিয়ে? আপনি ভালই জানেন সে ভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় না। বদ্রী যথেষ্ট শিক্ষিত জানতাম। কিন্তু এতটা আইন সে শিখেছে জানা ছিল না। বদ্রী শোনাল একটা ঘটনা। বধূ নির্যাতনের মামলা। নির্যাতনে সে আত্মহত্যা করেছে। মা নালিশ করেছে নানা অভিযোগ করে। সাক্ষী আছে মেয়ের বাবা, দাদা। এমন কি শ্বশুরবাড়ির গ্রামের প্রতিবেশীরা। সকলেই পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল। বিশদ বর্ণনা ছিল নানা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের

এবং বিষ খেয়ে আত্মহত্যার। কিন্তু কোর্টে কি হয়েছিল? মা, বাবা, দাদা সকলেই বলেছে কোন অত্যাচার হয়নি। আত্মহত্যা করেনি। খাবারের সঙ্গে দৈবক্রমে চাযের ব্যবহারে পোকামাকড় মারার জন্য ওষুধ খেয়ে ডাইরিয়ার মত হয়। আত্মহত্যা করেনি। প্রতিবেশী সাক্ষীরা দেখল বাবা মা এক বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিময়ে সত্য গোপন করেছিল। সব থেকে আশ্চর্যের কথা, তারাই নিজের থেকে তা চেয়েছিল আসামীদের কাছ থেকে। তারা জানত তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করলেও কোন কারণেই স্বামী ও তার পরিবার দায়ী নয়। মামলা করাটাই ছিল সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রতিবেশীরা যখন জানলো তখন তারাও গ্রামের ক্লাবকে দশ বিঘে জমি দিতে হবে দাবি করল। আসামীরা তাও দিল বাঁচার তাগিদে। আপনি বলবেন—নির্দোষ যখন তারা, বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা ভাল উকিলকে দিয়ে মামলা লড়তে পারত। সেখানেই হবে মস্ত ভুল। উকিল ভাল দিলেই কি তারা নিশ্চিন্ত হতে পারত যে শাস্তি হবে না, আপিল করতে হবে না বা শাস্তি বহাল থাকবে না? তার থেকে ডবল টাকা সাক্ষীকে দিয়ে মুক্তি পাওয়া নিশ্চিত। কোন আপিল নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। আপনারা যারা কোর্টে আছেন তাঁরা কত কম পরিশ্রমে একটা বিচার সাহায্য করে মামলার নিষ্পত্তি করলেন। কয়েক লাইনে রায় হ'ল প্রমাণাভাবে আসামীদের মুক্তি দেওয়া হল।

আমি অবাক হয়ে শুনছি। বদ্রী এত জানে। আমরা জানি পেশায় থাকার কারণে। কোন মামলা পরিচালনা করার জন্য কেউ এসে যখন বলে—"সাক্ষীরা বিরুদ্ধে বললে কত ফি নেবেন আর না বললে কত?" অথবা স্থির নিশ্চিত ভাব নিশ্চয় যখন বলে সাক্ষীরা বিরুদ্ধে বলবে না। তবুও প্রস্তুত থাকা ভাল। সত্যি কথা বলতে কি আজ থেকে বিশ বছর আগেও এমন দেখিনি। জুরি ভাঙানো জানতাম। যার জন্য জুরি প্রথাটাই চলে গেল। কিন্তু সাক্ষী ভাঙানো যদি হয় একটা, সাক্ষী নিজে থেকেই কোন না কোন কারণে ভেঙে যাওয়া তাহলে দশটা। বদ্রী একটা ঘটনার কথা বলল। কিন্তু আমরা জানি বহু ঘটনা যেখানে স্ত্রী স্বামীর হত্যাকারীকে বিয়ে করে বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়নি, অথবা রাজনীতির অদল বদলে বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সুবিধা নেবার আশায়। বদ্রী আর কতটুকু জানে।

প্রদীপ্তর কথা বলব পরে বলেছি। আবার তার কথায় ফিরে আসছি। প্রদীপ্ত খুব বেশি দিন ছিল না জেলে। কিন্তু তার মধ্যে সে জেনেছে অনেক কিছু, সিদ্ধান্তও নিয়েছে নিজের মত করে। জেলে থাকতে সে প্রেমে পড়েছিল অতসীর। অতসী ছিল যতীন দাসের যুবতী স্ত্রী। জেলে এত সুন্দরী সে দেখেনি। জেলে যাবার আগেও চোখে পড়েনি। অতসী ভোরবেলা বেড়িয়ে যেতে চাল পাচারে। সাঁইথিয়া—কাজোরা গ্রাম রেলপথ ছিল তার কর্মক্ষেত্র। কাজোরা থেকে আনত চোরাই কয়লা। রেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল। আর. পি. এফ পুলিশের সঙ্গেও পয়সার একটা সম্পর্ক ছিল। রাত হয়ে যেত ফিরতে। কোনদিন ন'টা, কোনদিন দশটা। স্বামী যতীনকে পেত না তখন। যতীনের কাজ রাতে। ওয়াগন থেকে নানা মাল চুরি। সব কাজ ফেলে যখন বস্তিতে আসত তখন অতসী থাকত না। ভোরের ট্রেনেই সে বেরিয়ে গেছে। মাত্র বছর দুই বিয়ে। তার মধ্যে বিয়ের পর পর মাস দুয়েক স্বামীসঙ্গ পেয়েছে অতসী। তাও সপ্তাহে দুদিন কি একদিন। সে ভাবত মাঝে মাঝে চাল কয়লা পাচার সে আর করবে না। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি। যতীন তো দিনেও নিজের ঘরে থাকবে না পুলিশের ভয়ে। ঘুমোবে অন্য কারো বাড়িতে। অতসীর নারীমন ক্ষুধার্ত থাকত পুরুষ সঙ্গের। জেলেই আলাপ প্রদীপ্তর সঙ্গে। প্রায় এক সঙ্গেই ছাড়া পেয়েছিল জেল থেকে। মেলামেশা বেড়েছিল। ভালবাসা আর সহবাসে তার শেষ। এর মধ্যে যতীন পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যায় ওয়াগন থেকে লুঠ করার

সময়। প্রদীপ্ত জেল থেকে বেরোবার এক মাসের মধ্যেই বাবা ও মা মারা যায় দশ-বার দিনের ব্যবধানে। দাদা শোকে পাথর বৌদির শূন্যতায়। অতসীর সান্নিধ্য তার কাছে ক্ষতে মলমের মতো। প্রদীপ্তর জীবনের পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার মন এক প্রতিহিংসার আগুন এনে দিয়েছিল। অতসী প্রদীপ্তকে পেয়ে ঘর সংসার করেছে। চাল কয়লার পাচার ছেড়ে দিয়েছে। প্রদীপ্ত কিন্তু অপরাধীদের নামের লিস্টে একটা স্থান করে নিল। তার এই জীবনটা আমার জানা ছিল না। সত্যি বলতে কি প্রদীপ্তকেই মনে ছিল না। জানলাম প্রদীপ্ত যখন ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। স্বীকারোক্তি করল। বিশ্বাসই হয় না আটটা খুন ও গোটা পনেরো লুটের সে নায়ক। কখনও নেপথ্যে, কখনো প্রকাশ্যে। তার নির্দেশ ও সুষ্ঠু গোপন পরিচালনায় খুন হয়েছে জেলখানায় খাবার ইত্যাদি সরবরাহের ঠিকাদার জনার্দন ঠাকুর যে ঘুষ দিত জেল বাবুদের, ঘুষখোর দারোগা নন্দগোপাল এবং পি. ডাবলু. ডির ইঞ্জিনিয়ার প্রাণকৃষ্ণ রক্ষিত। আরো কয়েকজন। পুলিশ কিন্তু কোনদিন তাকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু ধরা পড়ল অতসীকে খুন করে। অতসীর সঙ্গে একসঙ্গে বাস করার কারণে প্রথম সন্দেহ তাকে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর খুনের কথা স্বীকার করতে তার কোন বাধাও ছিল না। অতসীকে সত্যিই সে ভালবেসেছিল। কিন্তু অতসী তার রূপের ডালি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না এক প্রদীপ্তরবাহু সঙ্গিনী থাকায়। দুবছর যেতে না যেতেই অতসীর নজর পড়েছে অবতার সিং-এর দিকে। স্বাস্থ্যেও সৌন্দর্যে সে প্রদীপ্তর থেকে অনেক ওপরে। প্রদীপ্ত সহ্য করে গেছে বহুদিন। কিন্তু একদিন দুজনকে এক বিছানায় দেখতে পেয়ে স্থির থাকতে পারেনি। অবতার পালিয়ে বেঁচেছিল কিন্তু অতসী পারেনি। সারা শরীর ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। বিছানায় শোয়া মৃত অতসীকে দেখা গিয়েছিল। সারাদিন বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ছিল। তারপর সন্ধেবেলায় নিজেই থানায় হাজির হয়েছে। স্বীকারোক্তি করে কোর্টে। বিচারের সময় কোন উকিল দেয়নি। অনভিজ্ঞ সরকারের দেওয়া উকিল তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি।

জামিলা-আলম এই বিচিত্র চরিত্রের মেলবন্ধন। পাহাড় ঘেরা এক ছোট গ্রাম। একটা ছোট নদী বের হয়েছে পাহাড় থেকে। নদীর পাড়ে কয়েকটা সাঁওতাল বস্তি। ওপারে শাল শিমুলের ঘনজঙ্গল। সাঁওতাল বস্তি মাঝি ডাঙা সংলগ্ন অনেকটা ধানের জমি। সেই জমির ধারে যে গ্রাম সেখানে বাস করে মুসলমান পরিবারেরা। প্রায় সব পরিবার গরিব। দু'চারজন কিছু জমি ও ছোট পুকুরের মালিক। শহরের দু'চারজন মানুষের কিছু জমি আছে। গরিব যে সব মুসলমান আছে তারা ঐসব জমি চাষ করে কোন রকমে দিন কাটায়। তাদের কোন স্বপ্ন নেই, কামনা বাসনা যা কিছু পরিবারের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের মুখে দু'মুঠো অন্ন জোগান। এই রকম গরিব একজন নুরুদ্দিন। অতি কষ্টে তার সংসার চলে। তিনটি মেয়ে। বড়টির নাম জামিলা। অতি সুন্দরী সে। পাঁকে ফোটা পদ্মফুল যেন। নুরুদ্দিনের ঘরে এত, সুন্দরী মেয়ে কি করে যে জন্মাল তা আশ্চর্যের। ষোল বছরে পড়তেই যেন মনে হোত পূর্ণ যুবতী। তাকে নিয়ে সমস্যা বাড়তে লাগল নুরুদ্দিনের। বিয়ে এই সময় দিতে না পারলে কি অঘটন ঘটবে ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল গাঁয়ের আলম। আলমের বাবার জমি চাষ করে আসছে বহু বছর ধরে। আলমের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। এর মধ্যে দুবার তার বিয়ে হয়ে গেছে। একজন বৌ মারা গেছে বিয়ের একবছর পর। দ্বিতীয় বৌকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে আলম তার চরিত্রের জন্য। এরপর দু'বছর আলম কাউকে বিয়ে করেনি। তার বাবা মারা গেছে কয়েকমাস আগে। বাবা বেঁচে থাকলে আলম জামিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারত না। পনেরো-ষোল বিঘে জমির জোতদার তার ছেলের বিয়ে হোক তারই জমি চাষ করা নুরুদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে এটা

তার অহংকারে লাগত। আলমের সে অহংকার নেই। আলমের প্রস্তাবে নুরুদ্দিন হাতে চাঁদ পেল। আলমের গায়ের রং কাল, স্বাস্থ্য ভাল হলেও মুখের কোন শ্রী নেই। নুরুদ্দিন ভাবল সোনার আংটি আবার ব্যাঁকা হলে কি আসে-যায়। তাছাড়া আলম সাত কুড়ি টাকা নগদ আর দুবিঘে জমি দেবে নুরুদ্দিনকে। জামিলাকে সোনার গয়না দেবে গা-ভরে। সেইমত বিয়ে হয়ে গেল একদিন। বিয়ের পর জামিলা স্বামীর সঙ্গে ঘর করে ঠিকই। কিন্তু আলমের সব সময় মনে হয় তার মত কুৎসিত স্বামীকে কি অতি সুন্দরী স্ত্রী মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে? জামিলার ব্যবহারে কিছু প্রকাশ পায় না। কিন্তু আলম তার মনের নাগাল পায় না। তবু বিনা অশান্তিতে কাটল পাঁচ বছর। বরং সুখেই বলা যায়।

জেল ভিজিট করতে গিয়ে দেখা হয়েছিল আলম সেখের সঙ্গে। যাবজ্জীবন জেল শাস্তি পাওয়া কয়েদী। অন্য জেল থেকে এই জেলে এসেছে। তার আগে একমাস ছিল মামলার রায় হবার পর। মামলা চলেছে আট-দশ বছর। সেই সময় এক মুহুরি জামিনদার তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। জমিজমা যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেছে উকিল মুহুরির সেবায়। অর্থের যখন প্রয়োজন সব থেকে বেশি তখনই সে ভিখারী। সরকারী খরচে জজসাহেব এক অনভিজ্ঞ উকিল দিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। সাক্ষী মিথ্যা বলেছে শপথ নিয়ে। জজসাহেব কোন প্রশ্ন করে সত্য মিথ্যা যাচাই করেননি। উকিল তো জানে না বলে করেনি। আলম বলেছিল—"একটা মিথ্যে মামলায় আমার সাজা হয়ে গেল। জামিলা জানে, আমার আত্মীয় দু'চারজন জানে আমি নির্দোষ। তারা যদি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় জজসাহেব নাকি বিশ্বাস করবেন না। উকিল বলেছিল। কিন্তু জজসাহেব যাদের বিশ্বাস করে সাজা দিলেন তারা পরস্পর আত্মীয়। উচ্চ আদালতের নাকি সেই রকমই নির্দেশ। উকিল বলেছিল এই হাকিম নাকি শুধু সাজা দেবার হাকিম। সাক্ষীকে যতই জেরা করি, হাকিম তা পড়বেও না। পড়লে নাকি যুক্তি দেখানোর একটা ঝামেলা। আমি অবাক হই। হাকিম পড়বে না ধরে নিয়ে উকিল জেরা করবে না। এমন উকিল না দিলেই ভাল হত। ভালমন্দ জেরা যা করার আমি করতাম। অপদার্থ উকিল দেওয়াটা আরো শাস্তি।"

আলমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কি ঘটনায় তোমার যাবজ্জীবন হ'ল? আলম বলেছিল—এক দিন ভোরবেলায় আমার বাড়ির কাছেই একটা ফাঁকা জায়গায় আমার তালাক দেওয়া দ্বিতীয় স্ত্রীর গলাকাটা মৃতদেহ দেখতে পায় গাঁয়ের লোক। পাশের গাঁয়ের আসাদুল্লা যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় স্ত্রী রেহানা, থানায় মামলা করেছিল। রেহানা নাকি তার বোন। বিয়ের পর থেকে বোনের ওপর আমি নাকি অত্যাচার করতাম। রেহানা থাকতেই আমি জামিলাকে বিয়ে করি। রেহানাকে বিয়েতে বহু সোনার গয়না দেওয়া হয়েছিল। সে সব আমি আত্মসাৎ করে রেহানাকে খুন করেছি এবং তার মৃতদেহ বাড়ির বাইরে মাঠে ফেলে দিয়েছি। তার এই মিথ্যা নালিশ কে সত্যি বোঝাতে তারই কয়েকজন আত্মীয় সাক্ষী হাজির করেছিল। আমার যারা প্রতিবেশী তাদের কাউকে পুলিশ সাক্ষী করেনি। গাঁয়ের মজলিসে মুখে তালাক দিয়েছিলাম রেহানার উপস্থিতিতে। তালাকের কোন কাগজ ছিল না। চারদিক থেকে মিথ্যার বন্যা বইতে লাগল, সত্যকে শ্বাসরোধ করা হল। আমার সাজা হ'ল। জামিলা কিন্তু বিশ্বাস করত নির্দোষের শাস্তি হয় না কোন বিচারে। তার বিশ্বাস দেখে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। যে রেহানা আসাদুল্লার সঙ্গে পালিয়ে যাবার সময় আমার দেওয়া বহু সোনার গয়না নিয়ে গিয়েছিল সে খুন হ'ল আসাদুল্লার হাতে, দোষী হলাম আমি। জামিলার ওপর কুনজর ছিল আসাদুল্লার আমার বিয়ের আগে থেকেই। আমাকে গ্রেপ্তার করল যখন পুলিশ আসাদুল্লা

জামিলার কাছে এসে সাহায্য করার অভিনয় করেছে। জামিলা প্রত্যাখ্যান করেছে। জামিলা তার গায়ের গয়না একে একে বিক্রি করে মুহুরি জামিনদারকে দিয়েছে সাত-আট বছর ধরে। তারপর যখন বিচার শুরু হবে তখন তার কোন গয়না নেই, আমার কোন জমি নেই। দিনের পর দিন জামিলা কোর্টে এসেছে, চোখের জল ফেলেছে। রায়ের দিনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মূর্ছা গেছে। তারই মধ্যে আমাকে জেলে নিয়ে গেছে পুলিশ। দূর থেকে আসাদুল্লা হেসেছে। দুদিন পর জামিলা এসেছে জেলখানায় দেখা করতে। এই দুদিন আমি শুধু ভেবেছি জামিলার কি হবে সারা জীবন। আসাদুল্লার মতো জন্তুজানোয়ার তো তাকে ছিঁড়ে খাবে। তার সারাজীবনে একাকীত্বের যন্ত্রণা সে কি করে সহ্য করবে। ঠিক করলাম জামিলাকে বলব তুমি আবার বিয়ে কর। আমি তালাক দিয়ে দেব যাতে বিয়েতে কোন অসুবিধা না হয়। জামিলা যেদিন প্রথম এল শত চেষ্টা করেও বলতে পারলাম না। দু তিন বার আসার পর একদিন বলেই ফেললাম। আমার কথা শুনে জামিলা কাঁদতে লাগল। শেষে বলল—আমায় তালাক দিবান না। আমি আপনার জায়গায় আর কারে ঠাঁয় দিতে পারব না। একথা বলেই চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে। কয়েকদিন পরই সেই জেল থেকে আমাকে নিয়ে এল এখানে।

আলমের সঙ্গে আমার যেদিন দেখা হল ওর শরীরটা ভেঙে গেছে। রোগা গাল বসে গেছে, চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা। জেলার সাহেব বললেন—ও ভাল করে খায় না, উদাস হয়ে বসে থাকে। রাতে হয়ত ঘুমায়ও না। ডাক্তার চিকিৎসা করছে। কিন্তু রোগের কোন উপশম হচ্ছে না। হয়ত ওকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

সেদিন আলমের সঙ্গে বেশি কথা হয়নি। ওর কাছে গিয়ে বলেছিলাম—এভাবে আত্মহত্যার কি মানে হয়? জামিলা তার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। আল্লা ওর একটা ব্যবস্থা করে দেবেন ঠিক। আলম কোন জবাব দিল না। আমার কথা শুনল কি শুনল না বুঝতে পারলাম না। সেদিনের মত বিদায় নিলাম। মনে কষ্ট হ'ল। আমাদের দেশে সরকারী ব্যবস্থাপনায় রাজ্যপাল, মন্ত্রী, আমলা ও অন্যান্য অফিসারদের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু আসামীকে সুবিচার দেবার বাহ্যিক প্রচার ছাড়া তার উকিলের জন্য বরাদ্দ পঞ্চাশ না হয় একশ টাকা। যে টাকায় একজন ভাল রাজমিস্ত্রি পাওয়া যায় না। যোগ্যতার বিচারে অর্থব্যয় এদেশে কবে আসবে কে জানে। একদিন খবর পেলাম আলমকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গেলাম তাকে দেখতে। খুব আস্তে কথা বলছিল। আমার হাতদুটো ধরে বলল—আল্লার কাছে শুধু প্রার্থনা করছি—সকলকেই যেন ক্ষমা করেন। ওর সঙ্গে দেখা করে বাইরে এলাম। আমার পেছন পেছন একজন এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বলল—আলম আমার গাঁয়ের লোক। ওর অসুখ জেনে এসেছিলাম। গাঁ সম্পর্কে আমার দাদা। আলম ভাই আসলে আত্মহত্যা করল। আমি জানতে চাইলাম কেন? ও বলল—আলম ভাই খবর পেয়েছিল কি ভাবে জানি না, জামিলা ভাবি আত্মহত্যা করেছে। আমরা চেষ্টা করেছি আলম ভাই যাতে জানতে না পারে। কিন্তু খবর দেবার মত শত্রুর তো অভাব নেই। খবর ঠিক পেয়েছে। এখানে এসে প্রথম জেলখানায় দেখা করেছিলাম মাস দেড়েক আগে। অন্য কয়েদীর কাছে জেনেছিলাম তিন মাস কিছু খেত না, রাতে ঘুমোত না। কি চেহারা দেখেছিলাম আগে, আর এই কমাসে শরীরটা অর্ধেক করে দিয়েছে।'

আমি না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না—জামিলা কেন আত্মহত্যা করল?

উত্তরে সে বলল—জামিলা ভাবির ভরা যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। আলম ভাইকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। অন্য কোন পুরুষ তার দেহ স্পর্শ করবে তা সে হতে দেবে

না। বাপ নুরুদ্দিন মারা গেছে। ওর কোন আশ্রয় ছিল না। কারো আশ্রয়ে যাওয়া মানে নিজের বিপদে ডেকে আনা। একদিন গাঁয়ের লোক দেখল পুকুরে জামিলা ভাবির মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। কখন যে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল কেউ তা জানে না।

অর্থহীন না অর্থপূর্ণ এ আত্মাহুতি বুঝে উঠতে পারিনি। উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়নি এই মনস্তত্ত্বের। বিচারের প্রতি অভিমান, অসহায় স্ত্রীর প্রতি মমত্ব, একাকীত্বের যন্ত্রণা, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে দুজনের জীবনে। বেশ কিছুদিন জেল ভিজিট করতে যাইনি। আশঙ্কা মনে আবার কোন সুবিচার না পাওয়া কয়েদিকে দেখব, শুনতে হবে কারো মনোবেদনার কথা, চোখের সামনে ফেলবে কেউ দীর্ঘশ্বাস। বাড়িয়ে দেবে আমার যন্ত্রণা এই বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে।

কিন্তু যেতে হ'ল আর একবার। জেলখানায় কয়েদীদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান। জেলার সাহেবের বিশেষ নিমন্ত্রণ। বেশ লাগছিল নানা পোগ্রাম। আবৃত্তি, গান এই সব। এমন সময় আমাকে দেখতে পেয়ে একজন আমার কাছে এল চিনতে একটু কষ্ট হল। তবুও একটু সময় নিয়ে চিলনাম। সজল গুপ্ত। সিউড়ী মেডিক্যাল স্টোরের ম্যানেজার ছিলেন। কাগজে পড়েছিলাম সজল গুপ্তের বিরুদ্ধে ঔষধপত্র তছরুপের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল বছর দশেক আগে। প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার ওষুধ বাইরে বাজারে বিক্রি করে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে এটাই ছিল অভিযোগ। সজল গুপ্ত অবসর নেবার এক বছর আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিল। অসুস্থা ও রুগ্‌ণা স্ত্রী আর বয়স্কা দুই অবিবাহিতা মেয়ে নিয়ে ছিল তার সংসার। এটা আমাদের জানা। কিন্তু এই মামলার পেছনে যে রহস্য সেটা অজ্ঞাত ছিল। সজল গুপ্ত বলল—"সামান্য স্টোরকিপার থেকে সততা ও পরিশ্রম দিয়ে ম্যানেজার হয়েছিলাম। বিশ্বাস করতাম সকলকে। তারই পরিণাম এই। সদর থেকে কলকাতায় ওষুধের ইনডেন্ট পাঠাতে হয় জেলার সব হাসপাতাল ও হেল্‌থ সেন্টারের চাহিদা মত। কাগজে-কলমে বহু টাকার ওষুধ ও সরঞ্জাম এল। কিন্তু তার প্রায় সব বিক্রি হয়ে গেল কলকাতায়। এখানে কাগজে-কলমে সবটা পাওয়া দেখাল ক্লার্ক। কিছু কিছু হেল্‌থ সেন্টার ওষুধ সরঞ্জাম পেয়েছে দেখালো কাগজে-কলমে, কিছু না পেয়েও। ম্যানেজার হিসেবে বিশ্বাস করে সই করে দিতেই হয়। এত এত স্টক মিলিয়ে দেখে সই করা সম্ভব নয়। একটা চক্র কাজ করে জেলা ও কলকাতায় সেটা যখন জানলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জেলে থাকলাম তিনমাস। তারও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! মুহুরি দেখা করে কোর্ট লক আপে। ভাবে এতটাকা আত্মসাৎ করেছি যখন বেশ কয়েক হাজার টাকা প্রাপ্তি হবে। কপর্দক শূন্য আসামীকে কৃপণ ভেবে নিরাশ হয়। আসে সরকারী কর্মচারী সংগঠনের নেতা। প্রস্তাব দেয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে মামলা থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করে দেবে। সরকারী যৎসামান্য দাক্ষিণ্যে এক উকিল জোটে কপালে। সবাই ধরে নেয় আমি বহু টাকার মালিক। একবার খবরও নেয় না কত দুঃখ, কষ্ট ও অভাব নিয়ে রুগ্‌ণা স্ত্রী, বয়স্কা দুই মেয়ে দিন কাটায়। অন্ন জোটে কিনা সন্দেহ। তিনমাস মধ্যে চার্জ শিট না দেওয়ায় জামিনে মুক্তির আদেশ হ'ল। বড় হাকিম, হাতও বড়। দশ হাজার টাকার জামিন দিতে হবে। হাকিম খবর রাখেন কি না সন্দেহ মুহুরি জামিনদারকে তারজন্য কত দিতে হয়, পুলিশ কোর্টে জামিন নামা ফিট করতে কত খরচ হয়। তারপর মাসে একটা করে দিন কোর্টে হাজির থাকতে হয় বেলা দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। প্রতিদিন উকিল, মুহুরি জামিনদারের একটা খরচ আছে। তার থেকে জেলে থাকা অনেক ভাল। খাওয়া থাকার তো কোন খরচ লাগে না। সজল গুপ্ত থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম কতদিন আছেন জেলে?

সজল গুপ্ত বলল—কোন হিসাব রাখি না। বেশ আছি। এখান থেকে কোর্টে যাই আর ফিরে আসি। হাকিমের নাকি বিচার করার ক্ষমতা আসেনি হাইকোর্ট থেকে। হাকিম ঠিক বদলীর মুখে তখন ক্ষমতা আসে। কাজেই বিচার হয় না। আবার দিন পড়ে। আমার মামলার নাম স্পেশাল কোর্ট কেস। তাই সবই স্পেশাল। ভাবলে অবাক হবেন সিউড়ী থেকে যখন ঐ জেলায় গেলাম বদলী হয়ে দেখলাম রামময় বাবু ম্যানেজার অবসর নিলেন। আমি তাঁর জায়গায় যোগ দিলাম। রামময়বাবু স্টোর ম্যানেজার হয়েছিলেন, জেলা স্টোরের সর্বময় কর্তা। প্রায় দশ বছরে উনি নিজের কত সম্পত্তি করেছেন শুনে আমি স্তম্ভিত। কলকাতায় দামী ফ্ল্যাট, গাড়ি, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট বড় অঙ্কের। সবাই সব জানে। তিনি তো একা খেতেন না। তাঁর দুই সহকর্মীও বহু টাকা সঞ্চয় করেছে। খাতা-কলমে জমা ও খরচ ঠিকঠাক যদি সব জায়গা থাকে তাহলে ওষুধ সরঞ্জাম সবটা কলকাতা থেকে না এলেও চলে। আমি প্রথম যোগ দিয়ে সেই দুই সহকর্মীর উপদেশ নিতে পারিনি। সৎ হয়ে বহু বছর থেকে যে কু অভ্যাস অর্জন করেছি তা ত্যাগ করতে পারিনি। চাকরিতে যোগ দিয়ে ওষুধ সরঞ্জাম বুঝে নিয়েছিলাম। তার দুমাস পর নতুন ইনডেন্ট অনুযায়ী, মাল এল বড় বড় কাঠের বাক্সে। বাক্সগুলো খুলে ওষুধ বের করে যখন র‍্যাকে রাখে তখন উপস্থিত থাকিনি। সি. এম. এইচ সাহেব তলব করেছেন। জরুরী জানিয়েছেন। ছুটে গেছি। নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত দেখিয়ে আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে মুক্তি দিলেন। খাতাপত্র সব তৈরি ছিল। আমিও তখন খুব ক্লান্ত। যেখানে যা সই সাবুদ করার করে দিলাম। তারপর প্রায় একবছর কেটেছে। মাল এসেছে হেল্থ সেন্টারে গেছে ইনডেন্ট অনুযায়ী। সবাই দেখায় আমাকে সম্মান করে সৎ বলে। নানা প্রশস্তি করে। কাউকে কোন সন্দেহ করতে পারি না। হঠাৎ একদিন এনফোর্সমেন্ট পুলিশ এল। খাতার সঙ্গে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করবে। তিন দিন ধরে চলল তাদের কাজ। নানা কাগজ তৈরি হল। আমাকে আর দুই সহকর্মীকে আসামী করা হলেও আমি গ্রেপ্তার হলাম। ওরা হাইকোর্টে আগাম জামিন পেল। ওদের টাকা ছিল। ওরা সুখেই আছে। চাকরিতে না থেকেও। এতকাল যা করে নিয়েছে তিন পুরুষ চলে যাবে।

সজল গুপ্তের কথা শুনছিলাম। একটা কথাও মিথ্যা নয় এ বিশ্বাস আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। কারণ আমিও দেখেছি একজন মেডিক্যাল স্টোর কিপারকে অতি অল্প সময়ে পাঁচ ছটা বাড়ির মালিক হতে। অসৎপথে উপার্জনের টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে। সবাই দেখে, সবাই জানে। কিন্তু কিছুই হয়নি তার ক্ষতি। গাড়ি করে ঘুরত। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাওয়া-দাওয়া হুল্লোড় করত। দামী সিগারেট খেত। নিজে যেদিন বাজার যেত শাক-শব্জি মাছ মাংসের দর করত না। চটের ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলত দু কেজি দিয়ে দাও। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ধরিয়ে অন্য লোকের দরকষাকষি দেখে উপভোগ করত। শুধু সে স্টোর কিপার নয়। অন্য সরকারী অফিসের দু'চারজন, রাজনীতিকরা খুদে নেতাকে দেখেছি ঠিক তেমনি। সৎভাবে যারা জীবন কাটায় তাদের দিন কি তাহলে শেষ হ'য়ে আসছে। সজল গুপ্ত সৎ মানুষদের দলে।

আমি ওকে আশ্বাস দিয়েছিলাম বিনা পারিশ্রমিকে তার মামলা করে দেব। সেদিনের পর আর জেল—ভিজিট করিনি। আমার ভাগ্যেই কেন দেখা হ'ল সব দুখী মানুষদের। এরপর দুবছর কেটে গেছে। সজল গুপ্তর মামলা আমাকে করতে হয়নি। কারণ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। ওকে মানুষের আদালতে বিচার নিতে হয়নি। সজল গুপ্ত আমার শেষ দেখা কয়েদী। জেল ভিজিটার হিসেবে আমার শেষ মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা।

যে যেখানে

উদয়ন রায়কে মনে করলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আগে কখনও ভাগ্য বলে কিছু আছে বিশ্বাস করতাম না। এখন অবিশ্বাস করতে পারি না। আগে বিশ্বাস করার যুক্তি পেতাম না, এখন অবিশ্বাসের। উদয়নের সঙ্গে এক সঙ্গে ল পড়েছি। এক ঘরে থেকেছি হার্ডিঞ্জ হস্টেলে। আমি বীরভূমের। ও জলপাইগুড়ির। তিন বছর এক সঙ্গে খাওয়া থাকা, শোয়া। অনেক ছেলেই তো ছিল হস্টেলে। কিন্তু আমরা দুজন আলাদা। সবাই বলত জোড়মানিক। কিন্তু দুজনের স্বভাব, জীবনধারা আলাদা। ও শান্তশিষ্ট। কম কথা বলে, তাও খুব আস্তে। রাত জেগে পড়ে। সকালে দেরিতে ওঠে ঘুম থেকে। আমি হৈহুল্লোড় ভালবাসি, কথায় ফুলঝুরি ফোটে। রাত জাগতে পারি না। ভোরে উঠি। সকালে ক্লাস করি, দুপুরেও ইউনিভার্সিটি। বিকেলে উদয়ন ক্লাশ করে ল এর। দুপুরে এম. এর ক্লাশ। কিন্তু সন্ধে থেকে রাত নটা দশটা আমরা দুজন একসঙ্গে। এই ভাবে তিন বছর হস্টেলে কাটিয়ে যে যার জায়গায় চলে যাই। বছর সাতেক দেখা হয়নি দুজনের। কিন্তু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছিল। এর মধ্যে ও মুন্সেফের চাকরি নিয়েছে। চিঠিতে জেনেছি। আমি ওকালতি করছি। চিঠিতে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা জানাই। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। দুজনেরই একটা করে ছেলে ও মেয়ে। তফাত শুধু একটাই। ওর প্রথম মেয়ে আর আমার ছেলে। একদিন উদয়ন মুন্সেফ হ'য়ে এল। বদলি হয়ে। আমার জন্যই হয়ত বদলি নিয়ে এখানে এসেছিল। ও জানত আমি ফৌজদারী প্র্যাকটিশ করি। মুন্সেফের সঙ্গে আমার কোন কাজের সম্পর্ক নেই। আমার কাজ প্রধানত ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও এদের কাছে। ফৌজদারী নীচের আদালত মানেই এস. ডি. ও, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার করা। শুধু মাত্র সেসন বা দায়রা মামলা এবং আপিল ইত্যাদি হয় জজ কোর্টে। তিন বছর ছিল এখানে। মেলামেশা করার কোন অসুবিধা ছিল না। ওর কোর্টে আমার মামলা করতে যাবার কোন কারণ ছিল না। বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। আমার ছেলে ও মেয়ে ওর মেয়ে এবং ছেলের সাথে খেলা করত। তারা প্রায় সমবয়সী। একজনের বয়স পাঁচ অন্যজন তিন। দুজনেরই ছোট সংসার। ওর বেতন কম, আমার আয় তার থেকে কিছু বেশি। তাতে কারো সংসার চালাতে কোন অসুবিধা ছিল না। দুজনেই তখন সুখী ছিলাম সব দিক দিয়ে। কিন্তু পরিশ্রম করতে হত খুব দুজনকে। সে কালে নিজের হাতে সব লিখতে হত মুন্সেফ ও সাবজজকে। কোন স্টেনোগ্রাফার পেত না। ওটা শুধু জেলা জজ পেতেন। উদয়ন চিরকালই পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকত। ওর স্ত্রী লোপামুদ্রা সংসার দেখা, মেয়ে ও ছেলেকে লেখাপড়ায় বসান এসব করত। উদয়ন শুধু সন্ধ্যাবেলা একঘণ্টা মেয়ে ও ছেলেকে পড়তে বসাতো। নিজে পড়াত। বিকেলে প্রায় প্রতিদিন আমাদের দেখা হ'ত। আমি ফৌজদারী মামলার বিশেষত্ব বোঝাতাম আর ও দেওয়ানি জমিজমা সংক্রান্ত মামলা নিয়ে আলোচনা করত। সেই সময়টা আমাদের ছেলেমেয়েদেরও খেলার সময়।

তিন বছর পর উদয়ন বদলি হয়ে চলে গেল। যখন যেখানেই বদলি হয়েছে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। কখনও সপরিবারে ও এসেছে। কখনও আমরা গেছি। ছুটিতে কয়েকদিন থেকেছিও। এর মধ্যে মেয়ে সুতপা পড়াশোনা করেছে বি. এ পর্যন্ত। তারপর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে আমেরিকায়। ছেলে সুস্নাত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরি পেয়েছে। বিয়ে হয়েছে। বৌকে নিয়ে বাঙ্গালোরে চলে গেছে। উদায়ন ও লোপামুদ্রা চাকরিস্থলেই থেকেছে।

বড় জোর পুজোর ছুটিতে বাঙ্গালোর যাওয়া কয়েকদিন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুখী। আমার ছেলে উকিল হয়ে আমার সঙ্গে থাকে না কোর্টে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে জেলার মধ্যেই। যখন ইচ্ছা দেখে আসতে বাধা নেই। আমি যেমন সুতপা ও সুস্নাতর বিয়েতে গেছি। উদয়নও আমার মেয়ে কথাকলি ও ছেলে দেবব্রতর বিয়েতে এসেছে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে মুন্সেফ বা সাবজজ এবং উকিলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও যে এমন আত্মীয়তা থাকতে পারে ভাবা কঠিন। একের অপরের ওপর যেমন শ্রদ্ধা ছিল তেমনি দুজনের মধ্যে ছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। উকিল হিসেবে আমায় ও শ্রদ্ধা করত। সুবিচারক বলে আমিও তাকেও শ্রদ্ধা করতাম। তবুও ভাগ্যের জন্য ঈর্ষা যে কখন আমার মনে জন্ম নিয়েছে তা বুঝলাম একদিন। অবশ্য আমি যাকে ভাগ্য মনে করছি তা অনেকে মানবে না। তারা বলবে নিজের নিজের কর্মের ফল আমরা পেয়েছি। কারণ উদয়ন নিজে নজর দিতে পেরেছে ছেলেমেয়ের পড়াশোনায়। আমি যখন মামলার কাগজ পড়ছি বা মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছি ও তখন ছেলে মেয়ে পড়াচ্ছে। আমি ভেবেছি উকিলের ছেলে উকিল হবে, ও ভেবেছে মুন্সেফের ছেলেকে মুন্সেফ হতে হবে তার মানে নেই। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যা হতে চায় তাই হবে। অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেলেকে মুন্সেফ করতে চায়নি কোন কারণে। আমি এখন ভাবি ছেলেকে উকিল না করলেই ভাল হ'ত। ও নিশ্চয় ভাবে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করা ভাল হয়েছে।

একদিন উদয়নের চিঠি পেলাম। লিখেছে কলকাতা থেকে। জনিয়েছে তারা স্বামী-স্ত্রী চলে যাবে ছেলের কাছে আমেরিকায়। সুস্নাত একটা ভাল অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে। বাঙ্গালোরের থেকে বহুগুণ ভাল। সে আগেই গেছে। এখন স্ত্রী-বাবা-মাকে ওখানে রাখবার একটা ভাল ব্যবস্থা করেছে। যেদিন চিঠি পেলাম তার সাত দিন পর ওদের ফ্লাইট। বার বার করে যেতে বলেছে তার তিন-চার দিন আগে যাতে ওদের সঙ্গে থাকতে পারি। কবে আবার দেখা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। চিঠি পাবার পর দিনই গিয়েছিলাম। ছিলামও তিন দিন। উদয়ন ও লোপামুদ্রা দুজনেই পরম সুখী। এমন দিনটা যেন তারা স্বপ্নে দেখত। আমি প্রশ্ন করেছিলাম—তোমার তো আরো কয়েক বছর চাকরি আছে। সেটা ছেড়ে কেন যাচ্ছ? উদয়ন বলল—আর কাজ করতে ভাল লাগছে না। গত দশ বছর আগে পর্যন্ত কাজে যে আত্মতৃপ্তি আসতো এখন আর আসে না। আমরা শিক্ষা পেয়েছিলাম পরিশ্রম করতে হবে, যে কোন মামলার গভীরে ঢুকতে হবে। মানুষ যা শপথ নিয়ে বলে তা কতখানি সত্য তা দেখতে হবে নিজস্ব স্বাধীন ভাবনা নিয়ে। আইন পড়া একটা দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে। ছাত্র হয়ে থাকতে হবে। জ্ঞান পিপাসা বিসর্জন দেওয়া যাবে না সবজান্তা ভাব নিয়ে। যে কোন রায় দেবার আগে বহুবার ভাবতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বিচারে যেন কোন ভুল না হয় তা নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। এসব করতে উকিল আন্তরিকভাবে সাহায্য করত। কিছু মনে কোর না, তোমাদের পেশায় যে অবক্ষয় এসেছে পেশার মান নেমেছে সেখানে আমা'দর কাছে তৃপ্তি আসবে কী করে? অবশ্য আমাদের মধ্যেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেটা অস্বীকার করি না। আমি বললাম—যাকগে ওসব তর্ক। তবে তোমাদের সারাজীবনের কর্মফল হিসেবে যা পেলে তাতে ঈর্ষা হচ্ছে। আমি ভাবতাম উকিল স্বাধীন, তোমরা যারা চাকরি কর তারা পরাধীন। কিন্তু আমার চিন্তা ভুল প্রমাণ হ'ল। তুমি চলে যেতে পারছ আমেরিকা। নতুন জীবন হবে, আনন্দ সুখের নতুন উৎস হবে। আর আমার অবস্থা। যতদিন শরীরে প্রাণ ও কর্মক্ষমতা থাকবে আমার কোন অবসর নেই। অবক্ষয়ের যুগে অনেকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব না।

তবুও জীবিকার তাড়নায় এবং অন্যের আমার ওপর নির্ভরতায় আমি বাধ্য কাজ করতে।

উদয়ন বলল—সবারই তো হয় না। তোমাদের যা উপার্জন তা দিয়ে পুজোর ছুটিতে কেউ কেউ তো লন্ডন প্যারিস যান। আমাদের যা বেতন তাতে তা সম্ভব হয় না। তোমার নিজের জীবন দিয়ে সব কিছু দেখলে তো চলবে না। তুমি বলছ আমরা পরাধীন নই। তা ঠিক নয়। আইনের চার দেওয়ালের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, এবং বিচার ব্যবস্থায় আমাদের স্বাধীনতা মোটেই নেই। মিথ্যা প্রমাণকে সত্যি ধরে বা সত্য ঘটনাকে অবিশ্বাস করে যখন কোন রায় দিতে হয় মামলায় তখন বুঝি কত অসহায় ও পরাধীন আমি। তোমাকে আমার জীবনে দেখা সব ঘটনা বললে তোমার উপলব্ধি হবে। কিন্তু সব ঘটনা তো বলা সম্ভব নয়।"

উদয়ন বলেছিল তার অভিজ্ঞতা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আরো বেশি। তবুও শুনলাম।

উদয়ন তখন উত্তরবঙ্গের কোন এক জেলায় অ্যাডিশনাল জজ হয়েছে সবে। সাবজজ অবস্থায় সেশন মামলার অভিজ্ঞতা কম। প্রথম অ্যাডিশনাল জজ হয়ে একটা বড় মামলা খুনের বিচার করতে গিয়ে খুব বিপদে পড়েছে মনে মনে। বাইরে প্রকাশ করতে পারছে না মনের সেই অসহায় অবস্থার কথা। সরকার পক্ষ যা বলছে সেটাও যেমন যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে অভিযুক্ত যা বলছে তাও। প্রত্যক্ষদর্শী যা বলছে বিশ্বাস করতে মন হচ্ছে। আবার অভিযুক্ত যা বলছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীকে। বেশ কয়েক রাত ঘুম হচ্ছে না। ছটফট করেছে বিছানায়। বিচার করা যে এত কঠিন কাজ সে উপলব্ধি ছিল না আগে। দেওয়ানী মোকর্দমায় মনে কোন অশান্তি থাকে না। দলিল দস্তাবেজ সাহায্য করে অনেকটা। কম সাজার ফৌজদারি মামলা ততটা ভবিয়ে তোলে না। কিন্তু ফাঁসী বা যাবজ্জীবন যেখানে সাজা সেখানে চিন্তার স্বচ্ছতা ও গভীরতার প্রয়োজন। আমি তো সাজা দিলাম, হাইকোর্ট যা করে করবে এ মনোভাব অমার্জনীয়। অথবা সাজা দিলে সংবাদপত্রে নাম বেরুবে এ বাসনা একটা অপরাধ। সজাগ বিবেক নিয়ে উদয়ন খুব মুশকিলে পড়েছিল। শাস্তি দিতে গেলে অভিযুক্তের দেওয়া সব যুক্তি খণ্ডন করতে হয়। সেটা খুব কঠিন কাজ। বরং মুক্তি দেওয়া সে তুলনায় সহজ। প্রথম যে খুনের মামলা সেটা অনেক পুরনো। আগের আগের জজ নথির কলেবর ও মামলার বিষয়বস্তু দেখে পাশ কাটিয়ে গেছেন পরিশ্রম ভীতিতে বা অন্য কোন গোপন কারণে। উদয়নও তা পারতো। কিন্তু বিবেক বাধা। পারেনি। বিচারক হিসেবে সুনাম আছে। সে খবর অনেকেই রাখে। কোন পক্ষই সে মামলা আর বিলম্বিত করতে চায়নি। উদয়ন সেই ঘটনা বলার আগে তার নিজের অবস্থা আমার কাছে বলেছিল।

আদালতে সরকারপক্ষ যে ভাবে মামলা উপস্থাপন করেছিল সেটা হ'ল অলক নামে এক যুবককে খুন করেছে কয়েকজন ষড়যন্ত্র করে। এই খুনের পেছনে আছে এক মেয়ে। অলক ঘটনাক্রমে তার স্বামী। প্রণয় ঘটিত খুনের উদ্দেশ্য। প্রমাণ হিসেবে এসেছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। অন্যেরা ঘটনার আগের এবং পরের প্রমাণ হিসেবে এসেছে। শ্রীধর সামন্তের সঙ্গে অলকের স্ত্রী শকুন্তলার এক অবৈধ সম্পর্ক ছিল। শ্রীধর একটা চা বাগানের ম্যানেজার। চেহারায় যেমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান, তেমনি অর্থশালী। প্রতিপত্তিও অনেক। অলক ছিল সামান্য সরকারী চাকুরে। শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বছর চার আগে। কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। দেখতেও অলক অতি সাধারণ চেহারার। গায়ের রং কাল। শ্রীধর ফর্সা। সাহেবদের মত দেখতে। শকুন্তলা শ্রীধরকে প্রথম দিন দেখেই মুগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীধরও তাই। যেচে আলাপ করে। ধীরে ধীরে সম্পর্ক নিবিড় হয়। চা বাগানের গাড়ি নিয়ে শ্রীধর শকুন্তলাকে নিয়ে যায়

নানা জায়গায়। সন্ধের আগে এসে প্রথম খানিকটা গল্পটল্প করে। অলক অফিস থেকে এসেই চলে যায় তাসের আড্ডায়। ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা হয়। শ্রীধর শকুন্তলাকে নিয়ে বেড়িয়ে পৌঁছে দেয় তার আগেই। শকুন্তলা ছিল এক গরিব ঘরের মেয়ে। অতি সাধারণ ছিল তার শাড়ি ব্লাউজ। প্রসাধন ছিল না একেবারেই। অলকের মনে হ'ত স্বামীর অবস্থা বুঝে এই কৃচ্ছ্রসাধন। কিন্তু শকুন্তলার পরিবর্তন বেশ-ভূষার, প্রসাধনে আকর্ষণ সব কিছুই অলকের একে একে চোখে পড়ত। নানা কথা কানেও আসত শ্রীধর ও শকুন্তলাকে ঘিরে। প্রথম প্রথম অলক প্রতিবাদ করত। কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারত না। শকুন্তলা, সে ছিল একদিন শান্ত, ধীরে ধীরে মেজাজ উগ্র হ'তে লাগল। সময় সময় দুজনে ঝগড়াও হ'ত। শকুন্তলা স্বামীকে ভয় দেখাত মামলা-মোকদ্দমার। অলক শান্ত হয়ে যেত ভয়ে। প্রতিবেশীরা সব কিছু লক্ষ্য করত। ঝগড়াও শুনতে পেত। কিন্তু তারা জড়িয়ে পড়তে চাইত না স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে। শকুন্তলাকে পছন্দ করত না কেউ। তাছাড়া শ্রীধর যেভাবে প্রকাশ্যে অলকের স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করত সেটা কেউ পছন্দও করত না যেমন তেমনি আবার প্রতিবাদ করার ইচ্ছা ছিল না। এইভাবে কেটেছে দেড়-দুবছর। অলক ক'খন কখনও ঝগড়া করে বের হ'য়ে যেত। রাত্রে ফিরত না। কোন বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন অফিস করে বাড়ি ফিরত। রাগ তখন অনেকটা কমেছে। ঘৃণা কিন্তু বাড়তে থেকেছে শকুন্তলার প্রতি। সেই রকম ভাবেই একদিন অলক বেড়িয়ে যায় বাড়ি থেকে সন্ধ্যার পর। রাত্রে ফেরেনি। শকুন্তলাও শ্রীধরের সঙ্গে গাড়িতে বেড়িয়ে গেছে। ফিরেছে অনেক রাত করে। সবাই তখন হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে আশেপাশে। কেউ দেখেনি ফিরতে। পরদিন সকাল আটটা নাগাদ পিচ রাস্তার ধারে মৃতদেহ দেখা গেছে অলকের। শরীরে যে জখম হয়েছে তা দেখে অলককে চেনা যায়নি। পুলিশ খবর পেয়ে এসেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত দেহের ময়নাতদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে হাসপাতাল মর্গে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাক্তার মত দিয়েছেন গাড়ি চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। জখম মৃত্যুর আগে। কিন্তু খুন সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মতামত দিতে পারেননি। শ্রীধর ও কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সন্দেহে। সরকার পক্ষ যেভাবে মামলা এনেছে তাতে দুজন বলেছে একটা কাল রং এর গাড়ি তারা দেখেছে যার হেড লাইটের আলোয় কয়েকজন মানুষ ধাক্কা দিয়ে, একজনকে ফেলে দেয় রাস্তায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়িটা চাপা দিয়ে বেড়িয়ে যায়। তারা ছুটে গিয়ে দেখতে পায় লোকটাকে চাকায় পিষে দিয়েছে। রক্তে ভেসে গেছে রাস্তা। মানুষটাকে চেনা যায়নি। তাদের মধ্যে একজন থানায় ফোন করে। আরো তিনজন বলেছে রাত্রি নটা নাগাদ তারা দেখেছে কাল রং-এর গাড়ি চা বাগান থেকে বেরিয়ে পিচ রাস্তা ধরে জঙ্গলের দিকে। তারপর আছে একটা চা বাগান। দুজন দেখেছে একটা কাল রং এর গাড়ি। তাতে ড্রাইভিং সিটে একজন সুন্দর পুরুষ, পাশে এক সুন্দরী মহিলা। তখন রাত আটটা চা বাগানে ঢুকতে। সে গাড়ির নম্বর যে বলেছে। তারা সে গাড়ি বেরুতে দেখেনি। কিছু মানুষের শনাক্তকরণ হয়েছে জেলে। তারা ধাক্কা মেরে ফেলেছিল একটা লোককে রাস্তায়, হেডলাইটের আলোয় চিনতে পেরেছে। তারা শ্রীধরের চা বাগানের শ্রমিক। শকুন্তলাকে কোর্টে পাঠাবার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। শ্রীধরের চা বাগানের শ্রমিক যারা তারাও অভিযুক্ত শনাক্তকরণের কারণে। ঘটনার সময় কাল রং-এর গাড়িতে কে কে ছিল তার প্রমাণ নেই। তবে চা বাগানের গাড়ির টায়ারে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। শ্রীধরকে ঘটনার পর বেশ কিছুদিন শকুন্তলার সাথে দেখা যায়নি। শ্রীধরের সঙ্গে শকুন্তলার মেলামেশা এবং সেটাকে কেন্দ্র করে

অলক শকুন্তলার ঝগড়া তার প্রমাণ এসেছে। খুনের পেছনে যে মোটিভ থাকে তারও প্রমাণ যথেষ্ট। কিন্তু যে গাড়ি অলকের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার প্রমাণ বিশ্বাস করলেও গাড়িতে কারা ছিল সে সময় তার প্রমাণ অতি ক্ষীণ।

অভিযুক্তদের তরফ থেকে যে দৃষ্টিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে অলকের গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। বিশেষত সে রাত্রেও অলক ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। প্রমাণে এও এসেছে শ্রীধর শুধু মাত্র শকুন্তলা নামের পরস্ত্রীর সঙ্গেই যে মেলামেশা করেছে তা নয়। অন্যান্য পরস্ত্রীকেও গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে গেছে। তারাও সুন্দরী। শ্রীধর অবিবাহিত। সবারই স্বামীকে তাহলে শ্রীধরকে খুন করতে হয়। যারা বলেছে গাড়ির হেড লাইটের আলোয় চিনেছে হত্যাকারীদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে গাড়ির সামনে একজনকে তাদের দেখা এবং চেনা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণে যে অভগ্ন চেন বা শৃঙ্খল প্রয়োজন তার বিবেচনার প্রয়োজন বলা হয়েছে। আইনগত আরো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত যদি খুন না হয় তাহলে কীভাবে প্রমাণিত হবে অলককে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে—তাহলে কি ধরে নিতে হবে রাত্রির কোন সময়ে অলকের ঝগড়া হবে স্ত্রীর সঙ্গে, তারপর সে বেরোবে বাড়ি থেকে এবং যে রাস্তায় সে যাবে তা আততায়ীরা আগে থেকে জেনেই প্রস্তুত ছিল? গাড়ির মধ্যে যারা ছিল এবং পথের ধারে অলককে ধাক্কা দেবার জন্য ছিল সকলেই জানত অলক ঝগড়া করে এই নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তা দিয়ে যাবে?

উদয়ন দ্বিধায় পড়েছে। একদিকে সন্দেহের আঙুল শ্রীধরের দিকে, শকুন্তলার প্রতি আসক্তি ও অলককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মানসিকতার দিকে। মন বলছে শ্রীধর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু প্রমাণ? পুলিশের কি আরো ভালভাবে তদন্ত করার কর্তব্য ছিল না। আত্মহত্যার সম্ভাবনাকে বাদ দি কি করে? বারবার পড়েছে উদয়ন মামলার নথি। সাতদিন ধরে ভেবেছে। উত্তেজনায় পায়চারি করেছে বাংলোর বাগানে। চিন্তা করেছে রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে। আলোচনা করেছে অভিজ্ঞ উকিলের সাথে যিনি এই মামলায় যুক্ত নন। রায় লিখেছে, ছিঁড়েছে আবার লিখেছে শেষ পর্যন্ত সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিয়েছে অভিযুক্তদের।

উদয়ন বলল—জানো সেই রায় দেবার আগে এত পরিশ্রম করেছি, চিন্তা করেছি সুবিচার দেবার জন্য, তবুও কত বদনাম হয়েছে। চা বাগানের ম্যানেজার বহু টাকা দিয়েছিল নাকি আমাকে।

আমি বললাম—বদনাম যদি কেউ করে থাকে তাহলে জেনো তোমারই সহকর্মী করেছে। ঈর্ষা যেমন উকিল করে অন্য উকিলকে, তেমনিই তোমার ক্ষেত্রেও সেটাই স্বাভাবিক। উদয়ন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—অপবাদ নিয়ে কাজ করা কত কঠিন তা বোঝান যাবে না। কত কার্পণ্য করে সংসার চালিয়েছি ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে একমাত্র লোপা জানে। ছেলেমেয়েও কত কষ্ট করেছে। তার খবর কেউ রাখেনি। কোন বিলাসিতার স্থান ছিল না আমাদের জীবনে। সে তুলনায় তোমরা আয় করেছ যেমন তেমনি দুহাত দিয়ে খরচ করেছো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয়নি?

ও বলল—সেও এক যন্ত্রণা মনে। রায় যদি বহাল না থাকে তাহলে তো সারা জীবন ঘুষ খাবার অপবাদ নিয়ে বাঁচতে হবে। হাইকোর্ট সেই রায় বহাল রাখলো তিন বছর পর। সুপ্রিম কোর্ট হল। কয়েকদিন আগে রায় বহাল থেকেছে খবর এল। সেদিন মনের একটা ভার যেন নেমে গেল। কিন্তু সেদিন যারা দুর্নাম ছড়িয়েছিল তারা তখন কোথায় কে জানে। তাদের সেই মুখের কোন পরিবর্তন হ'ল কি না দেখা হ'ল না।

উদয়ন হয়ত জানে না আমাদের উকিলদেরও দুর্নাম অপবাদ কত সহ্য করতে হয়। আন্তরিকতায়ও ব্রত হিসেবে কাজ করেও যখন ফল আশাজনক হয় না, তখন আমারই কোন উকিল বন্ধু নানা দুর্নাম ছড়ায়। কিন্তু উকিল হ'লে বোধ হয় সহ্যশক্তি বেড়ে যায়। কোন উত্তেজনা বা অনুভূতি আসে না। মনটা যেন তৈরি হয়ে যায়।

তিনদিন ধরে দুই বন্ধু শুধু গল্পই করেছি। নিজেদের দুঃখ-বেদনা বিনিময় করেছি। আমি উদয়নকে শুনিয়েছি কত ঘটনা। সেও শুনিয়েছে। উদয়ন সময়ের আগেই অবসর নিয়ে চলে যাবে আমেরিকা। আর দেখা হবে না হয়ত। আমাকে হাসতে হাসতে বলেছে—তোমার তো কলুর বলদের মতো জীবন। চোখ বাঁধা নিয়ে ঘুরতে থাক। জীবন থেকে রস নিংড়ে তেল নেবে সবাই। আমি তো নিষ্কৃতি পেয়ে দূরে থাকব। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—জানো আজ পাঁচ-সাতবছর কাজ ভাল লাগছে না। যখন এসেছিলাম পঞ্চাশের দশকে কাজে তৃপ্তি ছিল। বিচারের যুক্ত সকলের মধ্যে ছিল সুন্দর মেলবন্ধন। আদর্শ বলে একটা কথা তখন ছিল সকলের মধ্যে। নীতি ছিল যারজন্য মনে হত সরকার যা বেতন দেয় তার প্রতিটি পয়সার থেকেও বেশি পরিশ্রম করব। আইন যাই জানি প্রতিদিন জানবার আগ্রহ থাকবে। এই সব শিক্ষা পেয়েছি পূর্বসূরী ও সমকালেব মানুষ থেকে। সেই অভ্যাসের দাস থেকেছি। এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। আমি বললাম—তোমাকে আমার হিংসা তো সেখানেই। তুমি উড়বে আকাশে আর আমি থাকব খাঁচায় বন্দী। এই খাঁচা তৈরি হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের শুরুতে। আজ সে খাঁচা শক্ত ও মজবুত হয়েছে। যতদিন বাঁচব ততদিনই হয়ত বন্দী থাকতে হবে।

এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে গেলাম। প্লেন এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। এত গল্প করেও গল্প শেষ হতে চায় না। উদয়ন বলল—সত্যি তোমার জন্য কষ্ট হয়। তোমাকে হয়ত অনেক কিছু দেখতে হবে, শিখতে হবে, শুনতে হবে, যদি তোমার দীর্ঘ জীবন হয়। সরকারী উকিল বলবে—স্যার মানুষটা তো খুন হয়েছে, এবার অভিযুক্ত বলুক কে খুন করেছে বলেই উদয়ন হো-হো করে হাসতে শুরু করল। আমার অভিজ্ঞতা তাকে একবার বলেছিলাম। একটা মামলার বক্তৃতা প্রায় তিনদিন শুনানির পর আমাকে শুনতে হয়েছিল—মানুষটা তো খুন হয়েছে এক খ্যাতিমান দেওয়ানী উকিল আমাকে বলেছিলেন তোমরা যারা ফৌজদারী প্র্যাকটিস করো খুনীগুলোকে বাঁচিয়ে দিয়ে সমাজের চরম ক্ষতি কর। সে গল্পও করেছিলাম উদয়নের কাছে। তার চাকরির শেষের দিকে তাকেও শুনতে হয়েছিল অনেক উকিলের বক্তৃতা। তখন ওর মনে হ'ত আর চাকরি নয়। আরো কত শুনতে হবে ভবিষ্যতে। সত্তর দশক থেকে যে বিবর্তন তা যে এতটা হবে ভাবতে পারেনি। ওকালতি যে একটা প্রফেসন, ট্রেড নয় এ চিন্তাধারা অবলুপ্ত। টুকরো টুকরো নানা কথার মাঝে প্লেন ছাড়ার সময় ঘোষণা হয়েছে। উদয়ন প্লেনে উঠেছে। প্লেন টেক অফ করে আকাশে উড়ল। জলভরা চোখ নিয়ে দেখলাম একদিকে মনে কষ্ট হচ্ছে। আর হয়ত দেখা হবে না। অন্যদিকে ওকে সুখী দেখেও সুখ রয়েছে

মনে। এক অদ্ভুত মিশ্রিত মানসিকতা।

আমেরিকায় পৌঁছে যাবে কয়েকঘণ্টা পর। তার আগেই তো মুক্ত হয়ে গেছে আমাদের এই কয়েদখানা থেকে। দেশের মাটি ছেড়ে ও আকাশে উড়ছে আর আমি ফিরে আসছি এয়ারপোর্ট থেকে। বহু কথা মনে আসছে। কোনদিনই ওকে বলিনি আমার মনের কষ্ট। ও শুধু জানে আমার ছেলে উকিল হয়ে যথেষ্ট আয় করেছে। আমার সঙ্গে প্র্যাকটিশ করে না। জমিজমা কংক্রান্ত দেওয়ানী প্র্যাকটিশ করবে বলে আলাদাভাবে কাজ করবে বলেছিল। আমি আপত্তি করিনি। ভেবেছি বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিশ করতে অসুবিধা। স্বাধীনতা থাকে না। আমার যুগ আলাদা। আমার বাবা ফৌজদারী প্র্যাকটিশ করতেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন কলকাতায় ল পড়তে যাবার আগেই। ভয় ছিল আমি পড়তে গিয়ে কোন মেয়ের খপ্পরে পড়ে বিয়ে করে বসব। বিয়ের পর বনবাসের মত হস্টেল বাস। লম্বা ছুটি ছাড়া বাড়ি আসা যাবে না। তিন বছর কৃচ্ছ্রসাধনের পর ফিরে এলাম। বারো বছরের বৌ তখন পনেরো বছরে পড়েছে। পরীক্ষা দিয়ে আসার পর বৌকে আনা হল বাবার বাড়ি থেকে। ফল বেরোবার আগে থেকে বাবার সঙ্গে কোর্ট যাতায়াত। সকালে বই নিয়ে বসতে হবে, দুপুরে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটে কোর্ট। তারপর বিকেলে ঘণ্টাখানেক শুধু বিশ্রাম। তারপর আবার চেম্বারে পড়াশোনা। রাত সাড়ে দশটায় যখন শুতে গেছি তখন ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে। ঘুমিয়েও পড়ি। এইভাবে কেটেছে দশ-বারো বছর। দেবব্রতর জন্ম হয়েছে আমার ওকালতি করতে আসার দুবছর পর। আদরে মানুষ হয়েছে। ঠাকুমা দাদুর আদর। যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আদর পেয়েছে বলে আমার বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করতে ল পাস করেছে। কিন্তু আমার বাবা তাকে উকিল হ'তে দেখতে পায়নি। এসবই উদয়ন শুনেছে। তাই জানে। কিন্তু যা তাকে বলিনি বলে জানে না সেটা হ'ল আমার ভাগ্য। লোকে ভাগ্য বিশ্বাস না করলেও আমি করি। তাছাড়া একে ভাগ্য না বলে কিই বা বলা যাবে। উদয়নকে বলিনি ছেলের কথা কারণ বাবা হ'য়ে সব কথা সবাইকে বলা যায় না।

প্রথম পাঁচ বছর আমার সঙ্গেই থেকেছে দেবব্রত। তারই মধ্যে বিয়ে হয়েছে। হয়েছে বললাম বিয়ে করেছে বলা যায় না বলে। কলকাতায় পড়াশোনার সময় একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। ওর মা জানলেও আমাকে কিছু বলেনি। বিয়ের কথা ওর মা আমাকে বলল। আমি যখন বললাম পাত্রী দেখো তখন আমার স্ত্রী বলল—খোকা পাত্রী নিজেই ঠিক করেছে। আমি শুধোলাম তুমি দেখেছো পাত্রীকে? স্ত্রী বলল ফটো দেখেছি। আমার খুব পছন্দ। একটা কথা বলব রাগ করবে না? আমি বললাম—কথাটা না শুনে আগেই কি করে বলি বল? স্ত্রী অভিমান করে বলল—তোমাকে তো জীবনে কোনদিন কিছু চাইনি। এই মেয়েকে আমার বউ করে দাও। মেয়েরা জানে কোন তীরটা পুরুষকে বেশি বিদ্ধ করে। স্ত্রীর শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে মত দিলাম। রাগ করব নাও বললাম। তখন জানলাম আমার মতো এক ব্রাহ্মণের ঘরে আসবে এক তিলি জাতের মেয়ে। জাতপাত আমি মানি না। তবে সমাজ তো মানে। যাই হোক সমাজকে উপেক্ষা করেই বিয়ে হ'ল। মেয়েটি সুন্দরী। তার সঙ্গে তার বাবা এক ধনী ব্যবসাদার। গরিব হলেও কোন যায় আসতো না আমার কাছে। দেবব্রত বা তার মা কিছু দাবি তো করেই নি, বরং আপত্তি করেছে কিছু নিতে। তবে কোন মেয়েকে বাবা যদি কিছু গয়না দেয় তাতে তো বাধা দেওয়া যায় না। ঐটুকই। দেবব্রত চায়নি ধুমধাম করে বিয়ে হোক। কিন্তু মেয়ের বাবা কিছু লোকজন খাওয়ালেও আমার বাড়িতে কোন বৌভাত হয়নি। নাই হোক

সেটা কিছু বড় ব্যাপার নয়। প্রথম পাঁচ বছর ভালই চলেছে সংসার। কোন অশান্তি হয়নি। দেবব্রত ওকালতি করছে এটুকুই জানি। কিন্তু কীভাবে রোজগার করে খবর রাখিনি। প্রয়োজন ভাবিনি। সংসারে ওর সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল না। দেবব্রত তার মাকে কিছু দিত কিনা খোঁজ রাখি নি। একটা নিশ্চিন্ততা ছিল সে তো ওকালতি করছে। একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা। কারণ বিশ বছর লেগে যায় ভাল উকিল হতে। এতকাল শিক্ষানবিশীর পর উকিল হওয়া। এটাই ছিল আমার যুগের শিক্ষা। তা যে বদলে গেছে জানতে পারিনি।

আমার স্ত্রীর নামটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। দেবব্রতর মা অর্থাৎ আমার স্ত্রীর নাম শুভলতা। শুভ একদিন বলল—দেবব্রত নাকি শহরের প্রান্তে একটা জায়গা কিনেছে। পনেরো হাজার টাকা কাঠা। পাঁচ কাঠা জায়গা। আমি অবাক হ'লাম শুনে। মাত্র ছ'সাত বছর দেওয়ানী প্র্যাকটিশে এত টাকা আয় আমি কল্পনা করতে পারিনি। কিভাবে এত আয় করল? আশ্চর্য হবারই কথা। কৌতূহল দমন করে কাটালাম কয়েক বছর। কানে আসত দেবব্রত সেই কেনা জায়গায় বাড়ি তৈরি আরম্ভ করেছে। শীঘ্রি শেষ হয়ে যাবে। শেষ হয়েও গেল। ভাবছিলাম এটা একটা কাজের কাজ করেছে। ওকালতির তো আয়ের কোন স্থিরতা নেই। বাড়ি ভাড়া দিয়ে একটা স্থায়ী আয় হবে। ওটা একটা অ্যাসেট হ'ল। শুভ একদিন বলল আমি খোকার বাড়ি দেখে এলাম। কি সুন্দর বাড়ি। সামনে বিরাট ফুলের বাগান। পেছনে নানা শাক-সব্জি। একতলা বাড়ি। চেম্বারের দেওয়াল ও মেঝে খুব সাধারণ। কিন্তু ভেতরে তিনখানা ঘরের দেওয়াল প্লাস্টিক পেন্ট করা, মেঝে মোজাইক। খোকা বলছিল এই রকম একটা বাড়ির স্বপ্ন ছিল ওর। সামনের মাসে একটা মোটর গাড়ি কিনবে। শুভর কথায় আমি বিষম খেলাম। মনের কথা গোপন রেখে অবাক হবার পারদ যেন চড়তে লাগল মনে। আমি চল্লিশ বছর যা করতে পারি নি প্র্যাকটিশ করে, দেবব্রত তা করে দেখাল মাত্র এগারো-বারো বছরে। সেটাও আমার থেকে বহুগুণ বেশি। একদিকে আনন্দ অন্যদিকে কৌতূহল। কিভাবে সম্ভব হল? আমি এক আদর্শ নিয়ে কাজ করে এসেছি। ফি হিসেবে দাবির অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসারের নানা চাহিদায় আমার সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছু নেই। বড় জোর স্বামীর ও স্ত্রীর বাকি জীবনের সাধারণ জীবন যাপন সম্ভব হবে। আর আছে ইন্সিওরেন্স পলিসি। বেঁচে থাকলে ম্যাচিওরিটি ভ্যালু বোনাস সমেত। ম্যাচওরিটির আগে মৃত্যু হ'লে স্ত্রী পথে বসবে না। আমার আদর্শ নিয়ে চললে দেবব্রত এত অল্প সময়ে কল্পনাতীত উপার্জন করতে পারত না। দশ-বারো বছর কোন খবর রাখিনি দেবব্রতর ওকালতির আয় উপার্জনের। সংসারে তাকে কিছু দিতে হয়নি। দিতে এলেও নিতাম না। একটা পাপবোধ আসত। ছেলেকে মানুষ করেছি নানা ব্যয় করে। তারজন্য বিয়েতে পণ নিতে হবে বা সংসার চালাতে তার কাছে হাত পাততে হবে এটা লজ্জার মনে হয়েছে। বহু ব্যয় করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তারপরও মেয়ে-জামাইকে বরাবর দিয়ে এসেছি কিছু না কিছু নিয়মিত। এসবই আমার আদর্শের ব্যাপার। কিন্তু দেবব্রত কি আদর্শ নিয়ে জীবন যাপন করছে জানতে আগ্রহ হল। আগ্রহ হওয়াটাই খারাপ হ'ল। অভিশাপের আশঙ্কা এল।

জানলাম দেবব্রত প্রথম প্রথম নীচের কোর্টের মামলা হাইকোর্টে নিয়ে যেত। কি সিভিল বা দেওয়ানী কি ক্রিমিনাল বা ফৌজদারি মামলা। হাইকোর্টে মামলা করার জন্য লোকের কাছে নিত পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা। উকিল মামলা পাওয়ার জন্য দেবব্রত হাততুলে যা দিত তাই নিত। দেবব্রতের ভাগে অনেক বেশি থাকত। কোর্টে একটা মামলা করে বিশ-পঞ্চাশ টাকা পাবে। তার চেয়ে প্রতি মামলা যা হাইকোর্টে নিয়ে যাবে তাতে পাবে হাজার হাজার

টাকা। তাছাড়া ওর হাতে মামলা চালাবার বিশ্বাস নিয়ে কে দেবে। কয়েক বছর নামমাত্র প্র্যাকটিশ করে দুটো নামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানির উকিল হয়ে যায়। মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাবার মামলায় সে থাকে কোম্পানির পক্ষে। কিছু ক্ষতিপূরণের মামলা তার কাছে এলে সে অন্য উকিল দিয়ে আবেদন করায়। নিজে থাকে কোম্পানির পক্ষে। সেই উকিলকে যৎসামান্য দেয় প্রথম যে পঁচিশ হাজার টাকা কোম্পানি দেয় তার থেকে। নিজের থাকে পাঁচ হাজার। খরচ দেখায় তিন হাজার। তার থেকে হয়ত পাঁচশ টাকা দেয় অন্য উকিলকে। ফলে ক্ষতিপূরণ কোন বিধবা বা বৃদ্ধ বাবা বা মা পায় চৌদ্দ হাজার। সেই মামলায় চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ কোর্ট ধার্য করেন যদি এক লক্ষ টাকা তাহলে পঁচিশ বা তিরিশ হাজার নিয়ে নেয় দেবব্রত। কোম্পানির অফিসেও তার লেনদেন থাকে। ফলে অন্যের থেকে বেশি মামলায় সে হয় কোম্পানির উকিল। রমরমা তার প্র্যাকটিশ। লাখ টাকা তার বার্ষিক আয়। চোখের জলের অভিশাপ বিধবা অথবা কোন বৃদ্ধের। এছাড়া দেবব্রত আরো অনেক কিছু করে যা দালাল বা টাউটরা করে। পাঁচটা মুহুরি আছে। তারা জামিন হয় আসামীদের। তারা আসলে দালাল। বটতলায় ঘুরে ঘুরে তারা মক্কেল ধরে। কোর্ট লক আপে গিয়ে কয়েদীদের টিপছাপ বা সই নেয় কাগজে। দেবব্রত সামান্য খরচ দেয় স্ট্যাম্পের। ছোটখাটো উকিল দিয়ে জামিন করায়। তারপরে সেই মুহুরিদের কেউ কয়েদীর বাড়ি গিয়ে ইচ্ছেমতো টাকা নিয়ে আসে। দেবব্রত তাদের হাত তুলে যা দেবে। বাকি বেশি অঙ্কটাই তার। এটা শিখেছে অন্যান্য মুহুরিদের কাছে যারা নিজেরাই তা করে। এ ছাড়া সরল ও মূর্খ লোকদের নানা ভাবে প্রবঞ্চনা আছে। আছে থানার সঙ্গে যোগাযোগ। থানাই বলে দেবে এই উকিলকে মামলা দিলে রিপোর্ট ভাল দেবে। সেই উকিল টাকা আদায় করে থানার দারোগাকে ভাগ দেবে। এতকাল আমি দেবব্রতর এদিকটা খোঁজ রাখিনি। বিশ্বাস করে এসেছি সে দেওয়ানী প্র্যাকটিশ করছে।

একদিন দেবব্রতকে বললাম আমি যা জেনেছি। ও আমাকে উত্তরে বলল—আপনি পুরনো যুগের আদর্শ নিয়ে থাকুন। এ যুগে যা প্রয়োজন আমি তাই করি। আমার সামনে অনেকে সহজে বড়লোক হবে, বাড়ি গাড়ি করবে আর আমি আদর্শ নিয়ে আপনার ভার হয়ে কাটাব চিরকাল। জীবনে কোন সাধ-আহ্লাদ থাকবে না। স্ত্রীর স্নো-পাউডার, ছেলে-মেয়ের বেবি ফুড এসব কিনতে আপনার কাছে বারবার হাত পাতব। জীবনের বিশটা বছর আপনার মত জীবন যাপন করেও যে পেশায় আদৌ কোন প্রতিষ্ঠা আসবে তার স্থিরতা নেই। যুগটা অনেক বদলে গেছে। আপনি বদলাতে পারবেন না নিজেকে। কিন্তু আমার তো বদলানোর কোন প্রশ্ন নেই। আমি এই যুগেরই ছেলে। যেমন যুগ তেমন চলছি।

আমি হতবাক হয়ে শুনছি। তার যুক্তি আমি খণ্ডন করব সে সাধ্য আমার নেই। দেবব্রতই হয়ত ঠিক বলছে। অনেক রাজনীতি শ্রমিক আন্দোলন দেখেছে। নকশালদের দেখেছে তারপরও অনেক কিছু দেখেছে তাদের মধ্যে থেকে। আর আমি স্বাধীনতার পূর্ব দেখেছি। বিপ্লব ও দেশপ্রেম দেখেছি। তারপর পেশার মধ্যে নিজেকে এমন জড়িয়ে রেখেছি। বাইরের জগৎটা যে কোথায় গিয়ে, পৌঁছেছে তার খবর রাখিনি। আদর্শকে আঁকড়ে অন্ধ হয়ে থেকেছি। দেবব্রত জন্মেছে এমন একটা যুগে, শিক্ষা পেয়েছে একটা পরিবেশে। খুব কাছ থেকে দেখেছে রাজনৈতিক কলুষতাকে যে আমার মতো আদর্শ নিয়ে চললে সে উপবাস করবে ভেবেছে। এটা ভাবা ওর কোন দোষের নয়।

সাধারণত দেবব্রতর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। দুজনেই দুভাবে ব্যস্ত। শুভর সঙ্গে দেখা

হয়। মা ছেলেতে কথা হয়। বৌমা মিতালী খুব ভাল মেয়ে। আমাকে সেবাযত্ন করার চেষ্টা করে। শুভকে সাহায্য করে সংসারের নানা কাজে। শাশুড়ি বউ আবার বন্ধুও। সেদিক থেকে আমি ও শুভ দুজনেই সুখী। দেবব্রতও খুব বাধ্য ছেলে। মায়ের মতের বিরুদ্ধে যায় না। মাকেই সব কথা বলে। আমার কাছে গোপন থেকে যায় অনেক কিছু। শুভ বলল—খোকার বৌমাকে নিয়ে নতুন বাড়িতে থাকার ইচ্ছা। আমি তা অনুমান করি। সত্যি কথা বলতে কি আমিও তাই চাই। খোকা বলছিল বিলেতে ছেলে বড় হয়ে গেলে বাবা-মা তাকে আলাদা করে দেয়। খোকা তো এই শহরেই থাকবে।

আমি বললাম—আমাকে এত কথা বলছ কেন। এবাড়িতে তো বলতে গেলে আমার থেকে সবাই আলাদা থাক। আলাদা খাও। পেশার ব্যস্ততা এক সঙ্গে সবার সঙ্গে খাবার সুযোগও দেয় না। তাছাড়া দেবব্রত-মিতালী সুখে থাকলে আমার আপত্তিটা কোথায়? তুমি যদি একা থাকতে পার, আমি পারব না। কবে যাবে তোমার ছেলে নতুন বাড়িতে?

শুভ বলল—তোমার যেদিন মত হবে। আমি সেকেলে মানুষ হয়ত বলব পাঁজি দেখতে কবে ভাল দিন। তার থেকে তোমরা মা ছেলেতে যেদিন ঠিক করবে তাতেই আমার মত। আমি বললাম।

তার মাসখানেক পর এক রবিবার দেবব্রত মিতালীকে নিয়ে নতুন বাড়িতে যাবে বলে গৃহ প্রবেশের দিন ঠিক করল। সেদিন আমিও গেলাম। হাসিখুশি মন দেখলাম। ওরা যেন কিছু না ভেবে বসে। ছেলে ও বৌমাকে দেখলাম দারুণ খুশি। সারা দিন শুভ ছিল ওদের কাছে। আমি কিছুক্ষণ থেকে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার জীবনে তো ছুটি নেই। এর দিন দশ পরে উদয়নের চিঠি পেয়ে গেলাম তার কাছে। এয়ারপোর্টে বিদায় দিয়ে নতুন করে ভাবলাম। উদয়ন এতদিন আলাদা থেকেছে। ছেলে থাকতো বাঙ্গালোরে। এবার ও যাচ্ছে ছেলের কাছে আমেরিকায়। পরের জীবনটা কাটাবে ছেলের কাছে হয়ত সুখেই। আর আমি একই শহরে যদিও থাকব। কিন্তু ছেলে বৌ থাকবে আলাদা আমার বাকি জীবন। তবুও চাইছি ওরা সুখে থাক। চোখের জল ফেললে যদি অমঙ্গল হয়। বিলেতের কোন ইংরেজ থেকে আমি কি আলাদা? কোন ইংরেজ বাবা-মা কি চোখের জল ফেলে? এইসব প্রশ্ন তুলে মনকে সান্ত্বনা দি। কিন্তু চোখের জল তো আটকাতে পারি না। শুভরও সামনে চোখের জলও ফেলতে পারি না। আসলে কারো কাছে মনের কথা বলতে পারি না। যেমন পারিনি উদয়নকেও বলতে। আইনপেশায় যেন অভিনয়টা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন সবাই দেখে হাসি, তখন কিন্তু গোপনে কাঁদি। উদয়ন আমাকে দেখেছে এক সার্থক উকিল। দূর থেকে এর বেশি দেখা যায় না। উদয়ন যদি ছেলের কাছে না চলে যেত এবং স্থায়ীভাবে থাকতে এখানেই লোপাকে নিয়ে, তাহলে হয়ত ভাবতাম সে খুব দুখী। ও জানে না আমি আর শুভ ছেলে-বৌকে ছেড়ে থাকি।

শুভ যতই হোক স্ত্রী তো সে। আমাকে বুঝবার হয়ত তার এক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সে হয়ত দেখেছিল একমাত্র ছেলে বাবা মা ছেড়ে, শহরে শুধু নতুন বাড়ি করেই শান্তি পায়নি। স্বার্থপরতার চরম প্রকাশ দেখাল স্ত্রীকে নিয়ে সেই বাড়িতে বসবাস করবে বলে। শুভ বলল মন খারাপ কোর না। আমি তো তোমায় ছেড়ে যাইনি। তাছাড়া এতে মন খারাপ করার কি আছে? আমি তার কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললাম—উদয়ন বারবার আমায় বলত—কোন দুঃখই তোমাকে ছুঁতে পারবে না। কারণ তোমার জন্মস্থানের মাহাত্ম্য তোমার পিতৃভূমি সে গ্রাম সংলগ্ন এক উষ্ণ প্রস্রবণ। পড়ে আছে এক মন্দির। কিংবদন্তি দেবতাদের

নির্দেশে সে মন্দির তৈরি করেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। মন্দিরে আছেন শ্রেষ্ঠ সাধক অষ্টাবক্রমুনি। ব্রহ্মকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, জীবন কুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড, খার কুণ্ড এবং পাপ হরা যে নির্যাস আকাশে-বাতাসে মিশে আছে তার কল্যাণ থাকবে তোমার ওপর। সাময়িক বাধা, বিপত্তি, বেদনা হয়ত আসবে। কিন্তু তা কোনদিন চিরস্থায়ী হবে না। এই যে মন্দির, শ্বেতগঙ্গা ও কুণ্ডগুলো কি এমনি আছে যুগযুগান্ত ধরে। প্রত্যেকের পেছনে যে ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে মানুষের অগাধ বিশ্বাস কি এতই অর্থহীন। মানুষের মনোবল আনে। আত্মবিশ্বাস আনে, চরিত্রে দৃঢ়তার জন্ম দেয়। ফলে তোমার মতো মানুষ কোন কিছুতেই দুঃখ পাবে না। অভিমানে ভেঙে পড়বে না। শুভ একমনে শুনতে লাগল আমার কথাগুলো। কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর বলল—উদয়নকে তুমি না বললেও সে নিশ্চয় জানে। সেকারণেই ও কথাগুলো বলেছে। তোমাকে সে ভালবাসে এতেই তার প্রমাণ। আমি অবাক হলাম শুভর কথা শুনে। শুভ ঠিক বুঝেছে সে যেখানে আছে, যেমন আছে সেটাই সত্য। সত্যকে তো ঈর্ষা চলে না।